গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন

প্রতিবেদন

ফেব্রুয়ারি ২০২৫

Date ০৫/০৮/২০২৪

মা, আমি মিছিলে যাচ্ছি। আমি নিজেকে আর আটকিয়ে রাখতে পারলাম না। সরি আব্বুজান। তোমার কথা অমান্য কোরে বের হোলাম। স্বার্থপরের মতো ঘরে বোসে থাকতে পারলাম না। আমাদের ভাই রা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কাফনের কাপড় মাথায় বেধে রাজপথে নেমে সংগ্রাম কোরে যাচ্ছে। অকাতরে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিচ্ছে। একটি প্রতিবন্ধি কিশোর, ৭ বছরের বাচ্চা, ল্যাংড়া মানুষ যদি সংগ্রামে নামতে পারে, তাহলে আমি কেনো বোসে থাকবো ঘরে। একদিন তো মরতে হবেই। তাই মৃত্যুর ভয় কোরে স্বার্থপরের মতো ঘরে বোসে না থেকে সংগ্রামে নেমে গুলি খেয়ে বীরের মতো মৃত্যুও অধিক শ্রেষ্ঠ। যে অন্যের জন্য নিজের জীবনকে বিলিয়ে দেয় সেই প্রকৃত মানুষ। আমি যদি বেচে না ফিরি তবে কষ্ট না পেয়ে গর্বিত হয়ো। জীবনের প্রতিটি ভুলের জন্য ক্ষমা চাই।

আনাস

Apetiz

উৎসর্গ

চব্বিশের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে প্রাণ উৎসর্গকারী জুলাই শহিদ আনাসসহ অন্যান্য জুলাই শহিদ ও অসম সাহসী জুলাই যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে এই প্রতিবেদনটি আমরা উৎসর্গ করছি।

* পূর্বের পৃষ্ঠার চিঠিটি চব্বিশের জুলাই-আগস্টের
গণঅভ্যুত্থানে নিহত শহিদ আনাসের মায়ের কাছে লেখা শেষ চিঠি

প্রকাশক
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

প্রচ্ছদ
চব্বিশের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে ব্যবহৃত গ্রাফিতি চিত্র আলোকে

মুদ্রণ সমন্বয়
মহাপরিচালক, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

বর্ণ বিন্যাস
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

বাঁধাই
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস)

মুদ্রণ
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস)
মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

* এই বইয়ের কোনো কপিরাইট নেই। যে কেউ
কোনোরকম পরিবর্তন/পরিমার্জন/পরিবর্ধন ছাড়া
প্রতিবেদনের মূল লেখা প্রকাশ ও বিতরণ করতে পারেন।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা মহোদয়ের শুভেচ্ছা বার্তা

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের ছাত্রজনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ একটি ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসান ঘটিয়েছে। এই আন্দোলন সাফল্য লাভ করেছে এক অভূতপূর্ব জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠার মাধ্যমে। এই অভ্যুত্থানের একটি অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে দেশে এমন এক শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেখানে সকলের অধিকার সুনিশ্চিত হবে, কোনও ব্যক্তি বা দল দেশের মানুষের জীবন ও দেশের সম্পদ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারবে না, সকলের ভোট দেবার অধিকার আর কোনও দিন লুণ্ঠিত হবে না এবং নাগরিকদের সম্মতিতে দেশ পরিচালিত হবে। দেশ পরিচালনার এই পদ্ধতি তৈরি করতে হলে দরকার বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার।

জুলাই ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের বীর শহিদরা, যাঁরা আহত হয়েছেন তাঁরা তাঁদের আত্মদানের মধ্য দিয়ে এই সংস্কারের দায়িত্ব আমাদের সকলের ওপরে অর্পণ করেছেন। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যে ১১টি সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছে। এইসব কমিশনের সদস্যগণ নিরলস পরিশ্রম করে সংস্কারের সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করেছেন। কমিশনগুলোর এইসব প্রতিবেদন মূল্যবান সম্পদ। এই সম্পদ বাংলাদেশের ইতিহাসে রক্ষিত হবে। এখান থেকে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে কতটুকু গ্রহণ করবো, কোনটা কখন কাজে লাগাতে পারবো, কীভাবে অগ্রসর হবো তা নির্ধারণের জন্যে দরকার দেশের সব মানুষের মধ্যে আলাপ-আলোচনা। সে আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রথম পর্যায়ে গঠিত সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, দুর্নীতি দমন কমিশন, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন এবং পুলিশের সংস্কার বিষয়ক কমিশনগুলোর প্রতিবেদনসমূহ প্রকাশ করা হল।

জুলাই অভ্যুত্থানে যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছেন, তাঁদের স্বপ্ন ছিল একটা নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলা। এ-দায়িত্ব পালনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এই সুপারিশমালা প্রস্তুত করা হয়েছে। এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ গড়ে উঠবে। এখন কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা এবং তা বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হতে হবে। আমাদের এই বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া দ্রুত হোক এবং মসৃণ হোক এই কামনা করে এই সুপারিশমালা দেশবাসীর নিকট তুলে দিলাম।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস
প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাননীয় কমিশন প্রধানের ভূমিকা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সংস্কারের উদ্যোগ নতুন নয়। বিভিন্ন সময়ে এমন নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তবে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে তা শুধু সুপারিশের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংস্কার উদ্যোগ ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের বিষয়েও পরিণত হয়েছিল। গত ১৫ বছরে, স্বৈরাচারী আওয়ামী সরকারের আমলে, সংস্কারের ক্ষীণতম প্রচেষ্টাকেও ধৃষ্টতা হিসেবেই গণ্য করা হয়েছে, যার পরিণতি হয়েছে জনগণের ভোটাধিকার হরণ, একদলীয় স্বৈরশাসন এবং নজিরবিহীন 'ক্লেপটোক্রেসি' বা চোরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

আমরা ছাত্র-জনতাকে কৃতজ্ঞতা জানাই তাদের অবিস্মরণীয় আত্মত্যাগের জন্য, যারা চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান ঘটিয়ে পুরো জাতিকে আমাদের ইতিহাসের নিকৃষ্টতম নিপীড়নকারীর হাত থেকে রক্ষা করেছে। একইসঙ্গে জনমনে সংস্কারের মাধ্যমে রাষ্ট্র মেরামতের আকাঙ্ক্ষা আবার পুনরুজ্জীবিত করেছে, যে আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপায়িত করার লক্ষ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১১টি সংস্কার কমিশন গঠন করেছে, 'নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন' যার অন্যতম।

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের ওপর অর্পিত হয়েছে বাংলাদেশের আইনি কাঠামো ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার নানাবিধ সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ করে অন্তর্জাতিক মানদণ্ডের আলোকে একগুচ্ছ সুপারিশ প্রণয়ন করা, যা বাংলাদেশকে পুনরায় অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পথে ফিরিয়ে আনবে এবং একটি টেকসই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত রচনা করবে।

যে আস্থার ভিত্তিতে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন গঠিত হয়েছে, সেই আস্থার প্রতি যথাযথ সম্মান দেখিয়ে আমরা একগুচ্ছ যুগোপযোগী সুপারিশ প্রণয়ন করেছি, যার মাধ্যমে কতগুলো আইনি, প্রতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সংস্কার বাস্তবায়িত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এসব সংস্কারের মাধ্যমে সুযোগ সৃষ্টি হবে আমাদের নির্বাচনি ও রাজনৈতিক অঙ্গনকে দুর্বৃত্তমুক্ত করা, টাকার খেলা বন্ধ করা, নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী ও দায়বদ্ধ করা, সংশ্লিষ্ট সকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর করা, সর্বোপরি আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে গুণগত পরিবর্তন আনার।

সুপারিশ প্রণয়নে কমিশনের সদস্যগণ শুধু তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সবটুকুই দেননি, আমরা কমিশনের পক্ষ থেকে ক্রমাগতভাবে ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের মতামতও গ্রহণ করেছি। এর অংশ হিসেবে আমরা দেশব্যাপী একটি জরিপ পরিচালনা করেছি এবং সংলাপের মাধ্যমে সরাসরিভাবে অংশীজনের মতামত গ্রহণ করেছি। এসকল অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা সংশ্লিষ্ট সকল আইনকানুন ও বিধিবিধানের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করে সুপারিশগুলো প্রণয়ন করেছি।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আমাদের প্রতিবেদন ও সুপারিশগুলোর মধ্যে জনগণ তাদের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখতে পাবেন। আমরা আশা করি যে, সংস্কার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে এবং আমাদের সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করতে সংশ্লিষ্ট সকলে, বিশেষত রাজনৈতিক দলগুলো এগিয়ে আসবে। এটাই হবে ২৪-এর বীর সেনানীদের আত্মত্যাগের যথোপযুক্ত স্বীকৃতি।

ড. বদিউল আলম মজুমদার
কমিশন প্রধান
নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন
সম্পাদক, সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক, এবং
নির্বাচন ও স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন - সদস্যবৃন্দ

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

ড. তোফায়েল আহমেদ
সদস্য, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন
ও শিক্ষাবিদ, স্থানীয় সরকার ও নির্বাচন বিশেষজ্ঞ

জেসমিন টুলী
সদস্য, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন ও
সাবেক অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন এবং
নির্বাচন ব্যবস্থা, ভোটার নিবন্ধন ও
জাতীয় পরিচয়পত্র বিশেষজ্ঞ

ড. মো. আব্দুল আলীম
সদস্য, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন ও
নির্বাচন বিশেষজ্ঞ

ডা. জাহেদ উর রহমান
সদস্য, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন ও
রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ ও ওপিনিয়ন মেকার

মীর নাদিয়া নিভিন
সদস্য, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন ও
শাসন প্রক্রিয়া ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার বিশেষজ্ঞ

ড. মোহাম্মদ সাদেক ফেরদৌস
সদস্য, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন ও
ইলেক্ট্রনিক ভোটিং ও ব্লকচেইন বিশেষজ্ঞ

সাদিক আল আরমান
সদস্য (শিক্ষার্থী প্রতিনিধি)
নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	উপস্থাপন	
	ভূমিকা	১
	সারসংক্ষেপ (সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশসমূহ)	৮
	কমিশন গঠন	১৯
	কমিশনের কার্যপদ্ধতি এবং জনগণ ও অংশীজনের মতামত	২০
	নির্বাচন সংস্কার বিষয়ক জনমত জরিপ	২২
	সংক্ষেপণ (Abbreviations)	৩৬
১.	নির্বাচন কমিশন	৩৭
২.	তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা	৪৭
৩.	রাষ্ট্রপতি নির্বাচন	৪৮
৪.	জাতীয় সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন	৫১
৫.	সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ	৫৩
৬.	রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন	৫৭
৭.	জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) ব্যবস্থাপনা ও ভোটার তালিকা	৬১
৮.	জাতীয় সংসদ নির্বাচন	৭৭
৯.	জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব	৯৪
১০.	প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থা	৯৯
১১.	অনলাইন (ইন্টারনেট) ভোটিং	১১৫
১২.	নির্বাচনি অপরাধ	১৩০
১৩.	নির্বাচনি বিরোধ ও বিচার ব্যবস্থাপনা	১৩৫
১৪.	নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও গণমাধ্যম নীতিমালা	১৪০
১৫.	রিকল বা প্রতিনিধি প্রত্যাহার	১৪৫
১৬.	নির্বাচনি ব্যয়	১৪৭
১৭.	গণভোট	১৫৪
১৮.	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন	১৫৬
১৯.	উপসংহার	১৬২

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
পরিশিষ্টসমূহ[১]	পরিশিষ্ট-১: নির্বাচন কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ (প্রস্তাবিত খসড়া)	
	পরিশিষ্ট-২: প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারদের আচরণবিধি (প্রস্তাবিত নতুন বিধিমালা)	
	পরিশিষ্ট-৩: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (সংশোধনের জন্য প্রস্তাবিত অধ্যাদেশের তুলনামূলক বিবরণী)	
	পরিশিষ্ট-৪: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	
	পরিশিষ্ট-৫: নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন, ২০০৯ (সংশোধনের জন্য প্রস্তাবিত অধ্যাদেশ)	
	পরিশিষ্ট-৬: জাতীয় সংসদের নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন, ২০২৫ (প্রস্তাবিত খসড়া)	
	পরিশিষ্ট-৭: নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ (সংশোধনের জন্য প্রস্তাবিত অধ্যাদেশের তুলনামূলক বিবরণী)	
	পরিশিষ্ট-৮: রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮ (সংশোধনের জন্য প্রস্তাবিত অধ্যাদেশ)	
	পরিশিষ্ট-৯: নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালা, ২০২৫ (প্রস্তাবিত খসড়া)	
	পরিশিষ্ট-১০: Guidelines for International Election Observers and Foreign Media, 2023 (সংশোধনের জন্য প্রস্তাবিত খসড়া)	
	পরিশিষ্ট-১১: নির্বাচনি সংবাদ সংগ্রহে দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংবাদিক/গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য নীতিমালা, ২০২৫ (প্রস্তাবিত খসড়া)	
	পরিশিষ্ট-১২: মনোনয়নপত্রের সঙ্গে প্রার্থী প্রদত্ত হলফনামা (প্রস্তাবিত নতুন ছক)	
	পরিশিষ্ট-১৩: রাজনৈতিক দল থেকে প্রাপ্ত মতামত ও প্রস্তাবনা পর্যালোচনা	
	পরিশিষ্ট-১৪: অংশীজনের সঙ্গে অনুষ্ঠিত নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সংলাপ/মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী	
	পরিশিষ্ট-১৫: নির্বাচন সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা ও নীতিমালার তালিকা	
	পরিশিষ্ট-১৬: আলোকচিত্রে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের কার্যক্রম	

[১] কলেবর ছোট রাখার জন্য বর্তমান প্রকাশনায় পরিশিষ্ট যুক্ত করা হয়নি। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত প্রতিবেদনের সঙ্গে পরিশিষ্ট সংযুক্ত করা আছে।

ভূমিকা

১.১ ফ্যাসিস্ট ব্যবস্থা/মাফিয়াতন্ত্রের পতন এবং বৈশ্বিক স্বীকৃতি

'আমাদের এবারের বিজয়ী বাংলাদেশ, যারা এক স্বৈরশাসককে উৎখাত করেছে। ....তিনি (শেখ হাসিনা) দমন শুরু করেন, নির্বাচনে কারচুপি করেন, বিরোধীদের কারাগারে পাঠান এবং নিরাপত্তা বাহিনীকে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ দেন। তার শাসনামলে বিশাল অঙ্কের অর্থ আত্মসাৎ করা হয়। ...শান্তিতে নোবেল পুরস্কার জয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে সেখানে রয়েছে একটি অস্থায়ী সরকার, যা ছাত্র, সেনাবাহিনী, ব্যবসায়ী ও নাগরিক সমাজের সমর্থন পেয়েছে। এই সরকার শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে এবং অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করেছে। ...একজন স্বৈরশাসককে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং আরও উদার সরকার গঠনের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য আমাদের এ বছরের সেরা দেশ বাংলাদেশ।'[২]

ওপরের কথাগুলো বাংলাদেশ সম্পর্কে বলা হয়েছে বিশ্বখ্যাত পত্রিকা দ্য ইকোনমিস্টের বর্ষসেরা দেশের তালিকাসংবলিত প্রতিবেদনে, যেখানে 'দ্য ইকোনমিস্টস কান্ট্রি অব দ্য ইয়ার-২০২৪'-এর নির্বাচিত দেশ এবং তার যৌক্তিকতা নিয়ে কথা বলা হয়েছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, 'সবচেয়ে ধনী, সুখী বা নৈতিকভাবে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকারী কি না, সেই হিসেবে নয়; সেরা দেশ বেছে নেওয়া হয় আগের ১২ মাসে সবচেয়ে বেশি উন্নতি করেছে কিনা, সেই বিচারে।'

বাংলাদেশের এই অর্জন নিশ্চিত হয়েছে একটি ফ্যাসিস্ট শাসন ব্যবস্থা ও মাফিয়াতন্ত্রের পতন ঘটানোর মাধ্যমে।

১.২ অবৈধভাবে ক্ষমতা ধরে রাখার পরিকল্পনা: সংবিধান সংশোধন

২০০৮ সালে অংশগ্রহণমূলক এক নির্বাচনের মাধ্যমে ভূমিধস বিজয় নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগের এ বিজয়ের পিছনে একটি বিরাট ভূমিকা রেখেছিল 'দিনবদলের সনদ' শীর্ষক এক নির্বাচনি ইশতেহার, যে ইশতেহারে দেশে বিরাজমান চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, দলবাজি ইত্যাদি এবং দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নের মূল উৎপাটনসহ শাসনব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটানোর অঙ্গীকার করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ সরকার এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ভয়াবহভাবে ব্যর্থ হয়, যে ব্যর্থতার কারণে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি হাবিবুর রহমান ২০১১ সালে পরম আফসোস করে বলেছিলেন যে 'দেশ এখন বাজিকরদের হাতে'।[৩] এমনি প্রেক্ষাপটে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য – বস্তুত ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার – সরকার ৩০ জুন ২০১১ তারিখে জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে, উচ্চ আদালতের রায় অমান্য করে সম্পূর্ণ একতরফা ও অসাংবিধানিকভাবে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাস করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে, যে ব্যবস্থাটি বিবদমান দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে সৃষ্ট একটি বিরল রাজনৈতিক ঐকমত্যের ফসল।[৪]

উচ্চ আদালত কর্তৃক সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১০ সালের ২১ জুলাই সংবিধান সংশোধনের জন্য আওয়ামী লীগের এবং তার জোটসঙ্গীদের জ্যেষ্ঠ নেতাদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়, যেটি রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে ব্যাপক আলোচনা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বহাল রেখেই সংবিধান সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেয়। দল হিসেবে আওয়ামী লীগ নিজের সিদ্ধান্তও ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বহাল রাখার পক্ষে। কিন্তু ২০১১ সালের ১০ মে প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হকের নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারকগণ ত্রয়োদশ সংশোধনীকে 'ভবিষ্যতের জন্য' অসাংবিধানিক ঘোষণা করে একটি সংক্ষিপ্ত, বিভক্ত আদেশ দেন। এরপর পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হওয়ার আগেই ২০১১ সালের ৩০ জুন সংসদে পঞ্চদশ সংশোধনী পাশ করা হয়। উচ্চ আদালতের রায়কে এর কারণ হিসেবে দেখানো হলেও এটাও ছিল প্রতারণামূলক – আপিল বিভাগের রায়ে ভবিষ্যতের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করা হলেও ক্রান্তিকালীন ব্যবস্থা হিসেবে এবং রাষ্ট্র ও জনগণের নিরাপত্তার স্বার্থে নিঃশর্তভাবে পরবর্তী দুটি সংসদ নির্বাচন এই সরকার ব্যবস্থার অধীনে করার পক্ষে রায় দেন। এই সংশোধনীর মূল উদ্দেশ্য ছিল আমাদের দেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রমাণিত ব্যবস্থা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা, যে ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্বাচনে সময়ে ৯০ দিনের জন্য একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে।

১.৩ বিগত তিনটি জাতীয় নির্বাচন

বাংলাদেশের ইতিহাসে দলীয় সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি। ২০১১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলের পর কারচুপির নির্বাচনের পুরানো সংস্কৃতিই বাংলাদেশে ফিরে আসে। তবে বিগত তিনটি নির্বাচনে যে মাত্রায় এবং ব্যাপ্তিতে কারচুপি হয়েছে সেটা এই দেশের তো বটেই, বৈশ্বিক মানদণ্ডেও বিস্ময় সৃষ্টিকারী, যার পরিণতিও হয়ে দাঁড়ায় প্রলয়ংকরী।

[২] 'দ্য ইকোনমিস্টের বর্ষসেরা দেশ বাংলাদেশ', *দ্য ডেইলি স্টার*, ২০ ডিসেম্বর ২০২৪

[৩] 'দেশ এখন 'বাজিকরদের' হাতে: হাবিবুর রহমান', *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, ০৬ অক্টোবর ২০১০

[৪] বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত জানতে, দেখুন, বদিউল আলম মজুমদার, *তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিলের রাজনীতি*, প্রথমা প্রকাশন, ২০২৩।

দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০১৪ সালের নির্বাচনে একজন ভোটারও ভোট প্রদানের আগেই ১৫৩ আসনের প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়ে যান, যা সরকার গঠনের জন্য যথেষ্ট ছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে কখনো একটি নির্বাচনি ব্যবস্থায় কোনো ভোট পড়ার আগেই সরকার গঠনের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতার ইতিহাস সম্ভবত আর দ্বিতীয়টি নেই। অন্যদিকে জালিয়াতির মাধ্যমে নির্বাচনকে একেবারে নিজের পক্ষে নিয়ে যাবার সবচেয়ে বড় উদাহরণ 'রাতের ভোট'-এর তকমা পাওয়া ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ভোটের আগের দিন রাতে ব্যালট বাক্স ভর্তির নজির তৈরি হয়েছিল, সেটাও সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। ২০২৪ সালের নির্বাচনে বিরোধী সব রাজনৈতিক দলের নির্বাচন বয়কটের প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগ দলীয় গঠনতন্ত্র লঙ্ঘন করে কৃত্রিমভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবহ আনতে তার জোটসঙ্গী এবং সহযোগীদের জন্য দলের সকলকে নির্বাচনের প্রার্থী হওয়ার পথ উন্মুক্ত করে দেয়। নির্বাচনটা হয়ে ওঠে নৌকা প্রতীক এবং নৌকা প্রতীক ছাড়া ভিন্ন কোনো প্রতীকে আওয়ামী লীগ, তার জোট এবং সহযোগীদের পাতানো খেলায়, যা আইনের দৃষ্টিতে কোনো নির্বাচনই ছিল না। কারণ আইনের অঙ্গনে বহুল ব্যবহৃত 'ব্ল্যাক'স ল ডিকশনারি' অনুযায়ী, নির্বাচন মানেই বিকল্প, বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প থেকে বেছে নেওয়া।

নির্বাচনি ব্যবস্থা ধ্বংসের ফলে সমাজে বিরাজমান দায়বদ্ধতার কাঠামো ভেঙে পড়েছে। 'নিম্নমুখী' দায়বদ্ধতার কাঠামো ভেঙে পড়ার ফলে তথাকথিত নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে আর প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর ভোট-ভিক্ষা করতে ভোটারদের দ্বারস্থ হতে হয় না এবং ভোটাদেরও এসব রাজনীতিক-ব্যবসায়ীদের লাল-কার্ড দেখানোর সুযোগ থাকে না। ফলে এসকল (অ)নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জনগণের সুখ-দুঃখ ও মতামতের তোয়াক্কা করতে হয় না। একইসঙ্গে ভোটারবিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদে গিয়ে এসব প্রতিনিধিরা সরকারের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে পারে না। এভাবে 'সমান্তরাল' দায়বদ্ধতার কাঠামোও ভেঙে পড়ার কারণে বাংলাদেশ আজ দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে।

১.৪ জনগণের ম্যান্ডেটহীন ক্ষমতার ভয়াবহতা

জনগণের ম্যান্ডেট ছাড়া একতরফা নির্বাচনের মাধ্যমে ২০১৪ সালে ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা প্রয়োগ করে দেশের সব প্রতিষ্ঠানগুলো দখলে নেওয়া শুরু করে। শুধু স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানই নয়, সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীদের সংগঠনও এ দখলদারিত্ব থেকে বাদ পড়েনি। এর পাশাপাশি চলতে থাকে রাষ্ট্রীয় সব সাংবিধানিক ও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোকে করায়ত্ব করার অশুভ প্রচেষ্টা। মূলত দলবাজ, অযোগ্য-অদক্ষ ও দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিরাই এ প্রাতিষ্ঠানিক ধ্বংসযজ্ঞের সুফল ভোগ করে। একইসঙ্গে চলতে থাকে বিরোধী দল ও প্রতিবাদী কণ্ঠরোধে ব্যাপক দমন-পীড়ন ও মানবতা বিরোধী অপরাধ।

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের ২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত শাসনামলে দেশে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন ২ হাজার ৬৯৯ জন (*বণিক বার্তা*, ০৫ অক্টোবর ২০২৪)। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের গঠন করা গুম কমিশনের অন্তর্বর্তী প্রতিবেদনে ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত গত ১৫ বছরের এক হাজার ৬৭৬টি জোরপূর্বক গুমের অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে। এছাড়া বিরোধী দলকে নিপীড়নের জন্য কারা হেফাজতে নির্যাতন এবং কারারুদ্ধ করার ঘটনা আছে অসংখ্য। তৎকালীন প্রধান বিরোধী দল বিএনপি ২০২২ সালে জানায়, ২০০৯ থেকে ২০২২ সালের মে পর্যন্ত তাদের প্রায় ৩৬ লাখ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে এক লাখ ৬০৯টি মামলা হয়েছে। এ সময়ে অন্তত ১ হাজার ৫২৯ জনকে হত্যা এবং কমপক্ষে এক হাজার ২০৪ জনকে গুম করা হয়েছে। এ ছাড়া আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দ্বারা ১১ হাজার ৩২৬ জনকে গুরুতর জখম ও আহত করা হয়েছে (*মানবজমিন*, ২৯ মে ২০২২)। 'গায়েবি' মামলা বলে একটি পরিভাষাই তৈরি হয়েছে বিগত সরকারের সময়।

প্রত্যেকটি কর্তৃত্বপরায়ণ সরকার তার ক্ষমতা সুসংহত করতে রাষ্ট্রের 'ফোর্থ এস্টেট' গণমাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আওয়ামী লীগ সরকারের বিগত ১৫ বছরের শাসনামলেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। বিগত সরকার মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপরে তীব্র চাপ তৈরি করেছিল। অনৈতিক সুবিধা দিয়ে এবং চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের গণমাধ্যমগুলোকে সরকার প্রায় পূর্ণ কর্তৃত্বে নিয়েছিল।

গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জনগণের কণ্ঠরোধ করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল কুখ্যাত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন। অপরাধের সংজ্ঞায়ন অত্যন্ত অস্পষ্ট রেখে যেকোনো মত প্রকাশকেই অপরাধ হিসেবে সংজ্ঞায়ন করার সুবিধে রেখে এই আইনটিকে অস্ত্রে এবং অস্যখ্য মানুষকে এর ভিকটিমে পরিণত করা হয়।

সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস)-এর এক গবেষণায় ২০১৮ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ১ হাজার ৪৩৬টি মামলার তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। এই পাঁচ বছরে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে করা মামলায় ৪ হাজার ৫২০ জন অভিযুক্ত এবং ১ হাজার ৫৪৯ জন গ্রেপ্তার হয়েছেন। অভিযুক্তের মধ্যে ৩২ শতাংশের বেশি রাজনীতিবিদ, ২৯ দশমিক ৪০ শতাংশ সাংবাদিক। এ ছাড়া অভিযোগকারীর প্রায় ৭৮ শতাংশই আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত (*প্রথম আলো*, ৩০ এপ্রিল ২০২৪)। এই আইনে কমপক্ষে ৬৮ জন শিশুর বিরুদ্ধে মামলার তথ্য জানা যায়। অন্যায়ভাবে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হয়ে লেখক মুশতাকের কারাগারে মৃত্যু সারাদেশকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল, সাড়া ফেলে দিয়েছিল বিশ্বব্যাপী।

দেশ-বিদেশে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনটি পরিচিত হয়ে ওঠে সরকারের ভিন্নমত দমনের এক হাতিয়ার হিসাবে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতার পরিস্থিতি নিয়ে কাজ করা বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স (আরএসএফ) ২০২১ সালেই শেখ হাসিনাকে গণমাধ্যমের জন্য শিকারী প্রাণী (প্রিডেটর) হিসেবে চিহ্নিত করে।[৫]

[৫] https://rsf.org/en/protagonist-sheikh-hasina

১.৬ সীমাহীন দলীয়করণ

ক্ষমতায় টিকে থাকতে দেশের সরকারি বেসরকারি ক্ষেত্রে সরকার এক অবিশ্বাস্য মাত্রার দলীয়করণ করেছিল, যা ছিল 'দিনবদলের সনদে' করা অঙ্গীকারের নগ্ন বরখেলাপ। রাষ্ট্রের পুলিশ, প্রশাসন শুধু দলীয়ভাবে অনুগতদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। কারো বিষয়ে আনুগত্য নিয়ে ন্যূনতম সন্দেহ থাকলে তাকে সরিয়ে নেওয়া হতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থেকে। নিয়োগ এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রেও ছিল একচ্ছত্র দলীয়করণ।

দলীয়করণের থাবা থেকে মুক্ত ছিল না রাষ্ট্রের বিচার বিভাগও। ঐতিহাসিকভাবেই বাংলাদেশে বিচার বিভাগ কখনোই প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা ভোগ করেনি। কিন্তু বিচার বিভাগকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে রাখার জন্য রাষ্ট্রের বিচার বিভাগকে যে মাত্রায় এবং ব্যাপ্তিতে দলীয়করণ করা হয়েছে তা ইতঃপূর্বে আর কখনো হয়নি। নিম্ন আদালত সম্পূর্ণভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণে তো ছিলই, উচ্চ আদালতের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য বিচারকদের মনে ভীতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইতিহাসের নজিরবিহীন ঘটনা ঘটানো হয়েছিল – সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংবিধানের ষোড়শতম সংশোধনীকে অবৈধ বলে ঘোষণা করা একজন পদাসীন প্রধান বিচারপতিকে পদচ্যুত করে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছিল। দেশত্যাগের আগে ওই বিচারপতিকে রাষ্ট্রীয় বিশেষ বাহিনী দ্বারা শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করারও অভিযোগ উঠেছে।

দলীয়করণের ব্যাপকতা সবচেয়ে তীব্র হয়েছিল অর্থনীতিতে। বলাবাহুল্য, অবৈধভাবে ক্ষমতায় থাকার প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে সম্পদ অর্জন করা। বিগত সরকারের সময় বাংলাদেশকে পরিণত করা হয়েছিল একটি ক্লেপ্টোক্রেসি বা চোরতন্ত্রে, যা এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে শাসকগোষ্ঠী রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে নিজেদের অনুকূলে আইন তৈরি করার মাধ্যমে এবং আইন বহির্ভূতভাবে রাষ্ট্র এবং জনগণের অর্থ চুরি করেন।

বিগত সরকারের সময়ে লুটপাটের জন্য দেশের অর্থনৈতিক খাত তুলে দেওয়া হয়েছিল সরকারের একেবারে অনুগত কিছু অলিগার্কের হাতে। বৃহৎ অবকাঠামো নির্মাণ, ব্যাংক, বিদ্যুৎ খাত এবং অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যপণ্যের মতো খাত থেকে লুট করা হয়েছে অকল্পনীয় পরিমাণ অর্থ। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর দেশের অর্থনীতির প্রকৃত চিত্র খুঁজে বের করার জন্য বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি গঠন করে। প্রতিবেদনটি অর্থনীতিতে অকল্পনীয় রকম দুর্নীতির চিত্র বের করে এনেছে। প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সরকারি বিনিয়োগের জন্য বিভিন্ন পণ্য ও সেবা কেনা হয়েছে, তাতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৭ লাখ কোটি টাকা। এই অর্থ সড়ক, সেতু, বিদ্যুৎ অবকাঠামো, হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ ইত্যাদি খাতে ব্যয় হয়েছে। এ থেকে ঘুষ হিসেবেই দিতে হয়েছে ১ লাখ ৬১ হাজার কোটি থেকে দুই লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকার মতো।

শ্বেতপত্র অনুযায়ী, দেশের ব্যাংক খাতে দুর্দশাগ্রস্ত ঋণের পরিমাণ ৬ লাখ ৭৫ হাজার কোটি টাকা, যা দিয়ে ১৩টি মেট্রোরেল বা ২২টি পদ্মা সেতু নির্মাণ করা যেত। গত দেড় দশকে রাষ্ট্রীয় সংস্থার সহায়তায় ব্যাংক দখল করা হয়েছে। বড় অঙ্কের অর্থ দেশের বাইরে পাচার করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে প্রতারণা, কারসাজি, প্লেসমেন্ট শেয়ার ও আইপিওতে জালিয়াতির মাধ্যমে শেয়ারবাজার থেকে ১ লাখ কোটি বা ১ ট্রিলিয়ন টাকা আত্মসাৎ হয়েছে বলে শ্বেতপত্রে উঠে এসেছে। রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ পাচার হয়েছে বিদেশে। শ্বেতপত্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিগত সরকারের আমলে, ২০০৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ২৩ হাজার ৪০০ কোটি ডলার বিদেশে পাচার হয়েছে। বর্তমান বাজার দরে (প্রতি ডলারের দাম ১২০ টাকা) এর পরিমাণ ২৮ লাখ কোটি টাকা। এই হিসেবে প্রতিবছর গড়ে ১ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে।

১.৭ সংস্কারের অপরিহার্যতা

২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ফ্যাসিবাদ/মাফিয়াতন্ত্রের পতনকেই প্রধান লক্ষ্য করে মানুষ নেমে এসেছিল রাস্তায়। প্রায় দুই হাজার শহিদ আর প্রায় ২৫ হাজার আহত (যাদের মধ্যে অঙ্গহানি হওয়া আর আহত হওয়া মানুষ আছে শত শত) মানুষের নজিরবিহীন আত্মত্যাগে অর্জিত মুক্ত বাংলাদেশের নাগরিকদের প্রত্যাশায় স্বৈরতন্ত্রের পতনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল এই প্রত্যাশাও – ফ্যাসিবাদ/মাফিয়াতন্ত্র যেন আর ফিরে না আসে; ভবিষ্যতের বাংলাদেশের যাত্রা যেন হয় উদার গণতান্ত্রিক পথে। সে লক্ষ্যে সাম্প্রতিক সময় রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে 'সংস্কার' শব্দটি হয়ে দাঁড়িয়েছে সবচেয়ে বড় আলোচনার বিষয়। বহু কাঙ্ক্ষিত ও আলোচিত এ সংস্কারের মূল লক্ষ্য হবে একদিকে জনগণের হরণ করা ভোটাধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পুনরুদ্ধার এবং একইসঙ্গে রাষ্ট্র মেরামত।

জনগণের সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্বে আসার পর প্রাথমিকভাবে ছয়টি এবং পরবর্তীতে আরও পাঁচটি সংস্কার কমিশন গঠন করে। সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে কমিশনের সদস্যগণ তাঁদের নিজস্ব জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে বিভিন্ন অংশীজনের মতামতকে বিবেচনায় নিয়ে সংস্কারের প্রস্তাবনা তৈরি করবেন। সেই প্রস্তাবনা নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সংস্কারের একটি রূপরেখা তৈরি করবে।

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ যাত্রাপথ কেমন হবে, সেটা নিয়ে নানা রকম মতামত আছে, আছে একটা গণতান্ত্রিক সমাজের অনিবার্য বৈশিষ্ট্য, পারস্পরিক তর্ক-বিতর্ক। তাই শেখ হাসিনার পতনের পর সংস্কার বিষয়ে আমরা একমত, কিন্তু সেটার ক্ষেত্র এবং ব্যাপ্তি নিয়ে নিয়ে বিতর্ক আছে। আশা করা যায় বিভিন্ন অংশীজনের পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে এই মতপার্থক্য কমিয়ে আনা সম্ভব হবে এবং সংস্কার বাস্তবায়নের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে আমরা দ্রুত পৌঁছাতে পারব, যার মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ সৃষ্টির পথে আমরা এগিয়ে যাব।

১.৮ নির্বাচনি ব্যবস্থার সংস্কার

গত দেড় দশকে বাংলাদেশ যত সংকটের মধ্য দিয়ে গেছে, সেটার শুরু হয়েছে নির্বাচন ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়ার কারণে। তাই নির্বাচনি ব্যবস্থার সংস্কার আজ জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার। এই অগ্রাধিকারকে বাস্তবে রূপায়িত করতে গত ৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ থেকে আমরা আট সদস্যের 'নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনে'র সদস্যগণ সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছি, যাতে গত জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে যাঁরা আহত-নিহত হয়েছেন তাঁদের আত্মত্যাগ বৃথা না যায়।

আমরা শুরুতেই ১৮টি ক্ষেত্রকে সংস্কারের অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছি, যেগুলো হলো: (১) নির্বাচন কমিশন; (২) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা; (৩) রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন; (৪) জাতীয় সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন; (৫) সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ; (৬) রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন; (৭) জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) ব্যবস্থাপনা ও ভোটার তালিকা; (৮) জাতীয় সংসদ নির্বাচন; (৯) জাতীয় সংসদে সংসদ নির্বাচনে নারীর প্রতিনিধিত্ব; (১০) প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থা; (১১) অনলাইন (ইন্টারনেট) ভোটিং; (১২) নির্বাচনি অপরাধ; (১৩) নির্বাচনি বিরোধ ও বিচার ব্যবস্থাপনা; (১৪) নির্বাচনি পর্যবেক্ষণ ও গণমাধ্যম নীতিমালা; (১৫) রিকল বা প্রতিনিধি প্রত্যাহার; (১৬) নির্বাচনি ব্যয়; (১৭) গণভোট (১৮) স্থানীয় সরকার নির্বাচন।

আমরা নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সদস্যগণ জাতীয় সংসদ এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সকল আইন, বিধি-বিধান, রীতি এবং ব্যবস্থাপনা বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে এর সমস্যাগুলো চিহ্নিত করার মাধ্যমে বেশকিছু প্রাথমিক সুপারিশ তৈরি করেছি। পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আসন্ন নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত অসংখ্য অংশীজনের মতামত নিয়েছি। রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে থেকে লিখিত মতামত নিয়েছি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সহায়তায় জাতীয়ভাবে একটি জরিপও করেছি। নির্বাচনি দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করার মাধ্যমে বিগত তিনটি নির্বাচনের সমস্যা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। ঢাকায় এবং অন্যান্য বিভাগীয় শহরে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে আমরা মতবিনিময় করেছি। মোবাইলে এসএমএস প্রেরণ, ওয়েবসাইট, ই-মেইল ও ফেসবুকের মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের কাছেও মতামত আহ্বান করেছি, যাতে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিতের লক্ষ্যে পরামর্শের জন্য প্রবাসীদের সঙ্গে অনলাইন সভা করেছি।

সকল অংশীজনের মতামত বিবেচনা করে আমরা গ্রহণযোগ্য মতামতগুলোর ভিত্তিতে একগুচ্ছ প্রাথমিক সুপারিশ তৈরি করেছি। পরবর্তীতে এগুলো আরও পরিমার্জন করে সুপারিশগুলো চূড়ান্ত করেছি। কমিশনের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে কমিশন সদস্যদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং বিবেচনাবোধের সঙ্গে সকল পর্যায়ের অংশীজনের মতামত যুক্ত হবার ফলে এগুলো নাগরিকদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

মোট ১৮টি অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে আমরা প্রায় দুই শতাধিক সুপারিশ প্রণয়ন করেছি, যা নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠায় এবং আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যকর করার ব্যাপারে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা মনে করি। এ লক্ষ্যে আমরা একটি সমন্বিত 'নির্বাচন কমিশন আইনে'র খসড়া প্রণয়ন করেছি। খসড়া আইনে শুধু রাজনৈতিক ঐকমত্য ও নাগরিক সমাজের অর্থবহ অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে সৎ, যোগ্য ও সুনামসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ দেওয়ার বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত হয়নি, এতে আরও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কমিশনের কার্যপরিধি, দায়িত্ব, ক্ষমতা, জনবল ও দায়বদ্ধতার বিষয়গুলো। আমাদের উচ্চ আদালত স্বীকৃতি দিয়েছে যে, আমাদের নির্বাচন কমিশনের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা রয়েছে এবং সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে কমিশন আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের সঙ্গে সংযুক্তও করতে পারে।[৬] আমরা এ অসম ক্ষমতাধর প্রতিষ্ঠানটিকে আরও ক্ষমতাবান করার লক্ষ্যে নির্বাচনে প্রার্থীর মনোনয়ন চূড়ান্ত করার ব্যাপারে কমিশনের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করার এবং আদালতের ক্ষমতা সীমিত করার সুপারিশ করেছি। আমরা নির্বাচন সুষ্ঠু না হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে কমিশনের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টে রেফারেন্স পাঠিয়ে ৯০ দিনের জন্য নির্বাচন স্থগিত করার সুপারিশ করেছি। সুপারিশ করেছি কমিশনের নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যয় প্রজাতন্ত্রের কন্সলিডেটেড অ্যাকাউন্টে দায়যুক্ত করার – বর্তমানে শুধু কমিশনারদের পারিশ্রমিক ও সচিবালয়ের ব্যয় প্রজাতন্ত্রের কন্সলিডেটেড অ্যাকাউন্টে দায়যুক্ত।

বর্তমানে নির্বাচনি আইনকানুনে পরিবর্তন ও আর্থিক বরাদ্দের জন্য নির্বাচন কমিশন আইন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথা নির্বাহী বিভাগের ওপর নির্ভরশীল – বস্তুত তাদের কাছেই 'দায়বদ্ধ'। এমন অনাকাঙ্ক্ষিত সম্পর্ক দূরীকরণের লক্ষ্যে জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে স্পিকারের নেতৃত্বে সংসদের উচ্চকক্ষের একটি সর্বদলীয় কমিটির মাধ্যমে, কমিশনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে, সকল বিষয়াদি মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনার আমরা সুপারিশ করেছি। প্রস্তাবিত সংসদীয় কমিটির দায়িত্ব হবে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করা, কমিশনের কাজে হস্তক্ষেপ করা বা কমিশনকে নিয়ন্ত্রণ করা নয়। এছাড়াও আমরা প্রস্তাব করেছি যে দায়িত্ব থেকে অবসরের পর কমিশনের বিরুদ্ধে কোনো গুরুতর অসদাচরণের বা শপথ ভঙ্গের অভিযোগ উঠলে তা বিশেষ সংসদীয় কমিটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থার জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করবে। নির্বাচন কমিশনের জন্য এ ধরনের দায়বদ্ধতার কাঠামো অনেক দেশেই বিরাজমান, কারণ একটি গণতান্ত্রিক দেশে কেউই দায়বদ্ধতার উর্ধ্বে নয়। আর দায়বদ্ধতা কিছু গার্ডরেইল তৈরি করে প্রতিষ্ঠানকে অন্যায় আচরণ থেকে দূরে রাখে।

---

[৬] *Altaf Hossain vs Abul Kashem* [45 DLR (AD) (1993)].

আরও সুস্পষ্টভাবে বলতে গেলে, যেহেতু নির্বাচন কমিশনই সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সাংবিধানিকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথা নির্বাচনের কস্টোডিয়ান, আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করেছি কমিশনকে আরও ক্ষমতায়িত ও শক্তিশালী করতে। তবে দায়বদ্ধতাহীন ক্ষমতা স্বৈরতন্ত্রেরই নামান্তর, যা আমরা গত ১৫ বছরে বাংলাদেশে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। প্রসঙ্গত, যে আইনের/অধ্যাদেশের মাধ্যমে এনআইডি ব্যবস্থাপনা সরকার নির্বাচন কমিশন থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিল, তা আমাদের প্রাথমিক প্রস্তাব পেশ করার পর সরকার ইতোমধ্যে বাতিল করেছে।

আমাদের নির্বাচনি ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার একটি অন্যতম কারণ হলো আমাদের দুর্বৃত্তায়িত নির্বাচনি অঙ্গন। নির্বাচনি অঙ্গনকে কলুষমুক্ত করার লক্ষ্যে সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের যোগ্যতা-অযোগতার মাপকাঠিকে কঠোর করার আমরা সুপারিশ করেছি। ঋণখেলাপিদেরকে নির্বাচনি মাঠ থেকে আমরা দূরে রাখার প্রস্তাব করেছি। আমরা দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদেরকে বিচারিক আদালত বা আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হওয়ার দিন থেকে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য করার সুপারিশ করেছি। একইসঙ্গে আইনানুগভাবে অযোগ্য করার সুপারিশ করেছি আমাদের দেশে যারা ভয়াবহ মানবতা বিরোধী অপরাধ করেছে তাদেরকে। নির্বাচনে প্রার্থীদের হলফনামার ছকে পরিবর্তন আনা এবং প্রার্থীদের জমা দেওয়া হলফনামা যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করা এবং এতে ভুল তথ্য দেওয়ার বা তথ্য গোপনের প্রমাণ পেলে নির্বাচনের আগে প্রার্থিতা বাতিল এবং নির্বাচনের পরে যে কোনো সময় প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল করার সুপারিশও আমরা করেছি।

নির্বাচনি অঙ্গনকে কলুষমুক্ত করার পাশাপাশি আমরা আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনকেও পরিচ্ছন্ন, স্বচ্ছ ও দলের নেতাকর্মীদের কাছে দায়বদ্ধ করার সুপারিশ করেছি। নিবন্ধনের শর্ত হিসেবে আমরা সুপারিশ করেছি রাজনৈতিক দলের সদস্যদের বাৎসরিকভাবে একটি তালিকা করে তা প্রকাশের এবং এ তালিকা ব্যবহার করে দলের সব স্তরের কমিটি নির্বাচনের। একইসঙ্গে আমরা সুপারিশ করেছি দলের সদস্যদের চাঁদা এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনুদান ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে গ্রহণ ও স্বচ্ছতার সঙ্গে ব্যয় করার এবং ব্যয়ের অডিট করা হিসাব নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়ার ও তা প্রকাশ করার। আমরা নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকে *তথ্য অধিকার আইন*, ২০০৯-এর আওতায় আনার সুপারিশ করেছি। এছাড়াও আমরা সুপারিশ করেছি রাজনৈতিক দলের প্রাথমিক সদস্যদের ভোটে প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকার জন্য তিন সদস্যের একটি প্যানেল তৈরি করার, যে প্যানেল থেকে দলের কেন্দ্রীয় মনোনয়ন বোর্ড সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার জন্য একজনকে মনোনয়ন দেবে। আমরা সুপারিশ করেছি রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তির ছাত্র, শিক্ষক ও শ্রমিক সংগঠন এবং বিদেশি শাখা বিলুপ্ত করার। এছাড়া যারা সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অযোগ্য তাদেরকে আমরা নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের প্রাথমিক সদস্য এবং কোনো কমিটির সদস্য হওয়া থেকেও বিরত রাখার সুপারিশ করেছি।

জাতীয় সংসদকে কার্যকর ও কলুষমুক্ত রাখার লক্ষ্যে আমরা রিকল ব্যবস্থার সুপারিশ করেছি। একইসঙ্গে আমরা 'না-ভোটে'র বিধান ফিরিয়ে আনার সুপারিশ করেছি। আরও সুপারিশ করেছি জাতীয় নির্বাচনে যেসব আসনে ৪০ শতাংশের কম ভোট পড়বে, সেগুলোতে পুনর্নির্বাচন আয়োজনের। একইসঙ্গে যারা ২০১৮ সালের জালিয়াতির নির্বাচনের আয়োজন করেছিলেন তাদেরকে তদন্তসাপেক্ষে বিচারের আওতায় আনার আমরা সুপারিশ করেছি। ২০১৪ ও ২০২৪ সালে যারা একতরফা ও পাতানো নির্বাচনের আয়োজন করেছিলেন তাদেরকেও এই তদন্তের আওতায় আনা যেতে পারে।

জাতীয় সংসদে বিদ্যমান সংরক্ষিত নারী আসন সম্পূর্ণ আলংকারিক এবং এটি নারীদের জন্য মর্যাদাকরও নয়। তাই আমরা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা ৪০০-তে উন্নীত করে ১০০ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষণ করার এবং এগুলো ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে পূরণের সুপারিশ করেছি। এ পদ্ধতিতে প্রথম দফায় লটারি বা অন্য কোনো বিকল্প পদ্ধতিতে ১০০ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে, যেখানে শুধু নারীরাই যোগ্যতার ভিত্তিতে একে অপরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। অন্য ৩০০টি সাধারণ আসনে নারী-পুরুষ উভয়েই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। দ্বিতীয় দফায় অন্য ১০০ আসন অনুরূপভাবে নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তৃতীয় দফায় অন্য ১০০ আসন এবং চতুর্থ দফায় বাকি ১০০টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এই পদ্ধতিতে ২০ বছরের মধ্যে প্রতিটি আসন থেকে একজন নারী যোগ্যতার ভিত্তিতে সরাসরি নির্বাচিত হয়ে আসার সুযোগ পাবেন এবং জনগণের ভেটে এসব নির্বাচিত নারীরা তাদের পুরুষ সহকর্মীদের মতো একই ক্ষমতা, দায়দায়িত্ব ও সুযোগসুবিধা ভোগ করবেন। এদের মধ্যে যোগ্য নারীরা ভালো কাজ ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে পরবর্তীতে তাদের পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে জিতে আসতে পারবেন। এভাবে এক সময়ে নারীদের জন্য আর সংরক্ষিত আসন রাখারই প্রয়োজন পড়বে না। আমরা মনে করি যে, এটি একটি যুগান্তকারী প্রস্তাব এবং এর মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের এক অপূর্ব ও ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হবে, যদিও এর জন্য সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন পড়বে।

টাকার খেলা আমাদের রাজনীতিকে চরমভাবে কলুষিত করেছে। 'উই হেভ দ্য বেস্ট ডেমোক্রেসি মানি ক্যান বাই।' টাকা দিয়ে কেনা যায় এমন গণতন্ত্র আমাদের দেশে বিরাজ করছে। এ লক্ষ্যে 'দৃশ্যমান' নির্বাচনি ব্যয় নিরীক্ষণের লক্ষ্যে আমরা সুপারিশ করেছি। আমরা সুপারিশ করেছি পোস্টার, বিল বোর্ড ইত্যাদি বন্ধের। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত 'অদৃশ্য' নির্বাচনি ব্যয় – মনোনয়ন বাণিজ্য ও ভোট-কেনা বেচা বন্ধের ব্যাপারে আমরা হলফনামার মাধ্যমে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সম্পদের বিবরণী প্রদানের এবং তা যাচাই-বাছাই করার সুপারিশ করেছি। তবে এসব অদৃশ্য ব্যয় বন্ধ করা না করা নির্ভর করবে আমাদের সম্মানিত রাজনীতিবিদদের এবং তাঁদের নৈতিকতাবোধের ওপর। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, নৈতিকতাবোধ কেউ কাউতে শেখাতে পারে না। তবে আমরা আশাবাদী হতে চাই যে চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে অসম সাহসিকতা দেখিয়ে যে বীর সেনানীরা আহত-নিহত হয়েছেন এবং আমাদের জন্য একটি গণতান্ত্রিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সৃষ্ঠির অপূর্ব সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করে দিয়ে গেছেন, সে সুযোগ আমরা নষ্ট করব না এবং তাদের রক্তের সাথে আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করব না।

দলীয় প্রতীকে নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চরমভাবে কলুষিত হয়েছে। তাই আমরা নির্দলীয়ভাবে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সুপারিশ করেছি। দলীয়করণের দুষ্টু থাবা থেকে দূরে রাখতে আমরা সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সরাসরিভাবে মেয়র/চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার বিধান করার সুপারিশ করেছি। আমরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা প্রদানের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টির সুপারিশ করেছি। একইসঙ্গে আমরা সুপারিশ করছি ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব নির্ধারণের। এছাড়াও আমরা বাজেটের ৩০ শতাংশ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দের সুপারিশ করছি।

আমাদের প্রায় দেড় থেকে দুই কোটি বাংলাদেশি প্রবাসে বসবাস করে এবং এদের একটি অংশ ভোটার নন এবং প্রায় অধিকাংশই ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত। এ বিরাট জনগোষ্ঠী ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত থাকলে আমাদের নির্বাচনি ফলাফল প্রশ্নবিদ্ধ না হয়ে পারে না। আমরা প্রবাসী বাংলাদেশিদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার এবং জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) কার্ড দেওয়ার সুপারিশ করেছি। আমরা প্রবাসীদের জন্য পোস্টাল ব্যালট বা ই-ভোটিং ব্যবস্থা করার সুপারিশ করেছি। এছাড়াও এনআইডি ব্যবস্থাপনা আমরা সাময়িকভাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে নির্বাচন কমিশনে ফিরিয়ে আসার সুপারিশ করলেও আগামী সাত বছরের মধ্যে একটি স্বাধীন কমিশনের কাছে হস্তান্তরের আমরা সুপারিশ করেছি। কারণ এনআইডি ব্যবস্থাপনা কারিগরিভাবে একটি জটিল বিষয় এবং এর ব্যাপ্তি বিশাল, তাই নির্বাচন কমিশনের পক্ষে জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচন আয়োজনের পাশাপাশি এ বিশাল কর্মযজ্ঞ সুচারুরূপে পালন করা সম্ভব নয়। এছাড়াও এটাই হলো আন্তর্জাতিক প্র্যাকটিস।

সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ১০০ আসন নিয়ে সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদের উচ্চকক্ষ সৃষ্টির আমরা সুপারিশ করেছি। প্রত্যেক দলের প্রাপ্ত আসনের ৫০ শতাংশ দলের সদস্যদের মধ্য থেকে এবং অবশিষ্ট ৫০ শতাংশ আসন নির্দলীয় ভিত্তিতে নাগরিক সমাজ, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, মানবসেবা প্রদানকারী, শ্রমজীবীদের প্রতিনিধি, নারী উন্নয়নকর্মী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ইত্যাদির মধ্য থেকে সংখ্যানুপাতিক হারে নির্বাচিত করার আমরা সুপারিশ করেছি, যাদের মধ্যে কমপক্ষে ৩০ শতাংশ হবেন নারী। আমরা সংসদের উচ্চকক্ষের সদস্যদের বয়স ন্যূনতম ৩৫ বছর এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম স্নাতক নির্ধারণ করার প্রস্তাব করেছি।

আমরা দলনিরপেক্ষ, সৎ, যোগ্য ও সুনামসম্পন্ন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি করার সুপারিশ করেছি। আমরা জাতীয় সংসদের উভয় কক্ষের সদস্য এবং স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত বৃহত্তর নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করার সুপারিশ করেছি।

আমরা প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সর্বোচ্চ সীমিত করার সুপারিশ করেছি। পাশাপাশি দুইবার নির্বাচত প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের অযোগ্য করার সুপারিশ করেছি। এছাড়াও একই ব্যক্তিকে একইসঙ্গে দলীয় প্রধান, প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ নেতা না করার সুপারিশ করেছি।

অতীতের সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ নিয়ে ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। একটি গুরুতর অভিযোগ করা হয় যে, সীমানা নির্ধারণে কারসাজির আশ্রয় নিয়ে একটি দলকে অতীতের নির্বাচনে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই বহুল ব্যবহৃত আন্তর্জাতিক নীতিমালা অনুসরণে একটি আলাদা স্বাধীন কর্তৃপক্ষের সহায়তায় সীমানা নির্ধারণের কাজটি করার আমরা সুপারিশ করেছি। এর মাধ্যমে স্বাধীন কর্তৃপক্ষের কাছে নির্বাচন কমিশনের মতামত প্রদানের সুযোগ থাকবে। তবে আগামী নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের সহায়তায় একটি বিশেষায়িত কমিটি গঠনের মাধ্যমে এ কাজটি সম্পন্ন করার আমরা সুপারিশ করেছি।

নির্বাচনের সময় আচরণবিধি লঙ্ঘনের অনেক অভিযোগ ওঠে, যা অনেক সময়ই সুরাহা হয় না। একইভাবে অনেক নির্বাচনি অপরাধেরও শাস্তি হয় না। গত তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জড়িতদের অনেকেই অনেক গুরুতর অপরাধ করেছেন, কিন্তু কেউই শাস্তির আওতায় আসেননি। তাই আমরা নির্বাচনি অভিযোগ এবং অপরাধ ব্যবস্থাপনার জন্য কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছি। ইলেকশান পিটিশান বা নির্বাচনি বিরোধ মিমাংসার ক্ষেত্রে প্রায় সীমাহীন দীর্ঘসূত্রতা এড়াতে আমরা এর বিচারের দায়িত্ব হাইকোর্ট থেকে আবার জেলা জজের নেতৃত্বে জেলায় ফিরিয়ে আনার সুপারিশ করেছি। প্রসঙ্গত, নিকট অতীতে কোনো নির্বাচনি বিরোধই সংসদের

মেয়াদকালে সুরাহা হয়নি। আমরা ২০১৮ সালের জালিয়াতির নির্বাচনের দায় নিরুপণের জন্য একটি 'বিশেষ তদন্ত কমিশন' গঠন করার সুপারিশ করেছি। অন্যান্য সাম্প্রতিক বিতর্কিত নির্বাচনের জন্য দায়ী ব্যক্তিদেরকেও এ তদন্তের আওতায় আনা যেতে পারে। এছাড়াও আমরা দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষক, গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের আচরণবিধি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপযোগী সুপারিশ করেছি।

পরিশেষে, যে বিষয়টি জোরোলোভাবে বলা প্রয়োজন, তা হলো আমরা যে পরিশ্রম করেছি তা সফল হবে যদি আমাদের সুপারিশগুলো ব্যবহার করে আমাদের নির্বাচনি প্রক্রিয়া, পদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়। আর তা ঘটবে আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে যদি পরিবর্তন আসে এবং আমরা যদি অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি। তা না হলে সবই হবে পণ্ডশ্রম।

১.৯ আমাদের কৃতজ্ঞতা

দেশের সব নির্বাচনের আইন, বিধি-বিধান, রীতি, ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করা এবং অংশীজনের মতামত নেওয়া এক দুরূহ কাজ। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের এই দুরূহ পথচলায় সব রকম সাহায্য করেছে এর সঙ্গে সংযুক্ত সব মানুষ। প্রথমদিকে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কমিশনকে অসাধারণ সাহায্য করেছেন। পরবর্তীতে কমিশনের কার্যালয় সংসদ ভবনে স্থানান্তরিত হলে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ একই রকম সহযোগিতা করেছেন। আইন মন্ত্রণালয় থেকে কমিশনের সঙ্গে সংযুক্ত কর্মকর্তাগণও আন্তরিকভাবে সাহায্য করেছেন কমিশনকে। সময় স্বল্পতার মধ্যেও অত্যন্ত কম সময় নিয়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো একটি চমৎকার জরিপ পরিচালনা করেছেন কমিশনের জন্য। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের সুচিন্তিত লিখিত মতামত দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন। ঢাকায় এবং বিভাগীয় শহরগুলোতে মতবিনিময়ের ক্ষেত্রে অংশীজনরা তাদের আন্তরিক মতামত দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন। মতামত জানানোর আহ্বানে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার নাগরিক নানা মাধ্যমে তাদের সুচিন্তিত মতামত পাঠিয়েছেন আমাদের কাছে। এসব মানুষের আন্তরিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা ছাড়া কমিশন তার কাজ প্রত্যাশিতভাবে করতে পারত না। কমিশনের পক্ষ থেকে সবার প্রতি আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেষভাবে আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি কমিশন প্রধানের একান্ত সচিব মো. নেছার উদ্দিন আমিনকে তার সার্বক্ষণিক সাচিবিক সহায়তা প্রদানের জন্য। মো. নেছার উদ্দিন আমিন এবং সুজন-এর গবেষক আনোয়ার ফরহাদ আমাদেরকে এই প্রতিবেদন তৈরির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, যার জন্য আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই।

সারসংক্ষেপ (সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশসমূহ)

১.০ নির্বাচন কমিশন

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন সংবিধানের ১১৮(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ, তাদের কর্মের শর্তাবলি, কমিশনের দায়িত্ব, ক্ষমতা, স্বাধীনতা, কমিশনারদের জবাবদিহিতা, পদত্যাগ, অপসারণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে 'নির্বাচন কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫' শিরোনামে একটি আইনের খসড়া প্রণয়ন করেছে। উল্লেখ্য, খসড়া আইনটি বর্তমান প্রতিবেদনের পরিশিষ্ট-১[৭] এ সংযুক্ত করা হয়েছে।

১.১ নির্বাচন কমিশন গঠন

নির্বাচন কমিশন গঠনের লক্ষ্যে উপরোক্ত আইনে রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে এবং নাগরিক সমাজের অর্থবহ অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে যোগ্য ও সুনামসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারদের নিয়োগ প্রদান করার সুপারিশ করা হয়েছে। [বিকল্প: একটি স্থায়ী জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (National Constitutional Council) গঠনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনসহ সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে, যার জন্য অবশ্য সংবিধান সংশোধন করতে হবে।]

১.২ নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা

(ক) নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন স্থগিত, বাতিল এবং পুনর্নির্বাচনের ক্ষমতা প্রদান করা।

(খ) নির্বাচন কমিশনের সচিব নিয়োগের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে কমিশনের ওপর ন্যস্ত করা।

(গ) নির্বাচনকালীন নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে পারে নির্বাহী বিভাগের পক্ষ থেকে এমন কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের অনুমতি নেওয়ার বিধান করা।

(ঘ) ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালের মতো বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যা বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে, লিখিতভাবে যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রদর্শনপূর্বক, কমিশনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে, ৯০ দিনের জন্য নির্বাচন স্থগিত করার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনকে প্রদানের জন্য রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের কাছে মতামত চাওয়ার বিধান করা।

১.৩ নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব

(ক) জাতীয় নির্বাচন শেষ হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে, ফলাফল গেজেটে প্রকাশের পূর্বে, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচনের সুষ্ঠুতা, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে 'সার্টিফাই' করে তা গণবিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশের বিধান করা।

(খ) নির্বাচনের সুষ্ঠুতা, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কিত নির্বাচন কমিশনের ঘোষণায় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী কোনো রাজনৈতিক দল সংক্ষুব্ধ হলে সেই দলের পক্ষ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল বা সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে অভিযোগ করার সুযোগ সৃষ্টির বিধান করা। কমিশন/আদালত কর্তৃক সর্বোচ্চ ৭ কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি করার বিধান করা।

(গ) স্থানীয় সরকারের নির্বাচন অনুষ্ঠানের পুরো দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের কাছে ন্যস্ত করা।

(ঘ) ভোটার শিক্ষা ও সচেতনতা এবং গবেষণা কার্যক্রমকে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত করা। এসব কার্যক্রমে শিক্ষার্থী ও বেসরকারি সংস্থার সহায়তা গ্রহণ করা।

(ঙ) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক 'ভোটার-প্রার্থী মুখোমুখি' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

(চ) কমিশন কর্তৃক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং তাদের নির্বাচনি ও পোলিং এজেন্টদের সুরক্ষা প্রদানের বিধান করা।

(ছ) আউয়াল কমিশন ২০২৩ সালে যেসব বিতর্কিত রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধন প্রদান করেছে, যথাযথ তদন্তসাপেক্ষে, সেগুলোর নিবন্ধন বাতিল করা।

[৭] নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত প্রতিবেদনের সঙ্গে পরিশিষ্ট সংযুক্ত করা আছে।

১.৪ নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতা

(ক) নির্বাচন কমিশনের আইনি, আর্থিক ও প্রশাসনিক প্রস্তাব কোনো মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে সংসদের প্রস্তাবিত উচ্চকক্ষের (যদি না হয়, তাহলে বিদ্যমান সংসদের অনুরূপ) স্পিকারের নেতৃত্বে একটি সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটির নিকট উপস্থাপনের বিধান করা। (সংসদীয় কমিটি নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে প্রস্তাবগুলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করবে।)

(খ) নির্বাচন কমিশনের মেয়াদকালে কমিশনারদের বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ উঠলে তা সংবিধানের ১১৮ ও ৯৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে সুরাহা করার বিদ্যমান বিধান কার্যকর করা।

(গ) সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে কিংবা শপথ ভঙ্গ করলে কমিশনারদের মেয়াদ পরবর্তী সময়ে উত্থাপিত অভিযোগ প্রস্তাবিত সংসদীয় কমিটি তদন্ত করে সুপারিশসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণের বিধান করা।

(ঘ) আরপিও'র ৯০(ক) ধারা সংশোধনপূর্বক নির্বাচনি অপরাধের মামলা দায়েরের সময়সীমা রহিত করা।

১.৫ রিটার্নিং কর্মকর্তা/সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ

নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রিটার্নিং ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ করা। এ দায়িত্ব পালনের জন্য পর্যাপ্তসংখ্যক কমিশনের কর্মকর্তা পাওয়া না গেলে প্রশাসনসহ অন্য ক্যাডার থেকে নিয়োগ করা।

১.৬ নির্বাচন কমিশনের ব্যয়

প্রশিক্ষণ ভাতা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও ম্যাজিস্ট্রেটদের ভাতার যথার্থতা ও পরিমাণ পর্যালোচনাপূর্বক পুনর্নির্ধারণ বা বাতিল করা। (উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশন তথা সরকারের নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যয় ১৯৭৩ সালে ছিল প্রায় ৩ কোটি টাকা, যা ২০২৪ সালে এসে দাঁড়িয়েছে মোট ১ হাজার ৯২৭ কোটি টাকা।)

১.৭ নির্বাচন কমিশনের কার্যপদ্ধতি

(ক) একটি যৌথ সত্তা হিসেবে দৈনন্দিন রুটিন কার্যক্রম ব্যতীত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলিসহ নির্বাচন কমিশনের সকল সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে বা সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে কমিশনের সভায় গৃহীত হওয়ার বিধান করা।

(খ) নির্বাচন-সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম কমিশনের যৌথ সিদ্ধান্তে পরিচালিত করার বিধান করা।

১.৮ নির্বাচন কমিশনের জনবল

(ক) কমিশনের সচিবালয় এবং আঞ্চলিক কার্যালয়ের অর্গানোগ্রাম ও জনবল কাঠমো একটি আন্তর্জাতিক অডিট ফার্মের মাধ্যমে নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। (উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশনে বর্তমানে ৫ হাজারের অধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন।)

(খ) একটি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য একটি পৃথক সার্ভিস সৃষ্টির বিধান করা।

২.০ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা

(ক) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার মেয়াদ চারমাস নির্ধারিত করে এ মেয়াদকালে জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচন সম্পন্ন করা।

(খ) তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সরকার পরিচালনায় রুটিন কার্যক্রমের বাইরেও সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিবিধানের সংস্কার এবং প্রশাসনিক রদবদলের ক্ষমতা প্রদান করা।

(গ) স্থায়ী 'জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল' (এনসিসি) কর্তৃক, যদি গঠিত হয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের নাম চূড়ান্ত করার এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কর্তৃক অন্য ২০ জন উপদেষ্টাকে নিয়োগের বিধান করা।

(ঘ) সংবিধান সংশোধন কমিশন প্রদত্ত স্থায়ী এনসিসি গঠনের সুপারিশ গৃহীত না হলে, সকল রাজনৈতিক দল, বিশেষজ্ঞ, নাগরিক সমাজ ও সমাজের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠনের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটি রূপরেখা প্রণয়ন করা এবং ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক তা সংসদে পাশ ও বাস্তবায়ন করা।

৩.০ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী

৩.১ রাষ্ট্রপতি

(ক) দলনিরপেক্ষ, সৎ, যোগ্য ও সুনামসম্পন্ন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত করার বিধান করা।

(খ) জাতীয় সংসদের উভয় কক্ষের সদস্য এবং স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত বৃহত্তর নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করার বিধান করা।

৩.২ প্রধানমন্ত্রী

(ক) সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সর্বোচ্চ দুই মেয়াদে সীমিত করা।

(খ) সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে দুইবার নির্বাচত প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের অযোগ্য করা।

(গ) একই ব্যক্তি একইসঙ্গে যাতে দলীয় প্রধান, প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ নেতা হতে না পারেন তার বিধান করা।

৪.০ জাতীয় সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন

(ক) সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ১০০ আসন নিয়ে সংসদের উচ্চকক্ষ সৃষ্টি করা। সংসদ নির্বাচনে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের হারের ভিত্তিতে (সংখ্যানুপাতিকভাবে) আসন বণ্টন করা।

(খ) উচ্চকক্ষের নির্বাচন: প্রত্যেক দলের প্রাপ্ত আসনের ৫০% দলের সদস্যদের মধ্য থেকে এবং অবশিষ্ট ৫০% আসন নির্দলীয় ভিত্তিতে নাগরিক সমাজ, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, মানবসেবা প্রদানকারী, শ্রমজীবীদের প্রতিনিধি, নারী উন্নয়নকর্মী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ইত্যাদির মধ্য থেকে সংখ্যানুপাতিক হারে নির্বাচিত করার বিধান করা।

(গ) দলীয় ও নির্দলীয় সদস্যদের মধ্যে কমপক্ষে ৩০ শতাংশ নারীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা।

(ঘ) উচ্চকক্ষের আসন প্রাপ্তির যোগ্যতার মানদণ্ড মোট প্রদত্ত ভোটের ন্যূনতম তিন শতাংশে নির্ধারণ করা।

(ঙ) সংসদের উচ্চকক্ষের সদস্যদের বয়স কমপক্ষে ৩৫ বছর এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম স্নাতক নির্ধারণ করা।

(চ) উচ্চকক্ষের সদস্যদের অন্যান্য যোগ্যতা-অযোগ্যতা নিম্নকক্ষের যোগ্যতার অনুরূপ করা।

(ছ) উচ্চকক্ষের সদস্যদের বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগসুবিধা আইন দ্বারা নির্ধারিত করা।

(জ) সংবিধানের ৭৮(৫) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একটি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংসদের কমিটিসমূহের এবং সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার নির্ধারণ করা।

(ঝ) বিরোধী দলকে ডেপুটি স্পিকারের পদ দেওয়ার বিধান করা।

৫.০ সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ

(ক) নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত সংশোধিত আইন অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক অনুসরণীয় নীতিমালার আলোকে, সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ করা।

(খ) আশু নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের সহায়তায় যথাযথ দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে নিয়ে একটি বিশেষায়িত কমিটি গঠনের মাধ্যমে সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ করা।

(গ) ভবিষ্যতে সীমানা নির্ধারণের জন্য একটি আলাদা স্বাধীন সীমানা নির্ধারণ কমিশন গঠন করা।

৬.০ রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন

(ক) নতুন দল নিবন্ধনের শর্ত শিথিলের লক্ষ্যে ১০% জেলা এবং ৫% উপজেলা/থানায় দলের অফিস এবং ন্যূনতম ৫,০০০ সদস্য থাকার বিধান করা।

(খ) দলের সাধারণ সদস্যদের তালিকা প্রস্তুত করে তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা এবং উক্ত তালিকা প্রতিবছর একবার হালনাগাদ করা।

(গ) আরপিও'র ১২ ধারা অনুয়ায়ী সংসদ নির্বাচনে অযোগ্য ব্যক্তিদেরকে কোনো নিবন্ধিত দলের সাধারণ সদস্য/কমিটির সদস্য হওয়ার অযোগ্য করা।

(ঘ) দলের সাধারণ সদস্যদের গোপন ভোটে দলের স্থানীয় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল কমিটির সদস্যদের নির্বাচিত করা।

(চ) দলের সাধারণ সদস্যদের গোপন ভোটে প্রতিটি নির্বাচনি এলাকা থেকে সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য তিনজনের একটি প্যানেল তৈরি করা, যা থেকে দলের কেন্দ্রীয় মনোনয়ন বোর্ড কর্তৃক দলীয় মনোনয়ন প্রদানের বিধান করা।

(ছ) দলের সদস্যদের চাঁদা ন্যূনতম ১০০ টাকা ও কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে অনুদান হিসেবে সর্বোচ্চ ৫০ লাখ টাকা নেওয়ার বিধান করা। এ অনুদান ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে গ্রহণের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ট্যাক্স রিটার্নে প্রদর্শনের বিধান করা।

(জ) দলের তহবিল ব্যবস্থাপনায় বর্তমানে বিদ্যমান ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে নিবন্ধিত দল কর্তৃক বাৎসরিকভাবে দাখিলকৃত অডিটেড আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ ও নির্বাচন কমিশনে দাখিলের বিধান করা এবং কমিশনকে এগুলো অডিট করার ক্ষমতা প্রদান করা।

(ঝ) নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকে *তথ্য অধিকার আইন*, ২০০৯-এর আওতাভুক্ত করা।

(ঞ) দলের লেজুড়বৃত্তিক ছাত্র, শিক্ষক ও শ্রমিক সংগঠন, ভ্রাতৃপ্রতিম বা যে কোনো নামেই হউক না কেন, না থাকার বিধান করা।

(ট) দলের, যে কোনো নামেই হউক না কেন, বিদেশি শাখা না থাকার বিধান করা।

(ঠ) দলের সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়নের জন্য দলের তিন বছরের সদস্য পদ থাকা বাধ্যতামূলক করা।

(ড) প্রতি ৫ বছর পর পর দলের নিবন্ধন নবায়ন বাধ্যতামূলক করা।

(ঢ) পর পর দুটি নির্বাচনে অংশ না নিলে দলের নিবন্ধন বাতিলের বিধান বাতিল করা।

৭.০ জাতীয় পরিচয়পত্র ও ভোটার তালিকা

৭.১ জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবস্থাপনা

(ক) *জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন আইন* ২০২৩ – যার মাধ্যমে এনআইডি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর করা হয়েছে – জরুরি ভিত্তিতে বাতিল করা।

(খ) *জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন আইন*-২০১০-তে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে তা পুনর্বহাল করা, যাতে এটি নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত আধুনিক আইডেন্টিটি সিস্টেমকে আইনি ভিত্তি দিতে পারে এবং যার মাধ্যমে প্রতিটি নাগরিক তার আইডেন্টিটি তথ্যের মালিকানা এবং তার সকল আইডেন্টিটি তথ্যের ওপরে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পেতে পারেন।

(গ) জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত বিদ্যমান স্টান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) পর্যালোচনা করে সকল অব্যবস্থাপনা, হয়রানি ও অনিয়মের অবসান ঘটিয়ে এ কার্যক্রমকে জনবান্ধব করা।

(ঘ) ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সকল নাগরিককে হালনাগাদ ছবিযুক্ত এনআইডি স্মার্টকার্ড প্রদানের লক্ষ্যে এখনই প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শুরু করা, যাতে ভবিষ্যতে ভোটার শনাক্তকরণে এটি ব্যবহার করা যায়।

(ঙ) বাংলাদেশের প্রায় সকল গণমাধ্যমে লাখ লাখ বাংলাদেশি নাগরিকের এনআইডি তথ্য ফাঁস হওয়া এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইট ও ম্যাসেজিং প্ল্যাটফর্ম থেকে নামমাত্র মূল্যে বা এমনকি বিনামূল্যে এই তথ্যগুলো ফাঁসের অভিযোগের প্রেক্ষিতে, এই দাবিগুলোর সত্যতা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এবং এমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ফাঁসের অন্তর্নিহিত কারণ, প্রভাব এবং পরিণতি নির্ধারণ করতে স্বাধীন তদন্তের ব্যবস্থা করা এবং দোষী ব্যক্তিদের প্রচলিত আইনে শাস্তির ব্যবস্থা করা।

(চ) একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কাছে জাতীয় পরিচয়পত্রের ডাটাবেজ থাকার যে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে তদন্তসাপেক্ষে জরুরি ভিত্তিতে এব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(ছ) বর্তমানের ১৬ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী বাংলাদেশি নাগরিকের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের পাশাপাশি ভবিষ্যতে ১০ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী শিশুদের জন্য পরিচয় নিবন্ধন কার্যক্রম গ্রহণ করা।

(জ) সারাদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এনআইডি সংক্রান্ত সকল সেবা সুচারুরূপে সম্পন্নের নিমিত্তে দেশের বৃহত্তম জাতীয় তথ্য ভাণ্ডারের নিরবচ্ছিন্ন অপারেশন, আপগ্রেডেশন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের পরিবর্তে আগামী সাত বছরের মধ্যে জাতীয় নাগরিক ডেটা কমিশন (National Citizen Data Commission) নামে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন সংবিধিবদ্ধ কমিশন গঠন করা, যার দায়িত্ব হবে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রণয়ন, সংরক্ষণ ও বিতরণ। এই সংস্থার অর্গানোগ্রাম ও জনবল কাঠামো নির্ণয়ে একটি আন্তর্জাতিক অডিট ফার্মের মাধ্যমে নিরীক্ষণ ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এ কমিশন পূর্ণাঙ্গভাবে গঠিত না হওয়া পর্যন্ত এ কার্যক্রম নির্বাচন কমিশনের অধীনে থাকবে।

(ঝ) ভবিষ্যতে প্রস্তাবিত জাতীয় নাগরিক ডেটা কমিশনের কার্যক্রমের পরিধি আরও বিস্তৃত করে বর্তমানে প্রচলিত কিছু সার্ভিস, যেমন Birth and Death Registration Information system (BDRIS) এবং Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) যাদের মাধ্যমে প্রতিটি নাগরিকের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ ইত্যাদি কার্যকর্মের নিবন্ধন সম্পন্ন করা হয়, তাদেরকে জাতীয় নাগরিক ডেটা কমিশনের অধীনে নিয়ে আসা।

(ঞ) বর্তমানে পরিচালিত সম্পূর্ণ এনআইডি সিস্টেমকে তথা সংশ্লিষ্ট ডাটা সেন্টার, হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার/ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন, ডাটাবেজ, ক্রেডেনশিয়ালস্ (Credentials) ইত্যাদি ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান থেকে প্রস্তাবিত জাতীয় নাগরিক ডাটা কমিশনের নিকট হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা। প্রস্তাবিত আধুনিক আইডেন্টিটি সিস্টেমের জন্য একই ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৭.২ আইডেন্টিটি এবং আইডেন্টিটি সিস্টেম

(ক) জাতীয় পরিচয়পত্রকে ডিজিটাল (ভার্চুয়াল) ভার্সনে রূপান্তরের ব্যবস্থা করা। রিপোর্টে প্রস্তাবিত Self-Sovereign Identity (SSI)-ভিত্তিক আইডেন্টিটি সিস্টেমের মাধ্যমে আমাদের বিদ্যমান এনআইডি কার্ডকে একটি স্ট্যান্ডার্ডাইজ্‌ড ডিজিটাল ফরম্যাটে কার্যকরভাবে রূপান্তর করা। এই লক্ষ্যে আমাদের প্রথম পদক্ষেপ হবে বর্তমান এনআইডি সিস্টেমকে একটি পূর্ণাঙ্গ SSI-ভিত্তিক আইডেন্টিটি সিস্টেমে রূপান্তর করা।

(খ) প্রস্তাবিত SSI-ভিত্তিক আইডেন্টিটি সিস্টেম বাস্তবায়নের পরবর্তী পদক্ষেপ হবে কোনো স্ট্যান্ডার্ডাইজ্‌ড SSI প্রযুক্তি স্ট্যাক ব্যবহার করে প্রস্তাবিত আইডেন্টিটি সিস্টেম ডিজাইন ও ডেভেলাপ করা। একইসঙ্গে প্রয়োজনীয় ট্রাস্ট ফ্রেমওয়ার্ক, Governance ফ্রেমওয়ার্ক এবং আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা এবং অ্যাপ্লিকেশন ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা।

(গ) SSI-ভিত্তিক আইডেন্টিটি সিস্টেমের অনুষঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের স্মার্টফোনের জন্য একটি SSI ওয়ালেট ডেভেলপ করা। এই ওয়ালেটটি ডিজাইন এবং ডেভেলপের সময় এর সিকিউরিটি এবং প্রাইভেসিকে অগ্রাধিকার দেওয়া। তবে যাদের স্মার্টফোন নেই তাদের জন্য ফিচার ফোনভিত্তিক একটি সমাধান ডেভেলপ করা।

(ঘ) প্রস্তাবিত সিস্টেম এবং এর বিভিন্ন সাব-কম্পোনেন্ট ও SSI ওয়ালেটের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত নিরাপত্তা নিরীক্ষা (সিকিউরিটি অডিট) প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে সিকিউরিটি অডিট পরিচালনা করা।

(ঙ) SSI-ভিত্তিক এই সমাধান প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার পরে বিদ্যমান সরকারি এবং বেসরকারি অনলাইন পরিষেবাগুলো রূপান্তরের ব্যবস্থা করা, যাতে এই সিস্টেমের সিকিউরিটি এবং প্রাইভেসি ফিচারগুলোর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয়। এর জন্য আন্তর্জাতিক বেস্ট প্র্যাক্টিসগুলো অনুসরণ করে একটি পরিচয় প্রমিতকরণ (identity standardization) ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা, যাতে দেশের মধ্যে এবং বিশ্বব্যাপী অন্যান্য দেশের সঙ্গে এনআইডি সিস্টেমের আন্তঃপরিচালনযোগ্যতা (interoperability) নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

(চ) প্রস্তাবিত সিস্টেমটি ডেভেলপ করার পরে এটিকে rigorously টেস্ট করা। বিশেষ করে প্রস্তাবিত সিস্টেমটিতে অনেক জটিল এবং পরস্পর সংযুক্ত সাব-কম্পোনেন্ট রয়েছে সেগুলোকেও পৃথকভাবে টেস্ট করা।

(ছ) এরূপ একটি কমপ্রিহেনসিভ জাতীয় পরিচয় ব্যবস্থার সঙ্গে উপযুক্ত ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা এবং গোপনীয়তা (personal data protection and privacy) আইন প্রণয়ন করা। এই আইন দেশের মধ্যে পরিচয় এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য সম্পর্কিত যেকোনো ভবিষ্যৎ অপব্যবহারের বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করবে।

৭.৩ ভোটার তালিকা হালনাগাদকরণ

(ক) বাড়ি বাড়ি গিয়ে সামগ্রিক ভোটার তালিকা যাচাই ও হালনাগাদের মাধ্যমে 'জেন্ডার গ্যাপ'-সহ অন্যান্য অসংগতির অবসান ঘটানো।

(খ) ভোটার তালিকা আইন সংশোধনের মাধ্যমে নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার আগে যাদের ১৮ বছর পূর্ণ হবে তাদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা।

৮.০ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

৮.১ প্রার্থীদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা

(ক) অভ্যাসগত ঋণখেলাপি ও বিল খেলাপিদের প্রার্থী হওয়া থেকে বিরত রাখা। বিশেষত ঋণখেলাপিদের ক্ষেত্রে তাদের তামাদি ঋণ মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার ছয় মাস আগে পরিপূর্ণভাবে শোধ করার বিধান করা। নির্বাচনের পরে যারা আবার ঋণখেলাপি হয়েছেন তাদেরকে সংসদ সদস্য পদে থাকার অযোগ্য ঘোষণার বিধান করা।

(খ) কোনো ফৌজদারি আদালত কর্তৃক ফেরারি আসামি হিসেবে ঘোষিত ব্যক্তিদের প্রার্থী হওয়া থেকে বিরত রাখা।

(গ) ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ জামিনে থাকলে উপযুক্ত আদালত কর্তৃক তার জামিন লাভের জাবেদা/সহিমুহুরী নকল সংযুক্ত করার বিধান করা।

(ঘ) বেসরকারি সংস্থার কার্যনির্বাহী পদে আসীন ব্যক্তিদের প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে ওই পদ থেকে তিন বছর আগে অবসর গ্রহণ সংক্রান্ত আরপিও এর ধারা বাতিল করা।

(ঙ) সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৬(২)(ঘ) এর অধীনে নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে বিচারিক আদালত কর্তৃক দোষী ও দণ্ডিত ব্যক্তি তাঁর দোষী সাব্যস্তের তারিখ থেকেই জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য করা।

(চ) আইসিটি আইনের অধীনে মানবতাবিরোধী অপরাধে কোনো ব্যক্তি আটক, ফৌজদারিতে সোপর্দ, কিংবা দণ্ডিত হলে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বারিত করার বিধান করা।

(ছ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পদত্যাগ না করে সংসদ সদস্য পদে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য করা।

(জ) তরুণ, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু, শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য শতকরা ১০ ভাগ মনোনয়নের সুযোগ তৈরির বিধান করা।

(ঝ) স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১ শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষর জমা দেওয়ার বিধানের পরিবর্তে ৫০০ ভোটারের সম্মতির বিধান করা এবং এ ক্ষেত্রে একক কিংবা যৌথ হলফনামার মাধ্যমে ভোটারদের সম্মতি জ্ঞাপনের বিধান করা।

(ঞ) একাধিক আসনে কোনো ব্যক্তির প্রার্থী হওয়ার বিধান বাতিল করা।

(ট) হলফনামায় মিথ্যা তথ্য দেওয়ার কিংবা তথ্য গোপনের কারণে আদালত কর্তৃক কোনো নির্বাচিত ব্যক্তির নির্বাচন বাতিল করা হলে ভবিষ্যতে তাঁকে নির্বাচনে অযোগ্য করার বিধান করা।

৮.২ মনোনয়পত্র

(ক) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আইনি হেফাজতে থাকা ব্যতীত সকল প্রার্থীর সশরীরে মনোয়নপত্র জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা তৈরি করা।

(খ) নির্বাচনি তফসিলে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সময় বৃদ্ধি করা, যাতে হলফনামা যাচাই-বাছাই করা ও আপিল নিষ্পত্তির জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায়। অন্যদিকে নির্বাচনি প্রচারণার সময় কমানো, যাতে প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয়ে সাশ্রয় হয়।

(গ) প্রার্থিতা চূড়ান্তকরণের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করা। এ লক্ষ্যে আদালতের হস্তক্ষেপের বিষয়টি শুধু 'কোরাম নন জুডিস' ও 'ম্যালিস ইন ল'-এর ক্ষেত্রে সীমিত করা।

(ঘ) মনোনয়নপত্রের সঙ্গে ৫ বছরের আয়কর রির্টানের কপি জমা দেওয়ার বিধান করা।

৮.৩ হলফনামা

(ক) হলফনামার ছকে দেশি-বিদেশি সম্পত্তিসহ আয়কর রিটার্নের কপি সংযোজনের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা এবং হলফনামার তথ্য ব্যাপকভাবে প্রচার করা, যাতে ভোটাররা জেনে-শুনে-বুঝে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।

(খ) হলফনামায় ও আয়কর বিবরণীতে তথ্য গোপন করলে বা ভুল তথ্য দিলে মনোনয়নপত্র/নির্বাচন বাতিল করা।

(গ) প্রার্থী কর্তৃক দাখিল করা মনোনয়নপত্রের সঙ্গে প্রত্যেক দলের পক্ষ থেকে তার প্রার্থীদের জন্য প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্রের পরিবর্তে দলের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক বা অনুরূপ পদধারী ব্যক্তি কর্তৃক হলফনামা জমা দেওয়ার বিধান করা, যাতে তাদের দলীয় মনোনীত প্রার্থীর নামের পাশাপাশি মনোনয়ন বাণিজ্য না হওয়ার ও দলীয় প্যানেল থেকে প্রার্থী মনোনয়ন প্রদানের বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে।

(ঘ) পরবর্তী নির্বাচনের আগে যে কোনো সময় নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচিত ব্যক্তির হলফনামা যাচাই-বাছাই করার এবং হলফনামায় মিথ্যা তথ্য বা তথ্য গোপনের প্রমাণ পেলে তার নির্বাচন বাতিলের ক্ষমতা প্রদানের বিধান করা।

৮.৪ নির্বাচন ব্যবস্থা

(ক) নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের বিধান বাতিল করা এবং ইভিএম ক্রয়ে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত করা।

(খ) নির্বাচনেকালীন সময়ের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সংজ্ঞায় প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করা।

(গ) জাতীয় নির্বাচনে কোনো আসনে মোট ভোটারের ৪০ শতাংশ ভোট না পড়লে পুনর্নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান করা।

(ঘ) বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন বন্ধ, রাজনৈতিক দলগুলোকে সৎ, যোগ্য এবং ভোটারদের কাছে গ্রহণযোগ্য প্রার্থী দেওয়া নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় নির্বাচনে 'না-ভোটে'র বিধান প্রবর্তন করা। নির্বাচনে না-ভোট বিজয়ী হলে সেই নির্বাচন বাতিল করা এবং পুনর্নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাতিলকৃত নির্বাচনের কোনো প্রার্থী নতুন নির্বাচনে প্রার্থী হতে না পারার বিধান করা।

৮.৫ নির্বাচনি আচরণবিধি

(ক) ব্যানার, তোরণ ও পোস্টারের পরিবর্তে লিফলেট, ভোটার-প্রার্থী মুখোমুখি অনুষ্ঠান, পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ও সরকারি গণমাধ্যমে প্রচারের সম-সুযোগ প্রদানের বিধান করা।

(খ) *সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ*, ২০২৪ মেনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারণার বিধান করা।

(গ) ১৯৯০ সালের তিনজোটের রূপরেখার মতো রাজনৈতিক দলের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন করা।

৮.৬ সংসদ সদস্যদের সুযোগসুবিধা

(ক) সংসদ সদস্যদেরকে শুল্কমুক্ত গাড়ি ও আবাসিক প্লট প্রদান বন্ধ করা এবং বিভিন্ন ধরনের ভাতা প্রদানের বিধান পর্যালোচনা ও সংশোধন করা।

(খ) একটি 'সংসদ সদস্য আচরণ আইন' প্রণয়নের মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের বাৎসরিকভাবে সম্পদের হিসাব প্রদান এবং স্বার্থের দ্বন্দ্বের বিষয়সমূহ ঘোষণা করা।

(গ) সংবিধান লঙ্ঘন করে সংসদ সদস্যদের স্থানীয় উন্নয়নে জড়িত থাকার বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতের *আনোয়ার হোসেন বনাম বাংলাদেশ* মামলার রায় কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা এবং সংসদ সদস্যদেরকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টার পদ থেকে অপসারণ করা।

(ঘ) সংসদ সদস্যদের জন্য বিশেষ প্রটোকলের অবসান করা।

৮.৭ ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন

(ক) বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচনের বিধান করা।

৯.০ সংসদ নির্বাচনে নারীর প্রতিনিধিত্ব

(ক) সংসদের (নিম্নকক্ষ) আসন সংখ্যা ১০০ বাড়িয়ে মোট সংখ্যা ৪০০ করা। এই ৪০০ আসনের মধ্যে নারীদের জন্য নির্ধারিত ১০০ আসন ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে নির্বাচনের বিধান করা, যাতে যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট আসন থেকে নারীদের সরাসরি নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং দ্বৈত প্রতিনিধিত্বের অবসান হয়।

১০.০ প্রবাসী পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থা

১০.১ প্রবাসী পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থা

(ক) প্রবাসীদের জন্য একটি তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তাসূচক পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থা ব্যবহার করা, যার মাধ্যমে প্রবাসীদের পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। (আমরা নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে এই লক্ষ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদনে উল্লেখিত দুটি সমাধান প্রস্তাব করছি। প্রবাসীদের ভোটদানের সুযোগ দেওয়ার জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ হবে দুটি সমাধানের মধ্য থেকে একটিকে বেছে নিয়ে তা বাস্তবায়ন করা।)

(খ) প্রস্তাবিত তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তাসূচক পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থার বাস্তবায়নকল্পে দুটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন – ভোটার অ্যাপ এবং ভেরিফায়ার অ্যাপ – যথাযথ ফাংশনালিটিসহ ডেভেলপ করা। এক্সেসেবিলিটি বাড়ানোর জন্য এই অ্যাপ্লিকেশনগুলো অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস উভয় প্ল্যাটফর্মের জন্য ডেভেলপ করা। এছাড়াও প্রস্তাবিত পদ্ধতির জন্য একটি ব্যাকএন্ড সিস্টেম ডেভেলপ করা।

(গ) ডেভেলপকৃত মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনগুলো এবং সিস্টেমের সিকিউরিটি নিশ্চিত করা, যাতে তথ্য সিকিউরলি আদান-প্রদান এবং ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা করা যায়। এর সঙ্গে একটি এক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম এবং immutable অডিট ট্রেলের মাধ্যমে ডাটাবেসের সিকিউরিটি নিশ্চিত করা।

(ঘ) জাতীয় নির্বাচনে প্রস্তাবিত সিস্টেমকে ব্যবহারের আগে এটির ব্যাপক পরীক্ষা/নিরীক্ষা করা। (এজন্য আমরা কমপক্ষে তিন-পর্যায়ের ট্রায়ালের সুপারিশ করছি)।[৮] এই তিন-পর্যায়ের ট্রায়াল প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে যেকোনো অস্বাভাবিকতা শনাক্ত এবং সংশোধন করতে সহায়তা করবে, যা জাতীয় নির্বাচনে সিস্টেমটি ব্যবহারের পথকে সুগম করবে।)

(ঙ) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এক বা একাধিক সিকিউরিটি অডিট ফার্ম দ্বারা ডেভেলপকৃত সিস্টেমটির ক্রমাগত নিরাপত্তা অডিট (Security Audit) করা, যা ডেভেলপকৃত সিস্টেমের ওপরে আস্থা স্থাপনের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে।

(চ) উপরোক্ত নতুন সিস্টেম যাতে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারে সেজন্য এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(ছ) প্রস্তাবিত তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তাসূচক পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থায় সেই সব ভোটারদের বিবেচনা করা যারা এমন সব দেশে বসবাস করেন যেখানে বাংলাদেশের কোনো কনস্যুলেট নেই। এই দেশগুলোর জন্য কোনো কনস্যুলেট কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করবে তা নির্ধারণের জন্য একটি পলিসি প্রণয়ন করা।

(জ) কনস্যুলেট কর্মকর্তাদের প্রবাসী ভোটারদের কাছে পোস্টাল প্যাকেজ বিতরণের লজিস্টিক সংক্রান্ত কাজ কমানোর লক্ষ্যে প্রতিটি পোস্টাল প্যাকেজ বাংলাদেশে প্রস্তুত করে কনস্যুলেটগুলোতে বিতরণ করা। কনস্যুলেটের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক তাদের কাছে পাঠানো পোস্টাল প্যাকেজ সংশ্লিষ্ট দেশের পোস্টাল সার্ভিস ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট প্রবাসী ভোটারদের কাছে বিতরণ করা।

(ঝ) পোস্টাল ভোটিং প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত সমস্ত কার্যক্রম (নিবন্ধন থেকে শুরু করে নির্বাচন কমিশনের ট্রেজারিতে পোস্টাল ব্যালট বক্স নিরাপত্তার সঙ্গে সংরক্ষণ করা পর্যন্ত) সম্পন্ন করার জন্য একটি কার্যকর সময়কাল নির্ধারণ করা।

(ঞ) প্রস্তাবিত পদ্ধতিটি প্রবাসী ভোটারদের মাথায় রেখে ডিজাইন করা। তবে সিস্টেমের কার্যপ্রণালিতে অল্প কিছু পরিবর্তন করে এটি দেশের অভ্যন্তরে অনুপস্থিত ভোটারদের জন্যও ব্যবহার করা। আমাদের ডাক বিভাগের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে যেহেতু সন্দেহ আছে, তাই এই ক্ষেত্রে একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ হবে সংশ্লিষ্ট ভোটারদের কাছে নির্ভরযোগ্যভাবে পোস্টাল প্যাকেজ পাঠানো এবং পরবর্তীতে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে পোস্টাল ব্যালট পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য পোস্টাল প্যাকেজ ট্র্যাক করা যায় এরকম কোনো কুরিয়ার সার্ভিস ব্যবহার করা যেতে পারে।

---

[৮] প্রাথমিক পর্যায়ে সিস্টেমটি একটি দেশে ট্রায়াল করা উচিত, যেখানে প্রায় ৫০ থেকে ১০০ জন প্রবাসী ভোটার অংশগ্রহণ করবেন। পরবর্তীতে এটি পাঁচ থেকে দশটি দেশে ১,০০০ থেকে ৫,০০০ প্রবাসী ভোটারদের মধ্যে এবং শেষ পর্যায়ে সিস্টেমটি যত বেশি সম্ভব দেশে ২০,০০০ বা তার বেশি প্রবাসী ভোটারদের মধ্যে ট্রায়ালের ব্যবস্থা করা উচিত।

১০.২ প্রবাসীদের ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ

(ক) সকল প্রবাসী বাংলাদেশিদের যত দ্রুত সম্ভব ভোটার তালিকায় এবং এনআইডি সার্ভারে নিবন্ধনের ব্যবস্থা করা। নিবন্ধনের সময় তাঁদের বায়োমেট্রিকস তথ্য এবং সাম্প্রতিক ছবি যেন হালনাগাদ করা থাকে এটা নিশ্চিত করা। বর্তমানে প্রচলিত প্রক্রিয়াতে প্রবাসীদের নিবন্ধন করতে যেহেতু অনেক সময় লাগে, এটি আরও অপটিমাইজ করে পুরো প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য কার্যকর কৌশল বের করা। যেহেতু সকল বাংলাদেশি প্রবাসীর পাসপোর্ট রয়েছে, তাই পাসপোর্ট ডাটাবেজে সংরক্ষিত তথ্য ব্যবহার করে নিবন্ধন প্রক্রিয়া দ্রুততর সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা।

(খ) ডিসেম্বর ২০২৫-এ আগামী জাতীয় নির্বাচন হবার সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে অক্টোবর ২০২৫ এর মধ্যে যেসকল প্রবাসীর ভোটার তালিকায় এবং এনআইডি সার্ভারে নিবন্ধন করা সম্ভব হবে, তাদেরকে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনে প্রস্তাবিত পোস্টাল ভোটিং পদ্ধতিতে ভোট দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া।

১১.০ অনলাইন (ইন্টারনেট) ভোটিং

(ক) রিপোর্টে প্রস্তাবিত অনলাইন ভোটিং ব্যবস্থা বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ হবে ব্লকচেইন, সিকিউরিটি, ক্রিপ্টোগ্রাফি, প্রাইভেসি-বর্ধনকারী (privacy-enhancing) প্রযুক্তি এবং অনলাইন ভোটিংয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি প্রযুক্তিগত টাস্কফোর্স প্রতিষ্ঠা করা। এই টাস্কফোর্সে নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য সরকারি মন্ত্রণালয় এবং সংস্থার প্রাসঙ্গিক ডোমেইন বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করা।

(খ) গঠিত এই টাস্কফোর্সের প্রথম দায়িত্ব হবে সফ্টওয়্যার ডেভেলপমেন্টের আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম পদ্ধতি অনুসরণ করে একটি অনলাইন ভোটিং সিস্টেমের আর্কিটেকচার ও প্রোটোকল ডিজাইন এবং সিস্টেমটির ডেভেলপমেন্ট তত্ত্বাবধান করা।[৯]

(গ) সিস্টেমটি তৈরি হয়ে গেলে এর কার্যকারিতা (Functionalities), নিরাপত্তা (Security) এবং ব্যবহারযোগ্যতা (Usability) নিশ্চিত করার জন্য এটিকে যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা।

(ঘ) পরবর্তীতে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এক বা একাধিক সিকিউরিটি অডিট ফার্ম দ্বারা সিস্টেমটির ক্রমাগত নিরাপত্তা অডিট (Security Audit) করা, যা ডেভেলপকৃত সিস্টেমের ওপরে আস্থা স্থাপনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে।

(ঙ) ডেভেলপকৃত সিস্টেমে আস্থা স্থাপনের আরেকটি প্রচলিত পদ্ধতি হলো এর কোডবেসটি প্রকাশ করা, যাতে বিশ্বের যে কেউ এর কোডবেস পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারে। আরেকটি পরিপূরক পদ্ধতি হলো পাবলিক পেনেট্রেশন টেস্টিং এবং বাগ বাউন্টি প্রোগ্রাম চালু করা, যা সিস্টেমের গুরুতর সিকিউরিটি এবং প্রাইভেসির দুর্বলতাগুলো খুঁজে বের করতে সহায়তা করবে।

(চ) একটি সিকিউর অনলাইন ভোটিং সিস্টেম চালু করার লক্ষ্যে দেশের আইনি কাঠামোতে সংশোধন করা। টাস্কফোর্সের প্রধান দায়িত্বগুলোর মধ্যে একটি হবে দেশের বিভিন্ন আইনি কাঠামো বিশ্লেষণ করে কোন কোন জায়গায় প্রয়োজনীয় সংশোধন করা দরকার তা সুপারিশ করা।

(ছ) জনগণের আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে জনগণকে ক্রমাগতভাবে অনলাইন ভোটিং সিস্টেমটি ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়ার মাধ্যমে তাদের ইতিবাচক অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যবস্থা করা। এই লক্ষ্যে প্রথমে ছোট পরিসরের কোনো ভোটিংয়ে এই সিস্টেমটির ট্রায়ালের ব্যবস্থা করা, যাতে ধীরে ধীরে সিস্টেমটির প্রতি জনগণের আস্থা গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে এই ট্রায়ালগুলোর সাফল্যের অভিজ্ঞতা ব্যাপক আকারে ব্যবহারের আদর্শ উদ্দীপক (ideal catalyst) হিসেবে কাজ করতে পারে।

(জ) এরূপ একটি সিস্টেম ডিজাইন করার সময় আমাদের অবশ্যই যাদের স্মার্টফোন নেই সেসব ভোটারদের বিষয়টি বিবেচনা করা। এই শ্রেণির ভোটারদের জন্য আমাদের একটি বিকল্প ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে, যার মাধ্যমে তারা বিকল্প পদ্ধতিতে অনলাইনে ভোট দিতে পারেন।

---

[৯] এ লক্ষ্যে একাধিক বাংলাদেশি বিশ্ববিদ্যালয়, সফ্টওয়্যার ভেন্ডর এবং সরকারি সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে একটি যৌথ প্রকল্প শুরু করা যেতে পারে, যা দেশের অভ্যন্তরে প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। প্রয়োজনে অন্যান্য দেশ যারা অ্যাডভান্সড অনলাইন ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করছে তাদেরকে আন্তর্জাতিক অংশীদার হিসেবে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা।

১২. নির্বাচনি অপরাধ

(ক) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ বা অনিয়ম আইনের আওতায় আনার জন্য প্রস্তাবিত নির্বাচন কমিশন আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(খ) সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধনপূর্বক সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে মামলা করতে কমিশনের অনুমতির বিধান বহাল রেখে তদন্ত বা অনুসন্ধান করতে আইনগত প্রতিবন্ধকতা দূর করা।

(গ) *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২ এর ৯০ ধারায় ৭৩ ও ৭৪ ধারার অধীনে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়সীমা শিথিল করা।

(ঘ) নির্বাচনি অপরাধ বিষয়ক মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতা পরিহারের লক্ষ্যে নিষ্পত্তির সময়সীমা নির্ধারণ করা। ফলে একদিকে যেমন দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি করা যাবে, অন্যদিকে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে।

(ঙ) ২০১৮ সালের জালিয়াতির নির্বাচনের দায় নিরূপণের জন্য একটি 'বিশেষ তদন্ত কমিশন' গঠন করা। অন্যান্য সাম্প্রতিক বিতর্কিত নির্বাচনের জন্য দায়ী ব্যক্তিদেরকেও এ তদন্তের আওতায় আনা যেতে পারে।

১৩. নির্বাচনি বিরোধ ও বিচার ব্যবস্থাপনা

(ক) বিদ্যমান 'নির্বাচনি অনুসন্ধান কমিটি'কে অনুসন্ধান বা তদন্ত করার ক্ষমতা প্রদানের পাশাপাশি বিচার-নিষ্পত্তির ক্ষমতা প্রদান করে 'নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক' কমিটি নামে একটি পূর্ণাঙ্গ বিচারিক সত্তা/বডি গঠন করা।

(খ) নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির আওতায় প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে সদস্য করা। এর প্রেক্ষিতে উক্ত কমিটিকে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯০ ধারা মতে বিচারার্থে অপরাধ আমলে নেওয়ার এবং সংক্ষিপ্ত বিচার পদ্ধতিতে অপরাধের বিচার করার ক্ষমতা অর্পণ করা।

(গ) সংসদ নির্বাচন চলাকালে নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটিগুলোর কার্যাবলি তদারকি করার নিমিত্তে নির্বাচন কমিশনের অভ্যন্তরে একটি উচ্চ পর্যায়ের 'নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কার্যক্রম তদারকি কমিটি' একজন নির্বাচন কমিশনারের সভাপতিত্বে গঠন করা।

(ঘ) কার্যকালীন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার স্বার্থে অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটিগুলোকে প্রশাসনিকভাবে নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কার্যক্রম তদারকি কমিটির আওতায় আনা। বিচারিক সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে এগুলোকে স্বাধীন করা।

(ঙ) হাইকোর্ট বিভাগে নির্বাচনি মামলার চাপ কমাতে এবং শুধু নির্বাচনি বিরোধ সংশ্লিষ্ট মামলা (ইলেকশন পিটিশন) দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য জেলা পর্যায়ে 'সংসদীয় নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল' (Parliamentary Election Tribunal) স্থাপন এবং ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিলের সুযোগ রাখা।

১৪.০ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও গণমাধ্যম নীতিমালা

(ক) নিশ্চল (stationary) পর্যবেক্ষণের অনুমতি দেওয়া, যাতে পর্যবেক্ষকরা সারাদিন কেন্দ্রে থাকতে পারে, কিন্তু ভোটকক্ষে সার্বক্ষণিকভাবে নয়।

(খ) নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থাকে প্রাক্-নির্বাচনকালীন পর্যবেক্ষণের অফিসিয়াল অনুমতি প্রদান করা।

(গ) পক্ষপাতদুষ্ট ভুয়া পর্যবেক্ষক নিয়োগ বন্ধ করা।

(ঘ) ব্যক্তি পর্যায়ে পর্যবেক্ষক নিয়োগের বিধান চালু করা।

(ঙ) পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন ভবিষ্যতে নির্বাচন ভালো করার জন্য কাজে লাগানোর বিধান করা।

(চ) আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক নিয়োগের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধাপগুলো সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষক সংস্থার জন্য সুস্পষ্ট করা। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা, যাতে সরকারের কোনোরূপ হস্তক্ষেপ থাকবে না।

(ছ) নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে প্রদত্ত বৈধ কার্ডধারী সাংবাদিকদেরকে সরাসরি ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ, অনিয়মের চিত্র ধারণ, নির্বাচনের দিনে মোটর সাইকেল ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান করা।

১৫. রিকল বা প্রতিনিধি প্রত্যাহার

(ক) নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংসদ সদস্যদের প্রত্যাহারের (recall) বিধান করা।

১৬. নির্বাচনি ব্যয়

(ক) সংসদীয় আসনের ভোটার প্রতি ১০ টাকা হিসেবে নির্বাচনি ব্যয় নির্ধারণের বিধান করা।

(খ) সকল নির্বাচনি ব্যয় ব্যাংকিং ব্যবস্থা বা আর্থিক প্রযুক্তির (যেমন, বিকাশ, রকেট) মাধ্যমে পরিচালনা করা।

(গ) নির্বাচনি ব্যয়ের অনিয়ম প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এক বা একাধিক নির্বাচনি আসনের জন্য 'নির্বাচনি ব্যয় মনিটরিং কমিটি' গঠন এবং নির্বাচনি ব্যয় নিবিড়ভাবে নজরদারি করা।

(ঘ) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রার্থী এবং দলের নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্নের নিরীক্ষা করা এবং হিসাবে অসঙ্গতির জন্য নির্বাচন বাতিলের বিধান করা।

(ঙ) নির্বাচন কমিশনের সকল নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যয় প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিলের ওপর দায়যুক্ত করা।

১৭. গণভোট

(ক) গণভোটের বিধান কার্যকর করা।

১৮.০ স্থানীয় সরকার নির্বাচন

(ক) একটি স্থায়ী 'স্থানীয় সরকার কমিশন' গঠন করা।

(খ) জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আয়োজন করা।

(গ) স্থানীয় সরকার নির্বাচন নির্দলীয় করার জন্য আইন সংশোধন করা।

(ঘ) সকল স্থানীয় সরকার নির্বাচন প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের এবং মেম্বার/কাউন্সিলরদের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অর্থবহ ভূমিকা নিশ্চিত করার বিধান করা।

(ঙ) স্থানীয় সরকারের সকল পর্যায়ে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণের বিধান করা।

(চ) এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে নির্বাচনের পূর্বে শিক্ষকের পদ থেকে পদত্যাগের বিধান করা।

(ছ) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য পদপ্রার্থীদের হলফনামার মাধ্যমে তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে ভোটারদের জানার অধিকার নিশ্চিত করা।

(জ) পার্বত্য এলাকার জেলা পরিষদের নির্বাচন দ্রুততার সঙ্গে আয়োজন করা।

(ঝ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে জাতীয় বাজেটের ৩০ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়ার বিধান করা।

কমিশন গঠন

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠনের প্রস্তাব করেন। এই ছয়টি কমিশনের একটি হলো 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক'-এর সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদারকে প্রধান করে গঠিত 'নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন'। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে এ লক্ষ্যে আট সদস্য নিয়ে উক্ত কমিশন গঠন করে একটি প্রজ্ঞাপন (এস. আর. ও. নম্বও ৩২৯-আইন/২০২৪) জারি করে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়: 'বিদ্যমান নির্বাচনি ব্যবস্থার সংস্কারের মাধ্যমে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করিয়া বাংলাদেশে জনপ্রতিনিধিত্বশীল ও কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তবর্তীকালীন সরকার নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রস্তুত করিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার অনুমোদনক্রমে 'নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন' নামে নিম্নরূপ কমিশন গঠন করিল।' প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়: 'কমিশন ৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ হইতে কার্যক্রম শুরু করিবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল মতামত বিবেচনা করিয়া পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নিকট হস্তান্তর করিবে।' নিম্নে প্রজ্ঞাপনের একটি অংশ তুলে ধরা হলো:

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ৩, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৮ আশ্বিন, ১৪৩১/ ০৩ অক্টোবর, ২০২৪

এস.আর.ও. নম্বর ৩২৯-আইন/২০২৪—বিদ্যমান নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কারের মাধ্যমে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করিয়া বাংলাদেশে জনপ্রতিনিধিত্বশীল ও কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রস্তুত করিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার অনুমোদনক্রমে "নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন" নামে নিম্নরূপ কমিশন গঠন করিল:

(ক) **নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন**

১. ড. বদিউল আলম মজুমদার — কমিশন প্রধান
সম্পাদক, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন), নির্বাচন ও স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ

২. ড. তোফায়েল আহমেদ — সদস্য
শিক্ষাবিদ, স্থানীয় সরকার ও নির্বাচন বিশেষজ্ঞ

৩. জনাব জেসমিন টুলী, সাবেক অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচন ব্যবস্থা, ভোটার নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র বিশেষজ্ঞ — সদস্য

৪. ড. মো: আব্দুল আলীম, নির্বাচন বিশেষজ্ঞ — সদস্য

৫. ডা: জাহেদ উর রহমান, রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ ও ওপিনিয়ন মেকার — সদস্য

৬. মীর নাদিয়া নিভিন, শাসন প্রক্রিয়া ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার বিশেষজ্ঞ — সদস্য

৭. ড. মোহাম্মদ সাদেক ফেরদৌস, ইলেকট্রনিক ভোটিং ও ব্লকচেইন বিশেষজ্ঞ — সদস্য

৮. শিক্ষার্থী প্রতিনিধি — সদস্য

উল্লেখ্য, কমিশন গঠনের পর এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে মো. নেছার উদ্দিন আমিনকে কমিশন প্রধানের একান্ত সচিব (উপ-সচিব মর্যাদায়) হিসেবে কমিশনে নিয়োগ দেওয়া হয়। এছাড়া সরকারের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় এবং বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অফিস আদেশের মাধ্যমে কমিশনের সাচিবিক কাজে সহায়তা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়।

কমিশনের কার্যপদ্ধতি এবং জনগণ ও অংশীজনের মতামত

কমিশনের সামগ্রিক কার্য প্রক্রিয়া

কমিশনের সদস্যগণ বিগত তিন মাসের বেশি সময় ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সংস্কারের এই বিস্তারিত ও চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে। বিদ্যমান নির্বাচনি আইন, বিধি-বিধান, নীতিমালার পর্যালোচনায়, অংশীজনের সঙ্গে মতবিনিময়, জনগণের মতামত বিবেচনা করে, বাংলাদেশের গত সবকটি নির্বাচন বিশ্লেষণ করে এবং ভালো আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার (international good practices) আলোকে সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করেছে। অতঃপর এই প্রক্রিয়ায় প্রতিটি ক্ষেত্রে যথাযথ বিশ্লেষণ প্রদান করে, সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ এই চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, যে সমস্ত নির্বাচনি আইন, বিধিমালা, নীতিমালার পরিবর্তনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে এবং যে সকল নতুন আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রস্তাবিত হয়েছে, তার সব খসড়া সংযুক্তিতে প্রদান করা হলো।

অংশীজনের সঙ্গে সংলাপ

অংশীজনের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে কমিশন একটি তালিকা তৈরি করেছে, যা এই প্রতিবেদনের পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হয়েছে। কমিশন অংশীজনের মতামত গ্রহণের অনুষ্ঠানসমূহ অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছে। ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে অংশীজনের সঙ্গে ১৩টি সংলাপ, ২টি অনলাইন সভা এবং সাবেক দু'জন প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া একই সময়ে অনানুষ্ঠানিকভাবে কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে বিভিন্ন অংশীজনের মতবিনিময় হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিশেষজ্ঞ এবং নাগরিকদের অনেকেই কমিশনে এসে তাদের লিখিত মতামত প্রদানের পাশাপাশি তাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও প্রস্তাবগুলো তুলে ধরেন।

সর্বস্তরের জনগণের মতামত গ্রহণ করতে কমিশনের পক্ষ থেকে আমরা ঢাকার বাইরে ৫টি (খুলনা, সিলেট, রংপুর, চট্টগ্রাম, রাজশাহী) এলাকায় গিয়েও মতামত গ্রহণ করেছি এবং এতেও ব্যাপক সাড়া পেয়েছি।

ঢাকায় ও ঢাকার বাইরে অনুষ্ঠিত সংলাপগুলো থেকে অনেক মতামত/প্রস্তাব গুরুত্বের সঙ্গে উঠে এসেছে। এ থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব এসেছে যা কিনা প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠানে উত্থাপন হয়েছে। এর প্রধান কয়েকটি এখানে দেওয়া হলো:

১. সৎ ও যোগ্য লোকদের নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগের পথ তৈরির জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইন সংশোধন;

২. ইসির নিজস্ব কর্মকর্তাদের রিটার্নিং ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা করা;

৩. স্থানীয় সরকারের নির্বাচনে দলীয় প্রতীক বাদ দেওয়া;

৪. 'না-ভোটে'র প্রবর্তন করা;

৫. নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনি অপরাধে সরকারি কর্মকর্তাদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া;

৬. অতিরিক্ত পোস্টারের পরিবর্তে প্রার্থীরা যাতে লিফলেট বিতরণ করে এবং ভোটারের দ্বারে দ্বারে যায় সে ব্যাপারে উৎসাহ জোগানো;

৭. পুলিশ প্রশাসন যাতে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে সেজন্য নির্দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করা;

৮. স্বচ্ছতার ভিত্তিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক নিয়োগ দেওয়া।

উল্লেখ্য, পরিশিষ্টে অংশীজনের সঙ্গে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভার তালিকা, বিবরণী ও অংশীজনদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সুপারিশগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

কমিশনের সভার সংখ্যা: ৬৪টি

অংশীজনের সঙ্গে সংলাপ: ২২টি
(ঢাকায় ১৭টি; ঢাকার বাইরে ৫টি)

জনগণের মতামত

নির্বাচন এক দিনের বিষয় নয়, এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। আইনি কাঠামো তৈরি ও ভোটার তালিকা প্রস্তুত থেকে এটি শুরু হয় এবং এটি শেষ হয় নির্বাচনি ফলাফল ঘোষণা এবং এ সম্পর্কিত সকল বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে। এই পুরো প্রক্রিয়া কারিগরি দিক থেকে ক্রটিহীন হওয়া আবশ্যক। এজন্য আরও আবশ্যক পুরো প্রক্রিয়ার প্রতি ভোটারদের আস্থা – তাদের বিশ্বাস যে পুরো নির্বাচনি প্রক্রিয়াটি ছিল

সঠিক ও সম্পূর্ণ কারসাজিমুক্ত। তাই পুরো প্রক্রিয়ার প্রতি জন আস্থা সৃষ্টি করতে হলে এতে জনগণকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। এই বিবেচনায় নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের কার্যক্রমের শুরু থেকেই সর্বস্তরের জনগণকে তাদের অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার এবং তাদের মতামত ও সুপারিশ গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে। এ লক্ষ্যে কমিশন অক্টোবর মাসের ২২ তারিখে একটি ওয়েবসাইট স্থাপন করেছে। এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কমিশনের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার পাশাপাশি তাদের মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ রাখা হয়। এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনগণের পক্ষ থেকে নাম প্রকাশ করে কিংবা নিজেদের গোপনীয়তা রক্ষা করে মতামত প্রকাশের এবং ডকুমেন্ট/প্রস্তাব প্রেরণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।

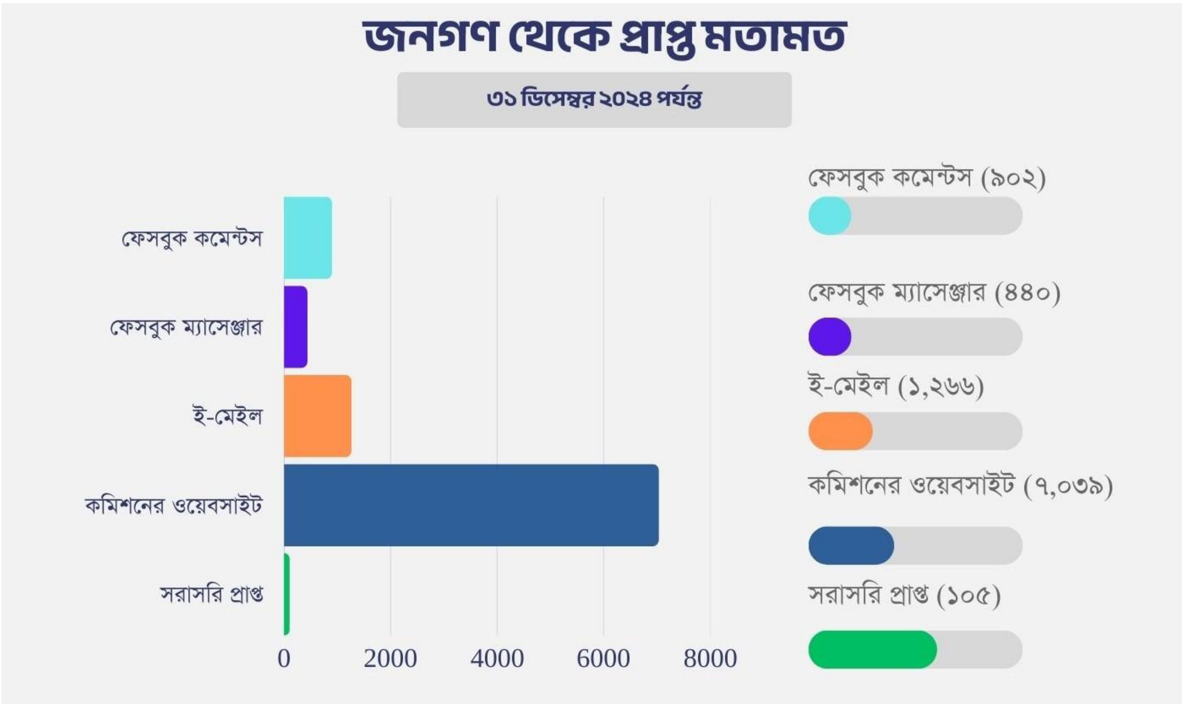

এছাড়াও সর্বস্তরের জনগণকে কমিশনের কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এবং তাদের মতামত গ্রহণের জন্য একটি ফেসবুক পেজ তৈরি করা হয়, যেটি ব্যবহার করে তাঁরা তাঁদের মতামত প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত করার কিংবা নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারের মাধ্যমে প্রেরণের সুযোগ পান। এর পাশাপাশি সরাসরি মতামত প্রেরণের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট (dedicated) ই-মেইল (feedback@erc. ecs.gov.bd) চালু করেছে। এছাড়াও জনগণের পক্ষ থেকে তাঁদের লিখিত মতামত ও ডকুমেন্টের হার্ডকপি সরাসরিভাবে কিংবা কমিশনের কছে ডাকযোগে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব আয়োজনের বিষয়ে বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছে। এ সম্পর্কে এবং জনগণকে তাদের মতামত প্রদানের জন্য উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিটিআরসি'র মাধ্যমে সকল মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর কাছে এসএমএস প্রেরণ করা হয়েছে। নভেম্বর মাসের ২৯ তারিখ পর্যন্ত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রাপ্ত মতামত ও ডকুমেন্টের তথ্য নিম্নরূপ:

প্রসঙ্গত, এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কমিশনের উদ্যোগ এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারের ফলে আমরা জনগণের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। তাঁরা কমিশন স্থাপিত প্ল্যাটফর্মে লিখিত মতামত দেওয়ার পাশাপাশি কমিশনের সকল সদস্যকে ব্যক্তিগত ও মৌখিকভাবেও অনেকে মতামত দিচ্ছে। অনেকে অনেক দূর-দূরান্ত থেকে এসে কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে, বিশেষত কমিশন প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন ও তাঁদের মতামত দিচ্ছেন এবং কমিশনের কাজের প্রশংসা করছেন। যেসব মতামত এ পর্যন্ত আমরা জনগণের কাছ থেকে পেয়েছি তাতে আমরা ব্যাপকভাবে উৎসাহিত হয়েছি। প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশের অধিকাংশই অত্যন্ত সুচিন্তিত। এটি সুস্পষ্ট যে সারা দেশের সর্বস্তরের জনগণ কমিশনকে সর্বতোভাবে সহায়তা করতে ব্যাপকভাবে আগ্রহী ছিল।

আমরা কমিশনের পক্ষ থেকে সরকার প্রদত্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সকল রাজনৈতিক দলের কাছে নির্বাচনি সংস্কার বিষয়ে তাদের লিখিত সুপারিশ আহ্বান করে চিঠি লিখেছি। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে অনানুষ্ঠানিকভাবে যোগাযোগও করেছি। অনেক রাজনৈতিক নেতা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে এসে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎও করেছেন। প্রায় সব রাজনৈতিক দলই তাদের লিখিত সুপারিশ আমাদের কাছে প্রেরণ করেছে।

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার সম্পর্কিত কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনগণের মতামত গ্রহণের জন্য আমরা দেশব্যাপী একটি জরিপ করেছি। জরিপটি পরিচালনার জন্য আমরা বিবিএস-এর সঙ্গে যোগাযোগও করেছি। এই জরিপের ফলাফলগুলো প্রায় সব ক্ষেত্রেই আমাদের প্রদত্ত সুপারিশগুলোকে সমর্থন করেছে।

নির্বাচন সংস্কার বিষয়ক জনমত জরিপ

নির্বাচনি ব্যবস্থার সংস্কার সংক্রান্ত বিষয়ে নাগরিকদের মতামত গ্রহণ করে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন সংস্কার বিষয়ে জাতীয় জনমত জরিপ (National Public Opinion Survey on Electoral Reforms) পরিচালনা করার জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে (বিবিএস) অনুরোধ জানায়। এর প্রেক্ষিতে বিবিএস কর্তৃক জরিপ পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত পরিসংখ্যানিক পদ্ধতির মাধ্যমে সমগ্র দেশ হতে প্রতিনিধিত্বশীল খানা চিহ্নিত করে ২০-২২ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে মাঠ পর্যায়ে এ জরিপ পরিচালনা করা হয়।

জরিপ পরিচালনা পদ্ধতি

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রতি দশ বছর অন্তর জনশুমারি ও গৃহগণনা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২ কার্যক্রমে মাঠ পর্যায়ে জোনাল অপারেশন পরিচালনা করে ৮০ থেকে ১২০টি (গড়ে ১০০টি) খানার সমন্বয়ে গণনা এলাকায় (EA) বিভক্ত করে গণনা এলাকা ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়। এই গণনা এলাকাসমূহকে সেন্সাস ব্লকও বলা হয়। জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা হিসেবে বিবিএস কর্তৃক পরিচালিত সকল জরিপ কার্যক্রমের নমুনা ফ্রেম হিসেবে এই সেন্সাস ব্লক বা গণনা এলাকাকে ব্যবহার করা হয়। শুমারি পরবর্তী সময়ে বিবিএস কর্তৃক পরিচালিত জরিপের জন্য উক্ত নমুনা এলাকাসমূহ নিয়মিত ব্যবহার হয়ে থাকে এবং এগুলো মূলত Integrate Multipurpose Sample-IMPS হিসেবে পরিচিত। এই IMPS এর সংখ্যা ২,৭৬৬। নির্বাচনি ব্যবস্থা সংস্কার বিষয়ে জাতীয় জনমত জরিপে ২,৭৬৬ পিএসইউ হতে ১,৯২০টি পিএসইউ নির্ধারণ করে নমুনায়নের মাধ্যমে ৪৬,০৮০ খানা হতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

জাতীয় জনমত জরিপে নির্বাচিত নমুনা খানা হতে সুষ্ঠুভাবে উপাত্ত সংগ্রহের নিমিত্ত জরিপের প্রচার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নির্ধারিত পিএসইউ এলাকায় বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক লিফলেট ও পোস্টার সরবরাহ করা হয়। এছাড়াও জরিপ চলাকালীন জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

মাঠ পর্যায়ে উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনায় উত্তরদাতার খানায় সহজে প্রবেশ এবং শনাক্তকরণের জন্য জরিপের উদ্দেশ্য সম্বলিত নির্দেশনা এবং পরিচয়পত্র তথ্য সংগ্রহকারীগণকে প্রদান করা হয়। তথ্য সংগ্রহকারীগণকে প্রশ্নমালা পূরণের সময় নির্বাচিত উত্তরদাতার খানাটিতে প্রবেশ করে নিজেদের পরিচিত করার এবং আগমনের উদ্দেশ্যসহ জরিপের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। জরিপ কার্যক্রমে অংশ নেওয়া মনিটরিং ও সুপারভাইজিং কর্মকর্তাগণ কর্তৃক জরিপের গুণগতমান যাচাইয়ের পরামর্শ প্রদান করা হয়। খানার আকারের ওপর নির্ভর করে প্রতিটি প্রশ্নপত্র সম্পন্ন করতে তথ্য সংগ্রহকারীগণের প্রায় ১৫-২০ মিনিট সময়ের প্রয়োজন হয়। প্রায় সকল তথ্য সংগ্রহকারীই নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে উপাত্ত সংগ্রহ সম্পন্ন হয়।

তথ্যের গোপনীয়তা

বিবিএস কর্তৃক সংগৃহীত সকল তথ্যই গোপনীয়তা বজায় রেখে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও প্রকাশ করা হয়ে থাকে। জাতিসংঘ ঘোষিত Fundamental Principle of Official Statistics (FPOS) এর Principle-6 এ বর্ণিত গোপনীয়তার বিষয়টি প্রতিটি জরিপ ও শুমারির ক্ষেত্রে বরাবর অনুসরণ করা হয়।

জাতীয় জনমত জরিপের সারসংক্ষেপ

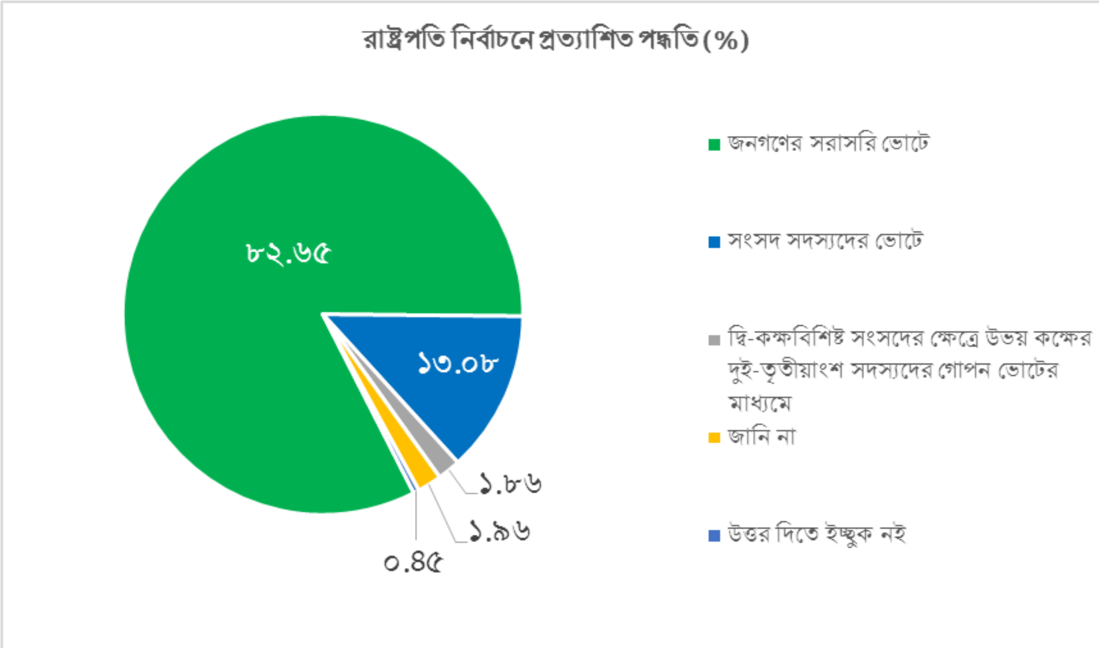

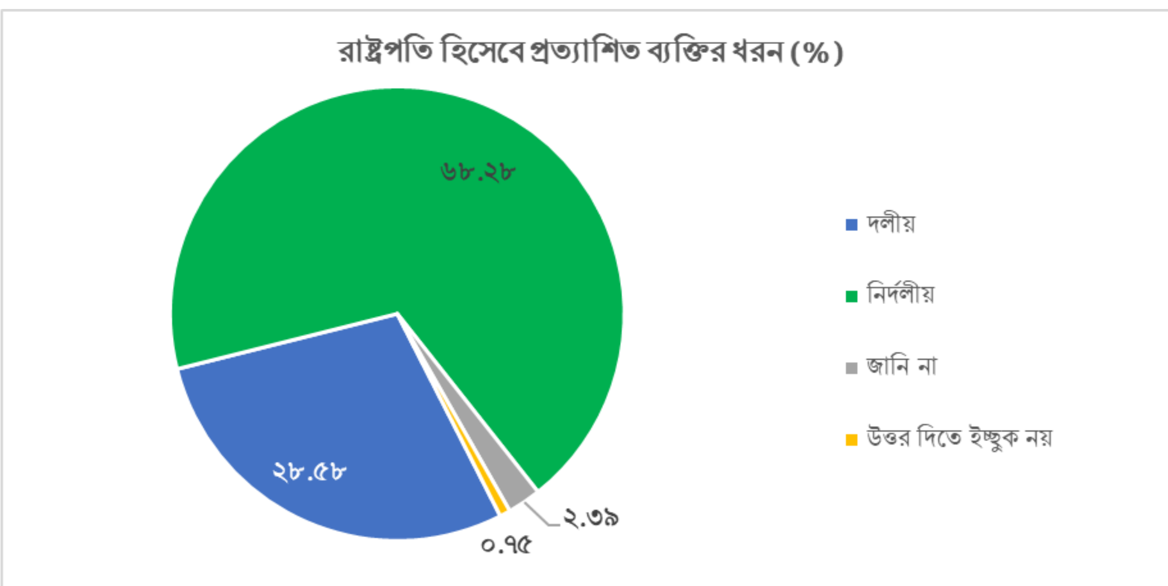

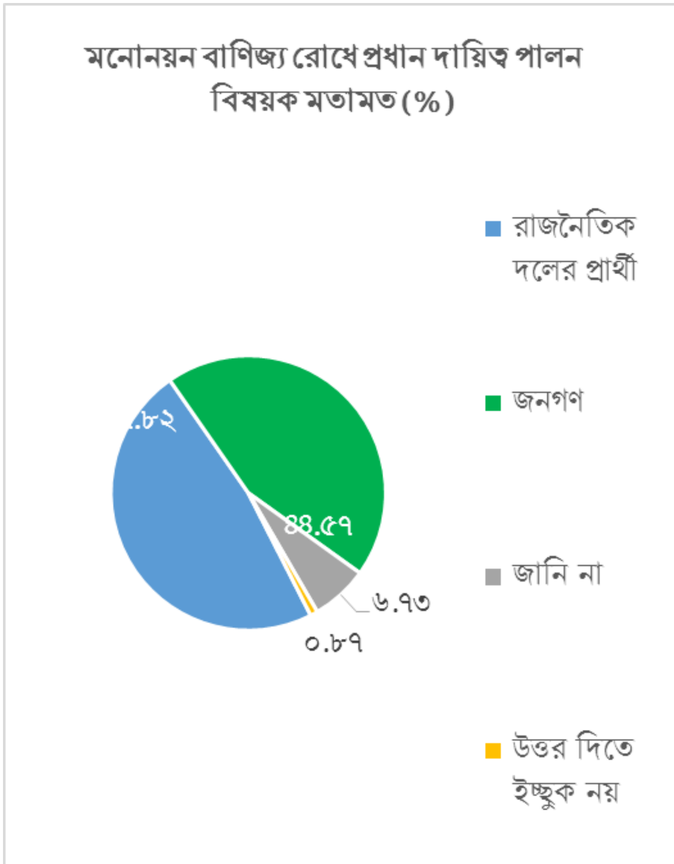
মনোনয়ন বাণিজ্য রোধে প্রধান দায়িত্ব পালন বিষয়ক মতামত (%)
রাজনৈতিক দলের প্রার্থী
জনগণ
জানি না
উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়
.৮২
৪৪.৫৭
৬.৭৩
০.৮৭

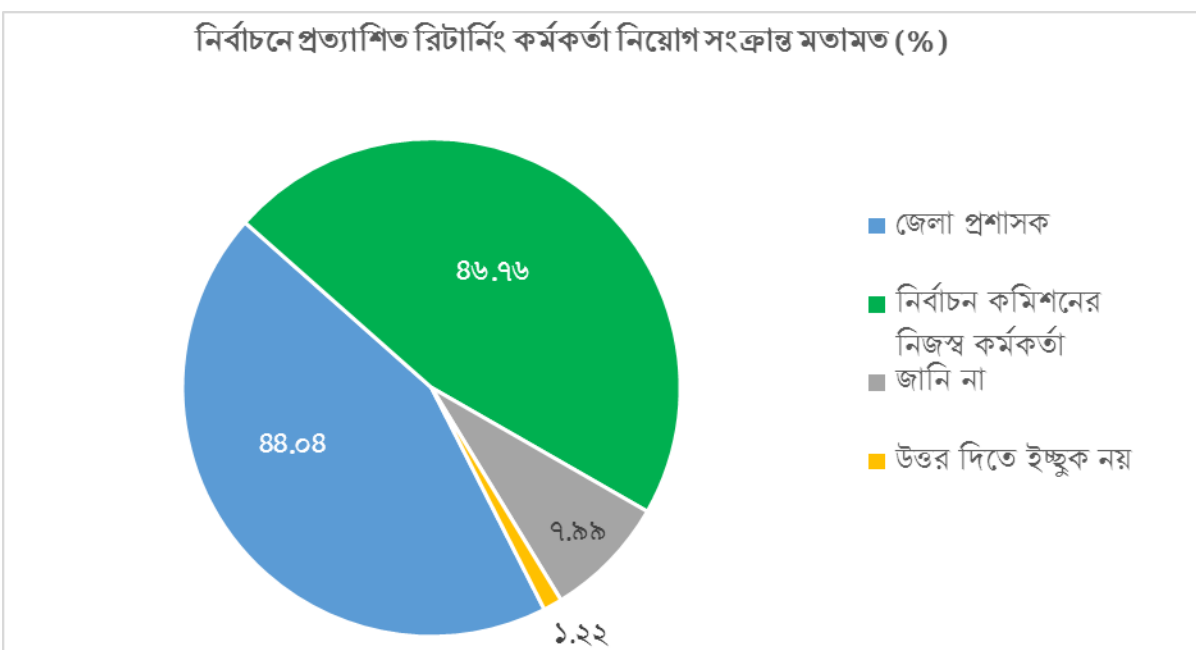
নির্বাচনে প্রত্যাশিত রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ সংক্রান্ত মতামত (%)
জেলা প্রশাসক
নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তা
জানি না
উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়
৪৬.৭৬
৪৪.০৪
৭.৯৯
১.২২

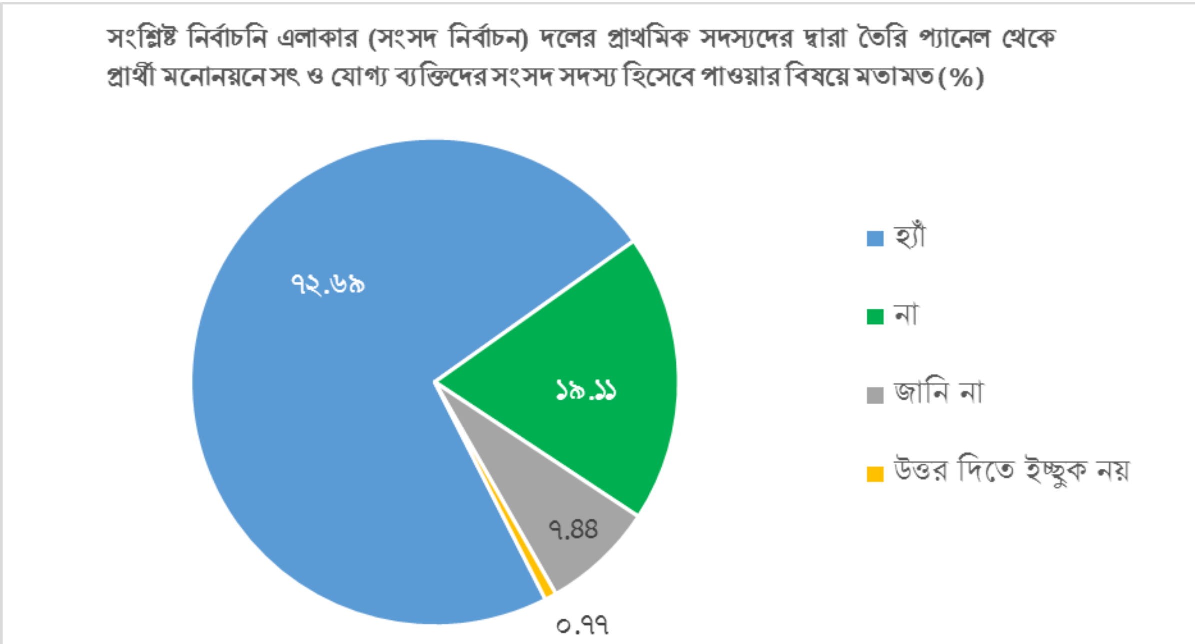
সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার (সংসদ নির্বাচন) দলের প্রাথমিক সদস্যদের দ্বারা তৈরি প্যানেল থেকে প্রার্থী মনোনয়নে সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের সংসদ সদস্য হিসেবে পাওয়ার বিষয়ে মতামত (%)
৭২.৬৯
১৯.১১
৭.৪৪
০.৭৭
হ্যাঁ
না
জানি না
উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়

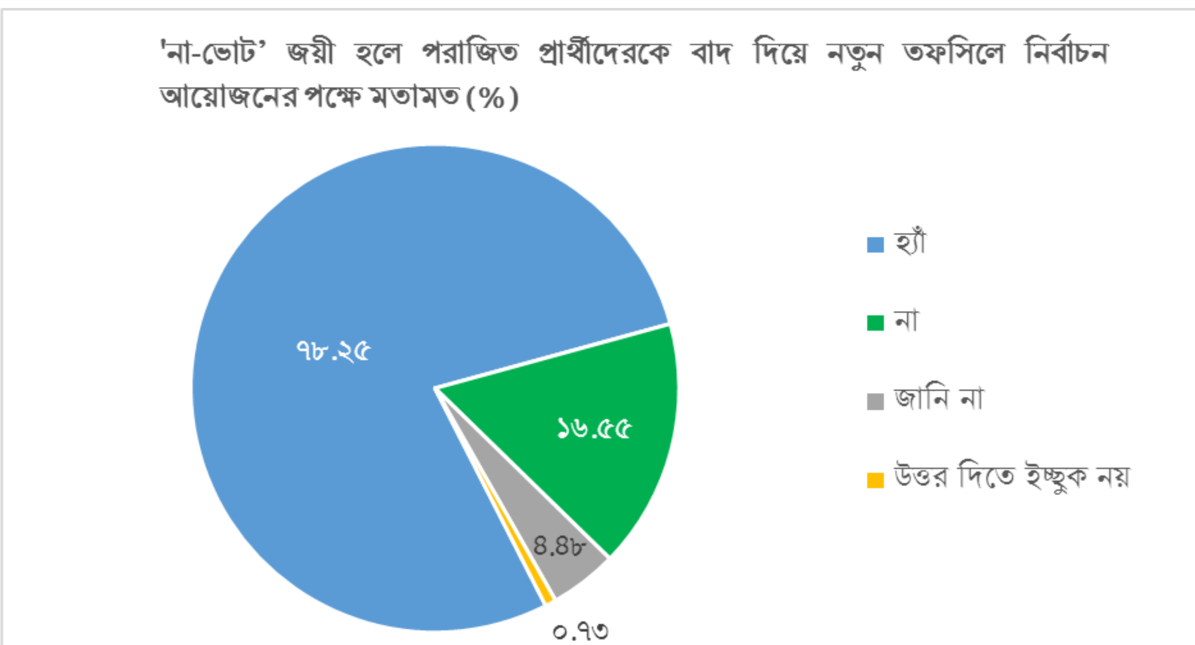
'না-ভোট' জয়ী হলে পরাজিত প্রার্থীদেরকে বাদ দিয়ে নতুন তফসিলে নির্বাচন আয়োজনের পক্ষে মতামত (%)
৭৮.২৫
১৬.৫৫
৪.৪৮
০.৭৩
হ্যাঁ
না
জানি না
উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়

জাতীয় সংসদের কোনো আসনে প্রদত্ত ভোট ৫০ শতাংশের কম হলে ঐ আসনে পুনর্নির্বাচনের পক্ষে- মতামত (%) লেখচিত্র ২.৫.১: জাতীয় সংসদের কোনো আসনে প্রদত্ত ভোট ৫০ শতাংশের কম হলে ঐ আসনে পুনর্নির্বাচনের পক্ষে- মতামত (%)

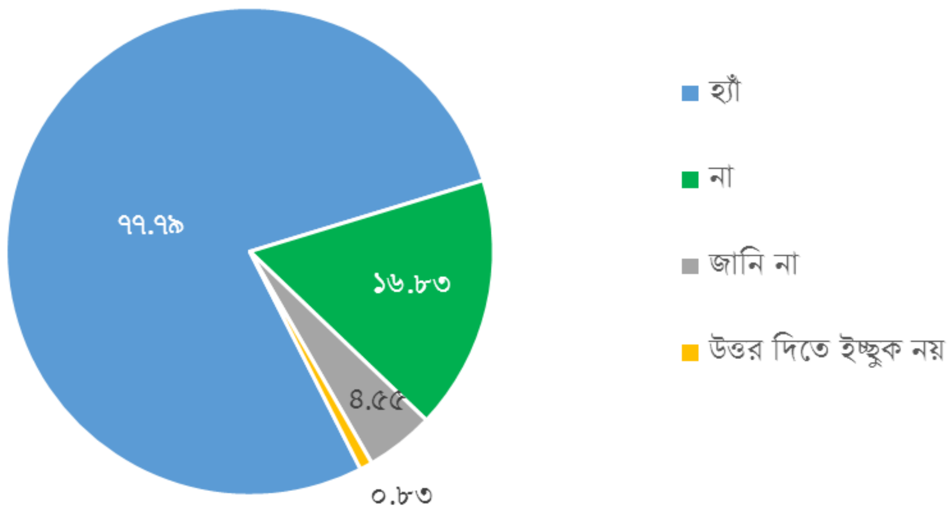

জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ১০০টিতে (মোট ৪০০ আসন) উন্নীতপূর্বক যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট নির্বাচনি এলাকা থেকে নারীদের সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে-মতামত (%)

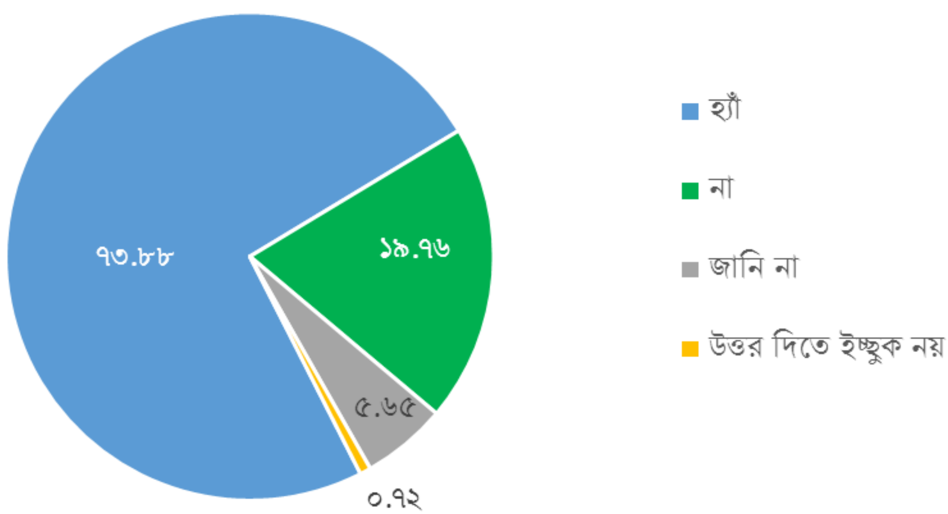

মনোনয়ন বাণিজ্য বন্ধ না হলে, রাজনীতি জনকল্যাণের পরিবর্তে ব্যক্তির ব্যবসায়িক স্বার্থেই পরিচালিত হওয়ার বিদ্যমান সংস্কৃতি অব্যাহত থাকবে এবং স্বৈরাচারী ব্যবস্থা ফিরে আসার আশঙ্কা সৃষ্টি হবে-মতামত (%)

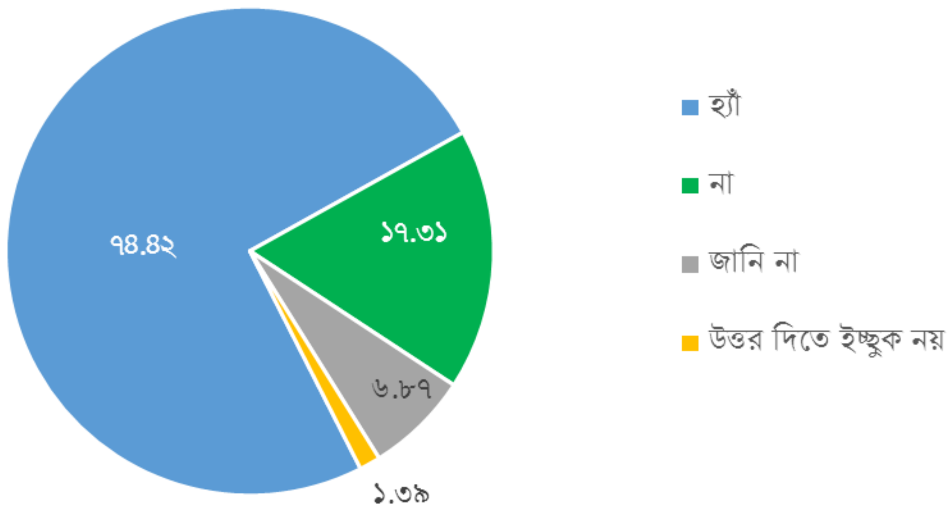

দলের মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং নিবেদিত ও ত্যাগী নেতাকর্মীদের মনোনয়ন বঞ্চিত না করার লক্ষ্যে মনোনীত সকল প্রার্থীদের ন্যূনতম ৩ বছর দলের সদস্য থাকার বিধান বাধ্যতামূলক করার আবশ্যক- মতামত (%)

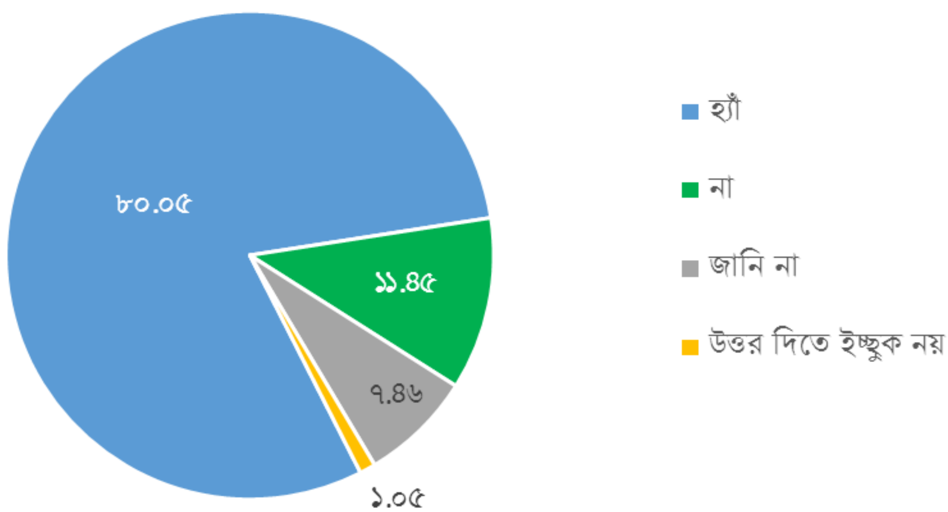

সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তিদেরকে মনোনয়ন দেওয়ার লক্ষ্যে প্রার্থীদের কাছ থেকে একটি হলফনামা নিয়ে রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে তা যাচাই-বাছাই করার আবশ্যকতা-মতামত (%)

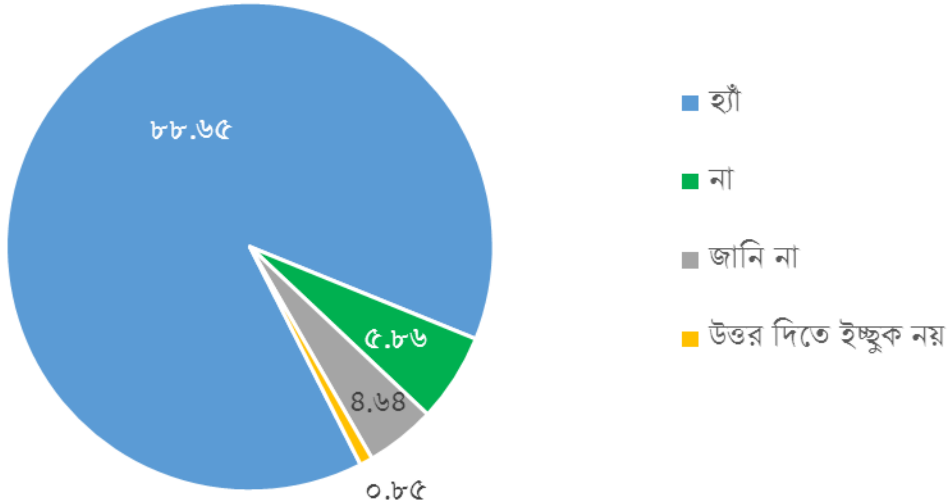

জাতীয় নির্বাচনের সময় নির্বাচন প্রভাবিত করতে পারে এমন সকল সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের পূর্বসম্মতি গ্রহণ-মতামত (%)

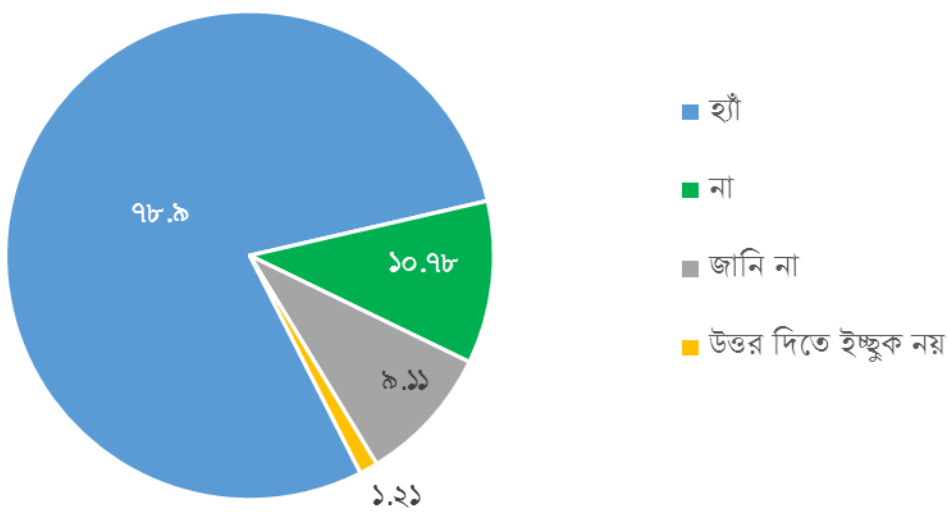

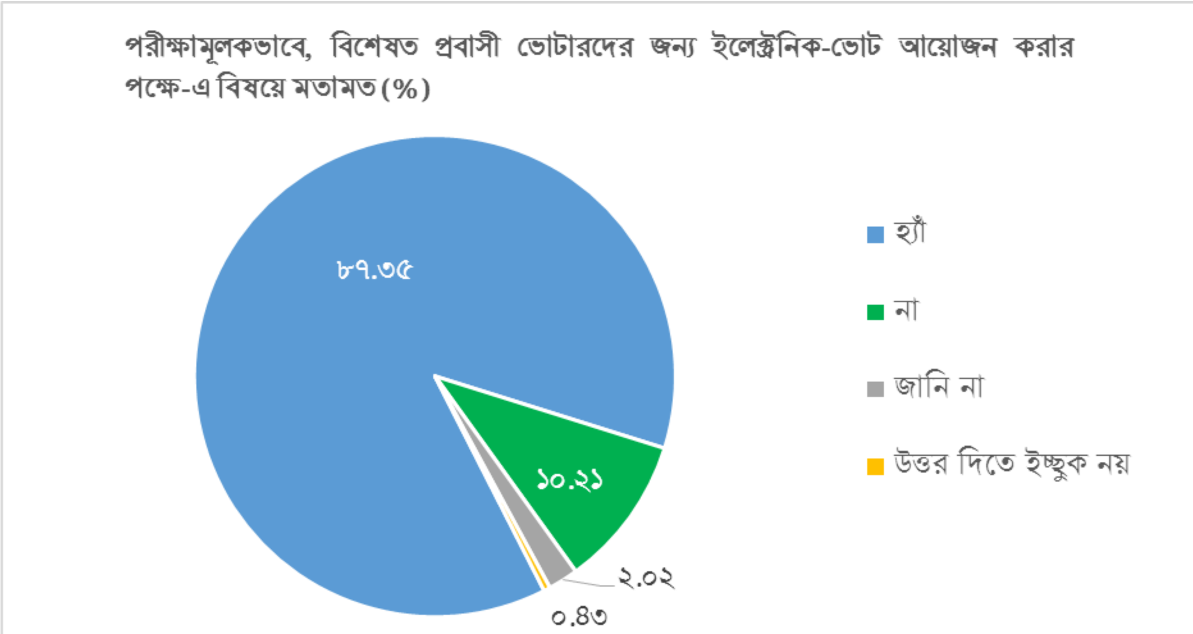

পরীক্ষামূলকভাবে, বিশেষত প্রবাসী ভোটারদের জন্য ইলেক্ট্রনিক-ভোট আয়োজন করার পক্ষে-এ বিষয়ে মতামত (%)
৮৭.৩৫
১০.২১
২.০২
০.৪৩
হ্যাঁ
না
জানি না
উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়

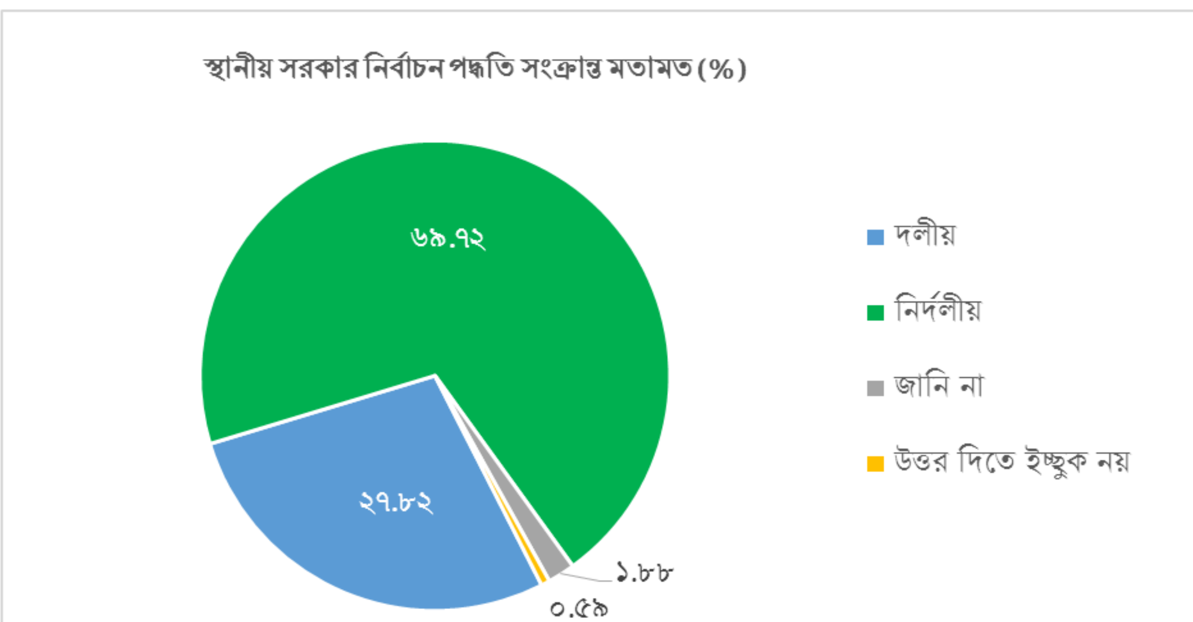

স্থানীয় সরকার নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত মতামত (%)
৬৯.৭২
২৭.৮২
১.৮৮
০.৫৯
দলীয়
নির্দলীয়
জানি না
উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়

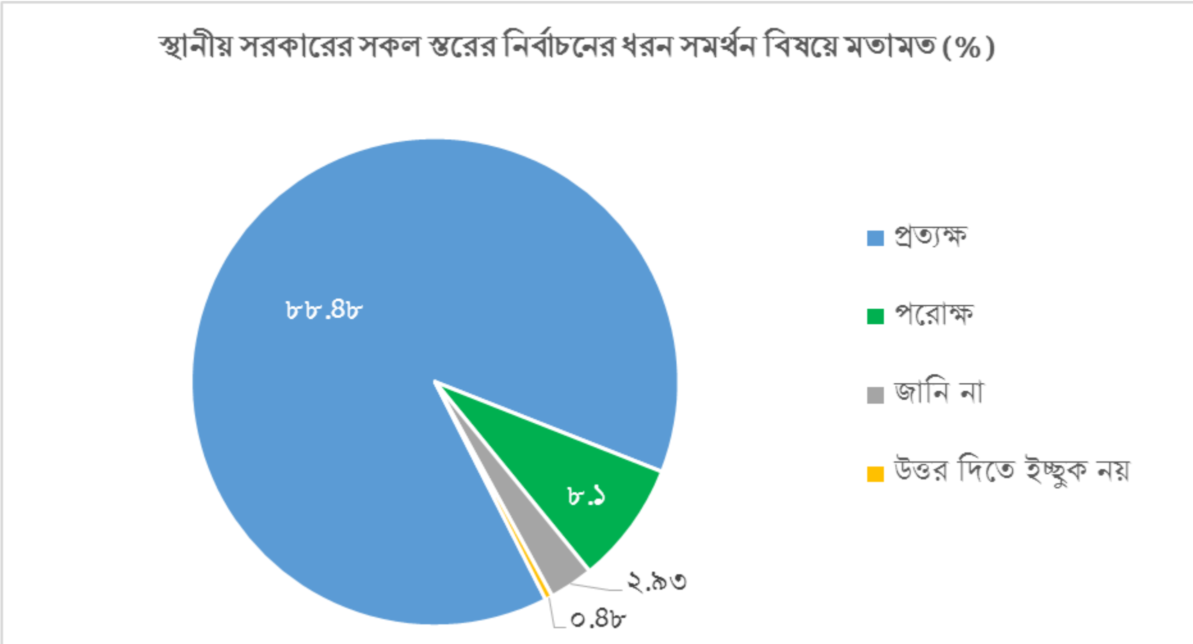
স্থানীয় সরকারের সকল স্তরের নির্বাচনের ধরন সমর্থন বিষয়ে মতামত (%)
৮৮.৪৮
৮.১
২.৯৩
০.৪৮
প্রত্যক্ষ
পরোক্ষ
জানি না
উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়

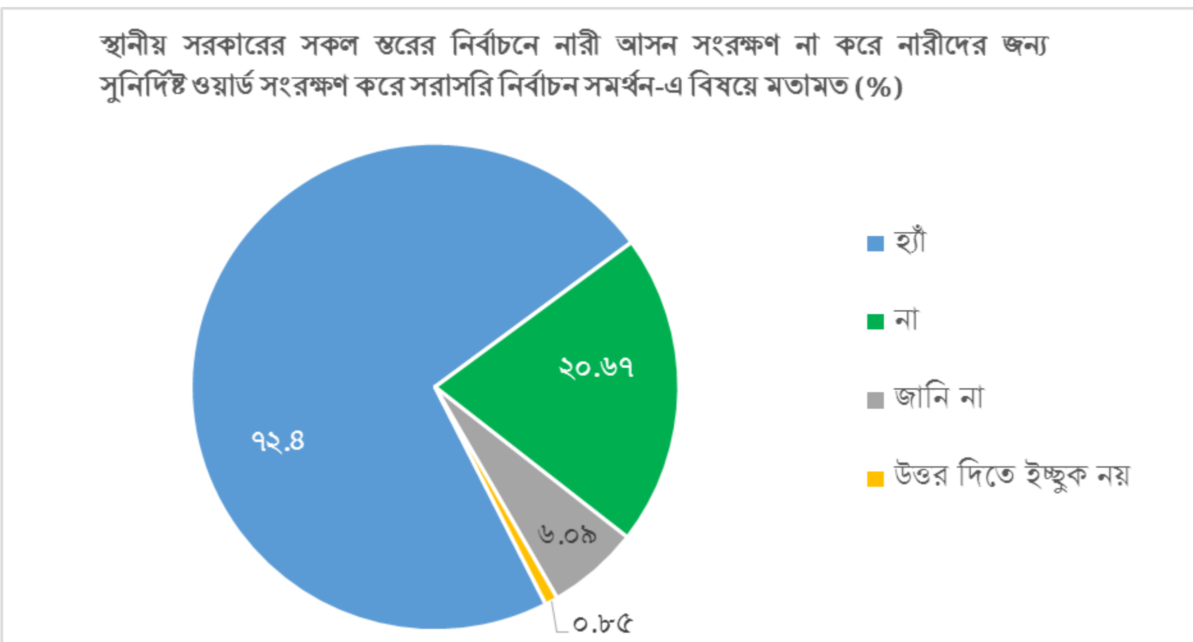
স্থানীয় সরকারের সকল স্তরের নির্বাচনে নারী আসন সংরক্ষণ না করে নারীদের জন্য সুনির্দিষ্ট ওয়ার্ড সংরক্ষণ করে সরাসরি নির্বাচন সমর্থন-এ বিষয়ে মতামত (%)
৭২.৪
২০.৬৭
৬.০৯
০.৮৫
হ্যাঁ
না
জানি না
উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়

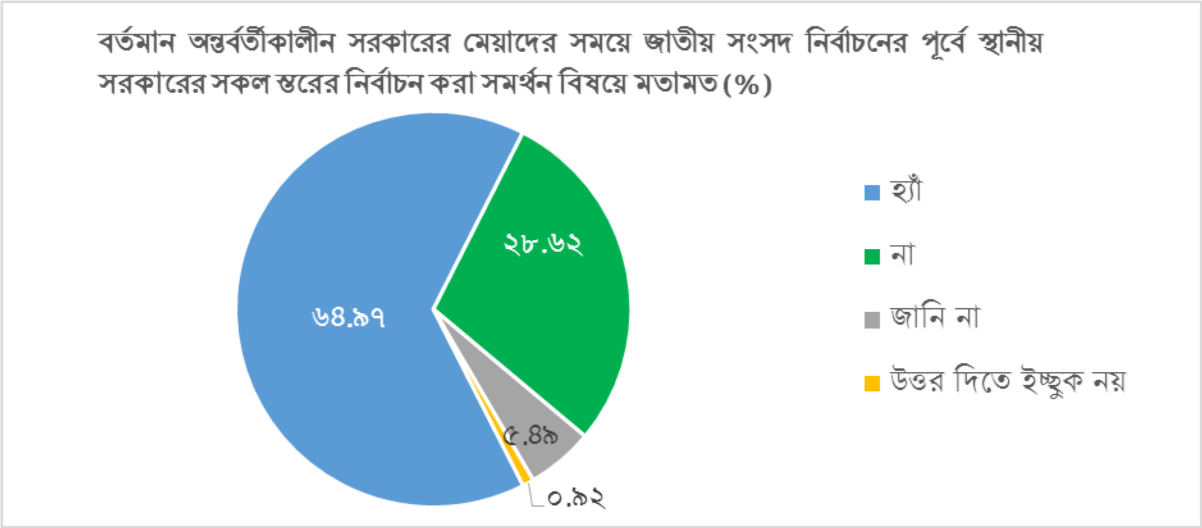
বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদের সময়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে স্থানীয় সরকারের সকল স্তরের নির্বাচন করা সমর্থন বিষয়ে মতামত (%)
৬৪.৯৭
২৮.৬২
৫.৪৯
০.৯২
হ্যাঁ
না
জানি না
উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়

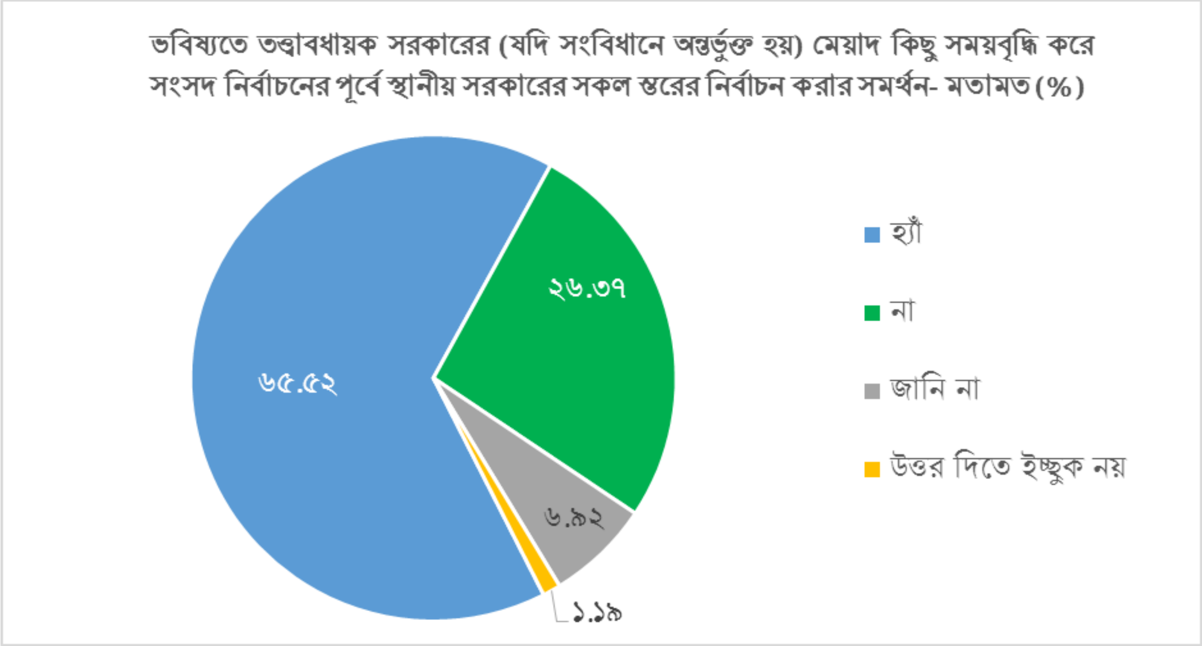
ভবিষ্যতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের (যদি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়) মেয়াদ কিছু সময়বৃদ্ধি করে সংসদ নির্বাচনের পূর্বে স্থানীয় সরকারের সকল স্তরের নির্বাচন করার সমর্থন- মতামত (%)
৬৫.৫২
২৬.৩৭
৬.৯২
১.১৯
হ্যাঁ
না
জানি না
উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়

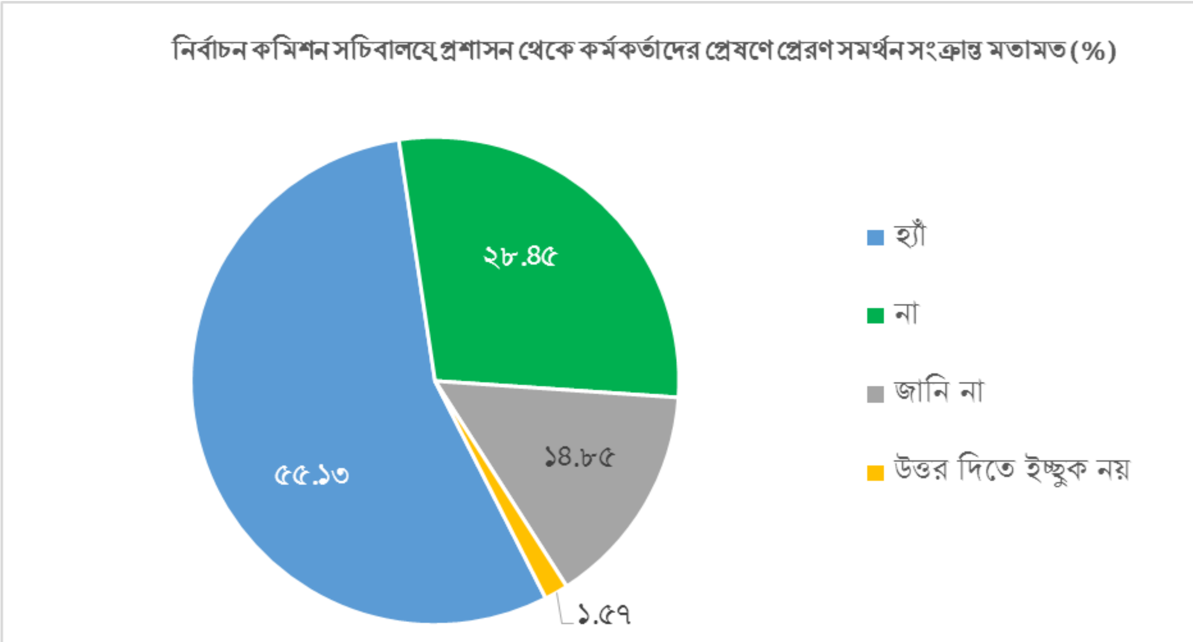
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রশাসন থেকে কর্মকর্তাদের প্রেষণে প্রেরণ সমর্থন সংক্রান্ত মতামত (%)
২৮.৪৫
৫৫.১৩
১৪.৮৫
১.৫৭
হ্যাঁ
না
জানি না
উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়

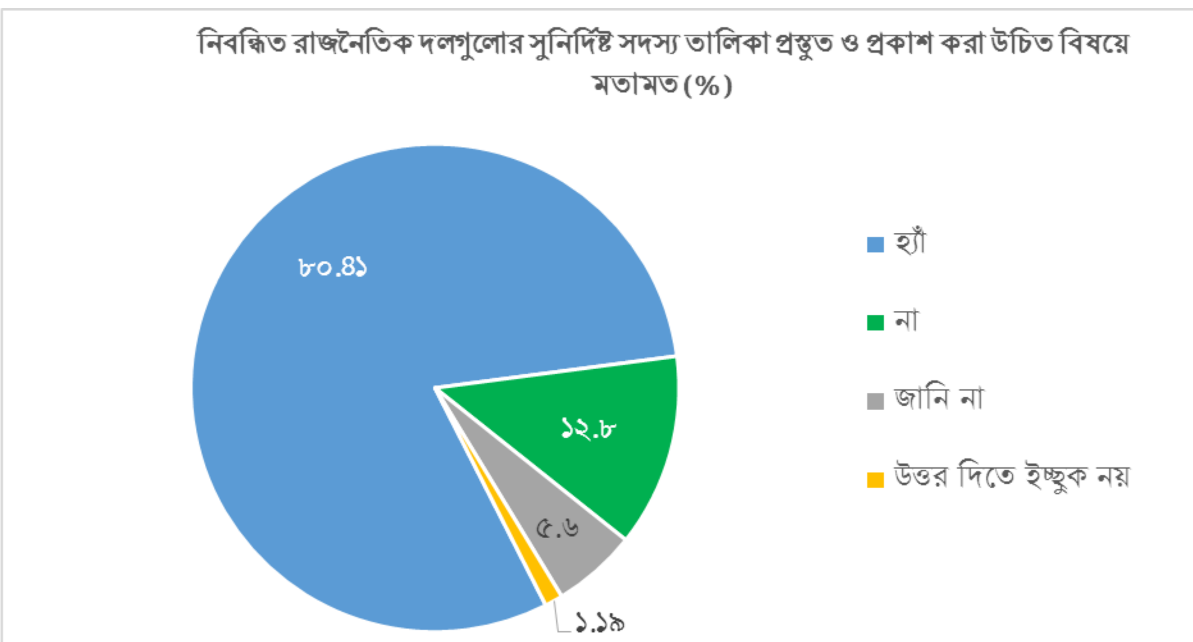
নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর সুনির্দিষ্ট সদস্য তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশ করা উচিত বিষয়ে মতামত (%)
৮০.৪১
১২.৮
৫.৬
১.১৯
হ্যাঁ
না
জানি না
উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়

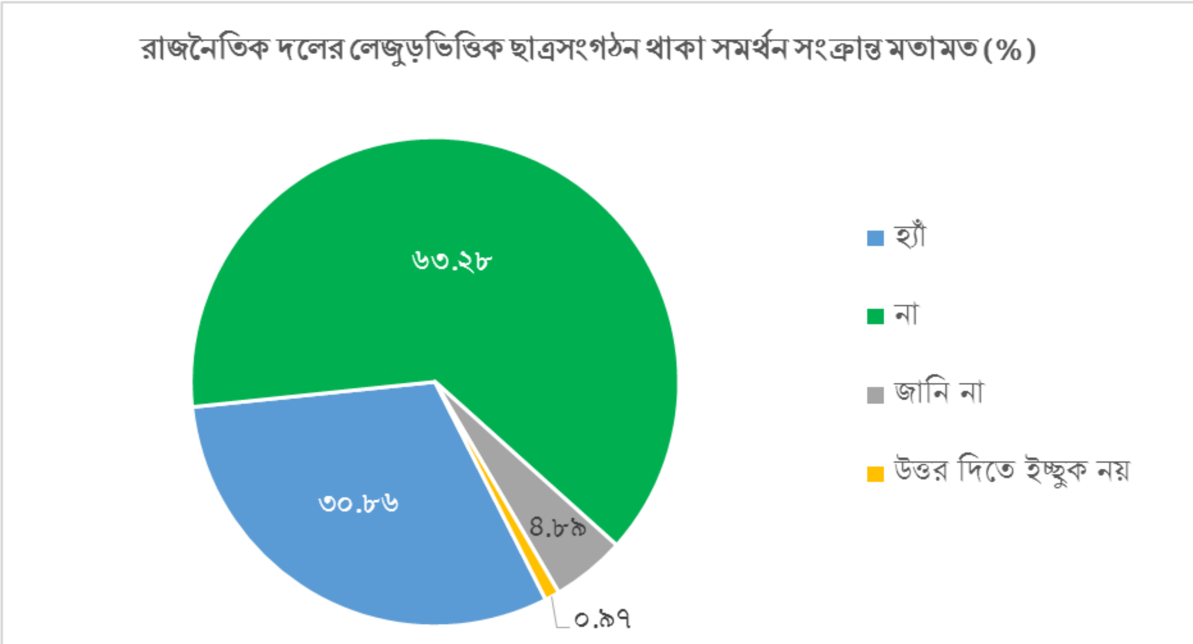
রাজনৈতিক দলের লেজুড়ভিত্তিক ছাত্রসংগঠন থাকা সমর্থন সংক্রান্ত মতামত (%)
৬৩.২৮
৩০.৮৬
৪.৮৯
০.৯৭
হ্যাঁ
না
জানি না
উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়

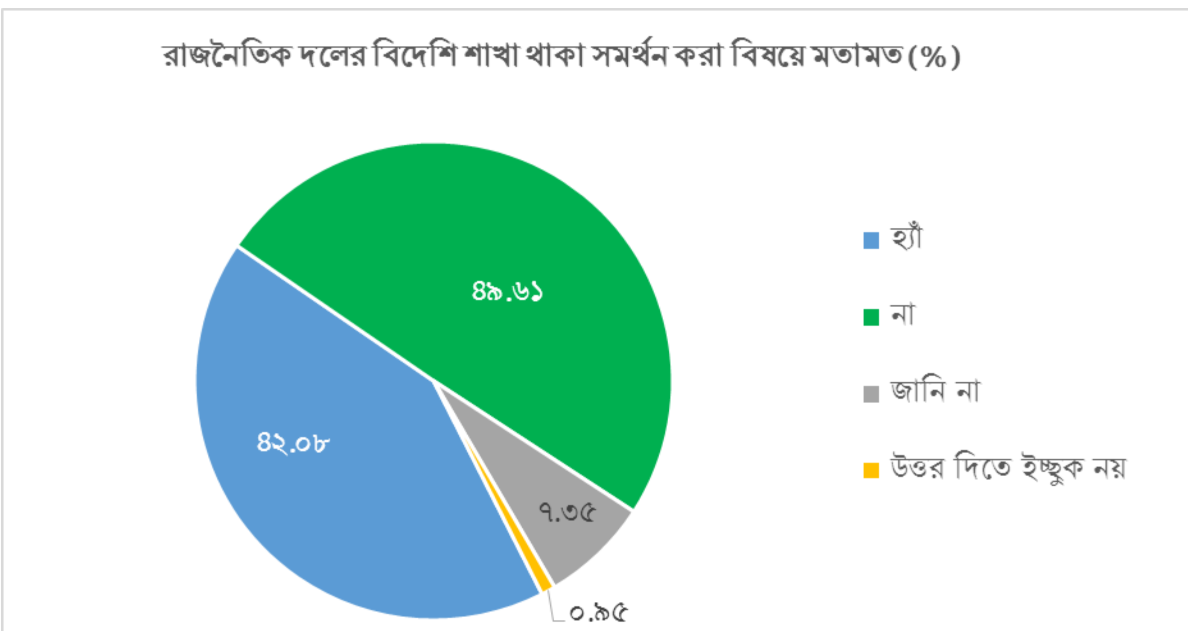
রাজনৈতিক দলের বিদেশি শাখা থাকা সমর্থন করা বিষয়ে মতামত (%)
৪৯.৬১
৪২.০৮
৭.৩৫
০.৯৫
হ্যাঁ
না
জানি না
উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়

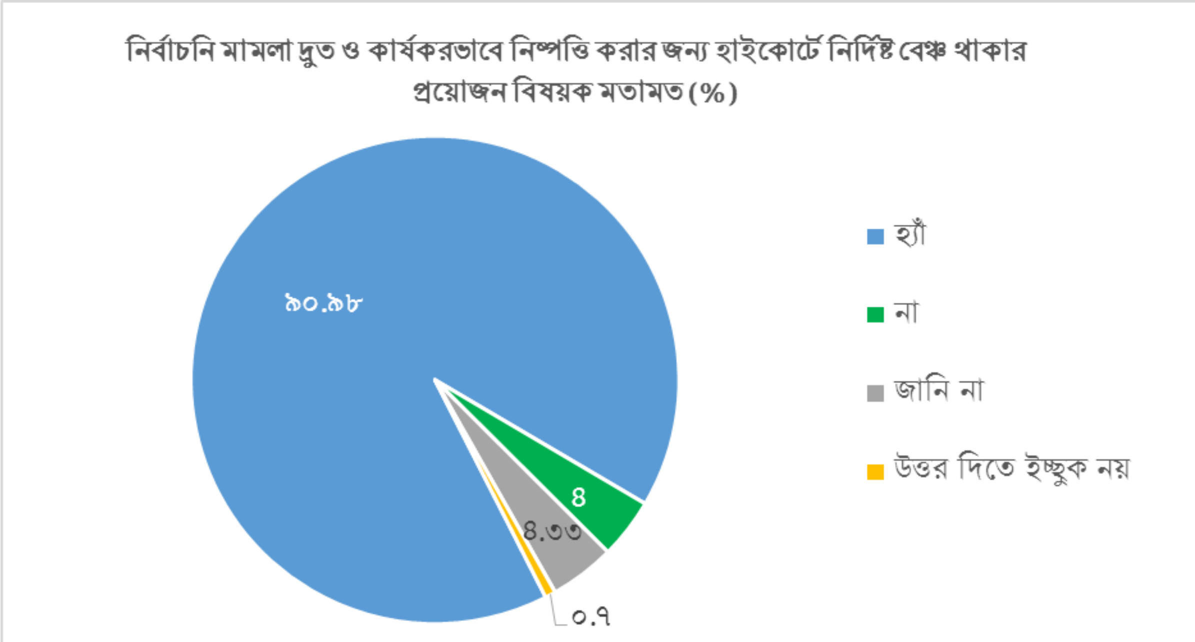
নির্বাচনি মামলা দ্রুত ও কার্যকরভাবে নিষ্পত্তি করার জন্য হাইকোর্টে নির্দিষ্ট বেঞ্চ থাকার প্রয়োজন বিষয়ক মতামত (%)
৯০.৯৮
৪
৪.৩৩
০.৭
হ্যাঁ
না
জানি না
উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়

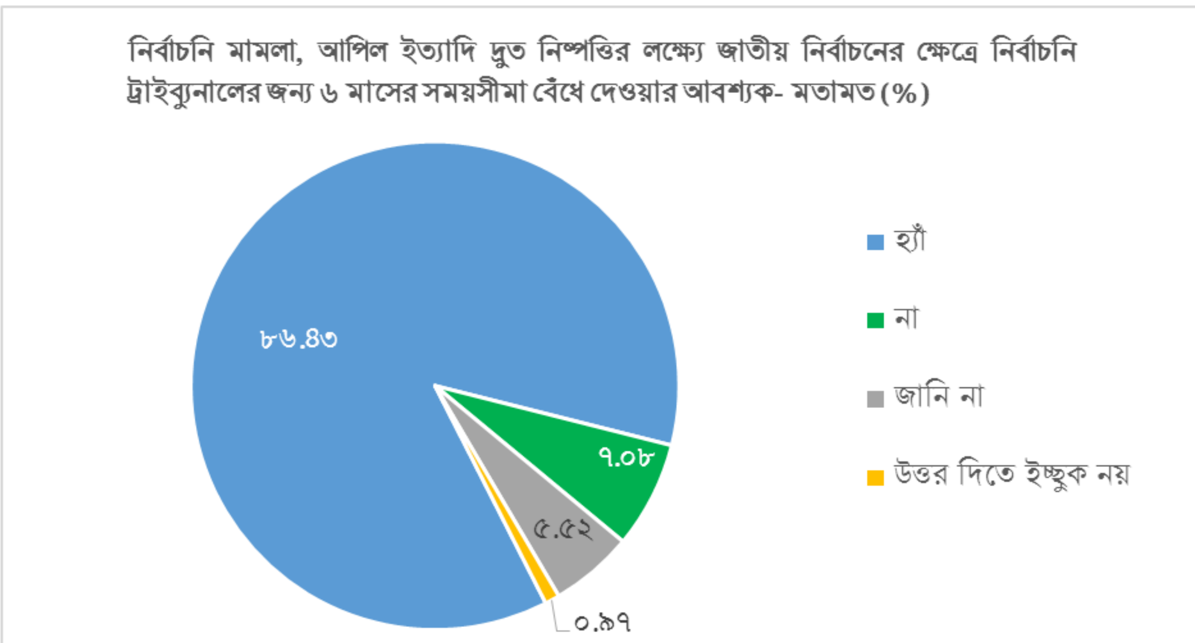
নির্বাচনি মামলা, আপিল ইত্যাদি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচনি ট্রাইব্যুনালের জন্য ৬ মাসের সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার আবশ্যক- মতামত (%)
৮৬.৪৩
৭.০৮
৫.৫২
০.৯৭
হ্যাঁ
না
জানি না
উত্তর দিতে ইচ্ছুক নয়

“সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে সেসব ব্যক্তি সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং শপথ গ্রহণ করেছেন, তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করলে তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্তসাপেক্ষে শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, তাঁর

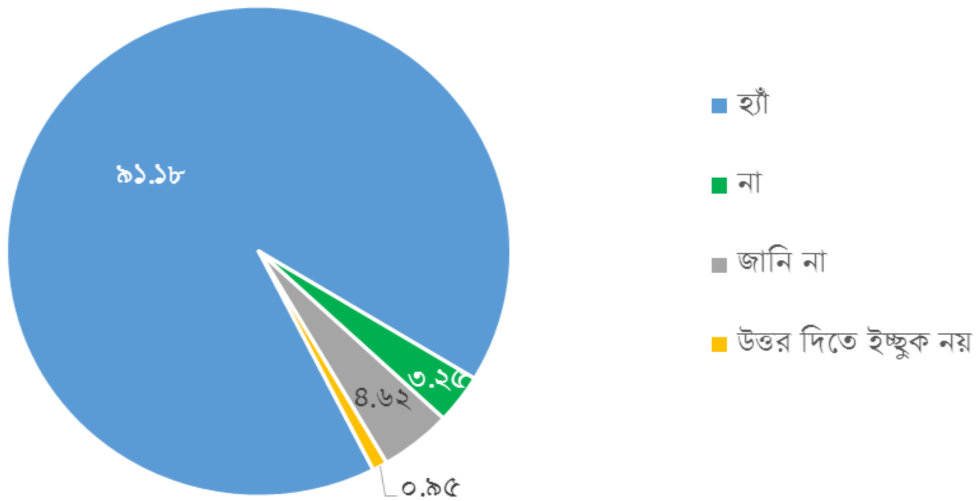

সংক্ষেপণ (Abbreviations)

AFIS	Automated Fingerprint Identification System
AES	Advanced Encryption Standard
আরপিও	গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ
এনআইডি	জাতীয় পরিচয়পত্র
DoS	Denial-of-Service
DIDs	Decentralized Identifiers
DLT	Distributed Ledger Technology
EBSI	European Blockchain Service Infrastructure
ECC	Elliptic Curve Cryptography
EVM	Electronic Voting Machine
এফপিটিপি	ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট
ইভিএম	ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন
HSM	Hardware Security Module
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure
IDEA	Identification System for Enhancing Access to Service
MPC	Multi-party computation
OTP	One Time Password
PKI	Public Key Infrastructure
SHA-2	Secure Hashing Algorithm
SSI	Self-sovereign Identity
TTP	Trusted Third Party
টিআইবি	ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
VC	Verifiable Credential
VDR	Verifiable Data Registry
VPN	Virtual Private Network
ZKP	Zero Knowledge Proof

১.০ নির্বাচন কমিশন

বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যকর করার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদে একটি স্বাধীন সংবিধানিক নির্বাচন কমিশন গঠন করার কথা বলা আছে। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ১২টি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, যার চারটি অনুষ্ঠিত হয়েছে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত চারটি নির্বাচন দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষকদের কাছে কম-বেশি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। দলীয় বা আধা-সামরিক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত অন্য আটটি নির্বাচন নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক ও ভয়াবহ জালিয়াতির অভিযোগ রয়েছে। অর্থাৎ সাংবিধানিক অঙ্গীকার এবং সংবিধানের ১১৮(৪) অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের অপসারণের ক্ষেত্রে বিচারপতির সমতুল্য সুরক্ষা দেওয়া হলেও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ছাড়া আমাদের নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ অনুষ্ঠানের সক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি।

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশন সৃষ্টি করেছে, তাই এটি সঠিকভাবে যোগ্য, নির্দলীয় ও সুনামসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে গঠন করা আবশ্যক। এর জন্য যথার্থ আইনি কাঠামো তৈরি করা প্রয়োজন। আরও প্রয়োজন কমিশনের দায়িত্ব, ক্ষমতা, স্বাধীনতা ইত্যাদি সঠিকভাবে নিরূপণ করা। এর জনবল কাঠামো যথাযথ করা। একইসঙ্গে প্রয়োজন ব্যর্থতা ও অপকর্মের জন্য কমিশনকে দায়বদ্ধতার আওতায় আনা, যাতে কমিশনের সদস্যগণ ভবিষ্যতে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ ও জালিয়াতির নির্বাচন অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকে।

১.১ নির্বাচন কমিশন গঠন: প্রস্তাবিত নির্বাচন কমিশন গঠন আইন

অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সক্ষম নির্বাচন কমিশন সৃষ্টি করতে হলে এর গঠন প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও কারসাজিমুক্ত করা আবশ্যক। এ লক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়ণের কথা সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদে বলা থাকলেও, ২০২২ সাল পর্যন্ত তা করা হয়নি। এর বিপরীতে ২০১২ সাল থেকে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীনদের অনুগতদেরকে দিয়ে অনুসন্ধান কমিটি গঠন করে সরকার নিজেদের পছন্দের ব্যক্তিদের নির্বাচন কমিশন নিয়োগ দিয়েছে।[১০] নাগরিক সমাজের চাপে সরকার ২০২২ সালে আগের প্রজ্ঞাপনের আদলে অনুসন্ধান কমিটি গঠনের বিধান রেখে *প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার আইন, ২০২২*[১১] প্রণয়ন করলেও, ওই আইনের অধীনেও পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়।[১২] ফলে অনুসন্ধান কমিটির প্রজ্ঞাপন এবং নতুন প্রণীত আইনের অধীনের গঠিত পক্ষপাতদুষ্ট নির্বাচন কমিশনের অধীনে টানা তিনটি বিতর্কিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে – ২০১৪ সালের নির্বাচন একতরফাভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে ১৫৩ আসনেই প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় 'নির্বাচিত' হয়েছেন। ২০১৮ সালের নির্বাচনে মধ্যরাতে ভোট অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে সুজন ও টিআইবি'র গবেষণা থেকে।[১৩] ২০২৪ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে মূলত ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের মনোনীত ও তাদের দলের পৃষ্ঠপোষকতায় দাঁড়ানো স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সঙ্গে, যাকে অনেকে 'আমি-আর-ডামির' নির্বাচন বলে আখ্যায়িত করেন। তাই বিগত তিনটি নির্বাচনকে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নির্বাচন বলা যায় না, কারণ নির্বাচন মানেই, আইনের অঙ্গনে বহুল ব্যবহৃত 'ব্ল্যাক ল ডিকশনারি' অনুযায়ী, প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন, যেখানে বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প ও প্রতিযোগিতা থাকতে হবে।

যেহেতু নির্বাচনের মতো একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল প্রক্রিয়ার তদারকির দায়িত্ব সংবিধান নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত করেছে, তাই কমিশনে সৎ, যোগ্য ও সাহসী ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়ার আইনি কাঠামো তৈরিই নির্বাচন কমিশন নিয়োগ আইনের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, যাতে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা যেকোনো পরিস্থিতিতে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য অটল থাকেন। আর এই উদ্দেশ্য পূরণ করতে হলে সঠিক ব্যক্তিদের নিয়ে সঠিকভাবে অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হতে হবে এবং কমিটিকে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে। সত্যিকারের অনুসন্ধান চালিয়ে স্বচ্ছতার সঙ্গে সৎ, যোগ্য, নিরপেক্ষ ও সাহসী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে আনতে হবে, যাতে তারা আইনের আলোকে নৈতিকতা ও সাহসিকতার সঙ্গে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেন।

---

[১০] বদিউল আলম মজুমদার, 'আউয়াল কমিশনের নিয়োগের বৈধতাই প্রশ্নবিদ্ধ,' *প্রথম আলো*, ১৮ জুলাই, ২০২৩।

[১১] ২০২১ সালের ১৮ নভেম্বর মাসে 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিকে'র পক্ষ থেকে রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ প্রদানের জন্য একটি আইনের খসড়া তৈরি করে আইনমন্ত্রীকে দেওয়া হয়। কিন্তু আইন প্রণয়নের সময় নেই – এই অজুহাতে তিনি খসড়াটি বিবেচনায় নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, 'নির্বাচন কমিশন গঠনে আইন প্রণয়নের সুযোগ নেই' (*বাংলা ট্রিবিউন ডটকম*, ২৯ ডিসেম্বর ২০২১)। এরপর অবশ্য তড়িগড়ি করে ২০২২ সালের ২৩ জানুয়ারি তিনি সংসদে একটি বিল উত্থাপন এবং ২৭ জানুয়ারি তারিখে আগের প্রজ্ঞাপনের আদতে একটি আইন প্রণয়ন করেন। সংসদে পাশ করা আইনটির অনেক ত্রুটি রয়েছে। দেখুন, বদিউল আলম মজুমদার, 'প্রস্তাবিত নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইনে অসংগতি,' *কালের কণ্ঠ*, ২৪ জানুয়ারি ২০২২।

[১২] বদিউল আলম মজুমদার, 'অনুসন্ধান কমিটির অনুসন্ধান যেন স্বচ্ছ হয়,' *প্রথম আলো*, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২; বদিউল আলম মজুমদার, 'অনুসন্ধান কমিটিকে যা বলে এলাম,' *প্রথম আলো*, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২; বদিউল আলম মজুমদার, 'স্বচ্ছ অনুসন্ধানে 'সার্চ' কমিটির সম্ভাব্য করণীয়,' *সমকাল*, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২।

[১৩] ২০১৮ সালের নির্বাচনের কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল বিশ্লেষণ করে 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক' নির্বাচনের বিভিন্ন অসঙ্গতি ও জালিয়াতির চিত্র তুলে ধরেছে। টিআইবি ৫০টি আসন নিয়ে গবেষণা করে ৩৩টি আসনে আগের রাতে সিল মারার তথ্য পেয়েছে। দেখুনঃ www.shujan.org; ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (২০১৯), 'একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা,' ৩ এপ্রিল, ২০১৯; www.ti-bangladesh.org

বিদ্যমান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইনে উপরোল্লেখিত বিষয়গুলো বহুলাংশে উপেক্ষিতই রয়ে গেছে। ২০২২ সালের আইনটি অনুসন্ধান কমিটির কার্যাবলির স্বচ্ছতা নিশ্চিতের ব্যাপারে একেবারেই নিশ্চুপ। কমিটি কাদের নাম সুপারিশ করছে, কীভাবে সেসব নাম বাছাই করা হয়েছে – তা জনসমক্ষে প্রকাশের কোনো বাধ্যবাধকতা আইনটিতে রাখা হয়নি। ফলে নিয়োগের পুরো প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনগণ অন্ধকারেই থেকে গেছে, যা একটি গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। আর জনগণকে পুরো প্রক্রিয়া সম্পর্কে অন্ধকারে রাখার ফলে ক্ষমতাসীনদের পক্ষে তাদের অনুগতদের নিয়ে গঠিত অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশে পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তিদের নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে। বাস্তবে ঘটেছেও তাই – নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছিল সম্পূর্ণ অস্বচ্ছ পদ্ধতিতে। তাই অনুসন্ধান কমিটির কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব, কার্যাবলি, ক্ষমতা ও স্বাধীনতা নির্ধারিত করা, তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং কমিশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে একটি সমন্বিত আইন প্রণয়ন করা জরুরি। এ লক্ষ্যে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে *নির্বাচন কমিশন আইন*, ২০২৫ শিরোনামে একটি পূর্ণাঙ্গ আইনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

ক্ষমতাসীনদের অনুগত ও পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তিদের নিয়োগ বন্ধ করতে প্রস্তাবিত খসড়া আইনে আমরা রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে এবং নাগরিক সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বচ্ছতার নীতি অনুসরণ করে নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ প্রদানের বিধান অন্তর্ভুক্ত করেছি। এলক্ষ্যে আমরা প্রধান বিচারপতির প্রতিনিধি হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রী, সংসদের বিরোধী দলের নেতা/নেত্রী, সংসদের তৃতীয় বৃহত্তম দলের প্রতিনিধি হিসেবে তিনজন সংসদ সদস্য, বিদায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও চারজন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধির সমন্বয়ে, যার মধ্যে একজনের বয়স হবে অনূর্ধ্ব ৩০ বছর, একটি 'অনুসন্ধান কমিটি' গঠনের প্রস্তাব করেছি। অনুসন্ধান কমিটির দায়িত্ব হবে রাজনৈতিক দলের পরিবর্তে জনগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত নাম থেকে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে তিনজন নারীসহ দশজনের নাম নির্বাচন কমিশনে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করা। প্রাপ্ত সকল নাম থেকে প্রাথমিক বাছাইয়ের ভিত্তিতে তৈরি তালিকা থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে অনুসন্ধান কমিটি দশজনের নাম চূড়ান্ত করবে। এই নামের তালিকার সঙ্গে অনুসন্ধান কমিটি কোন যুক্তি ও মানদণ্ডের ভিত্তিতে দশজনের নাম চূড়ান্ত করেছে তার একটি প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করবে। কমিটি নামের তালিকা ও এ সংক্রান্ত প্রতিবেদনটি জনগণের অবগতির জন্য প্রকাশ করবে। কমিশনের পক্ষ থেকে আমরা রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে নাম আহ্বানের বিপক্ষে, কারণ এতে বিভিন্ন ধরনের কারসাজি এবং তদবির করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এছাড়াও নাম প্রস্তাবে রাজনৈতিক দলকে যুক্ত না করলে কমিশনে নিয়োগ প্রাপ্তদের কাউকেই কোনো দলের তকমা বহন করতে হবে না।

এছাড়াও প্রস্তাবিত এই আইনে নির্বাচন কমিশনের কর্মের শর্তাবলি, ক্ষমতা, আর্থিক স্বাধীনতা, পদত্যাগ, অপসারণ, কমিশনে শূন্যতা, কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশ, কমিশনারদের সম্পদের হিসাব প্রদান ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রস্তাবিত আইনে একটি আচরণবিধিও সংযোজন করা হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে অনুসন্ধান কমিটি গঠনের বিকল্প হতে পারে একটি স্থায়ী জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি)। শ্রীলঙ্কার মতো অনেক দেশেই স্থায়ী জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল রয়েছে। আমাদেরও বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন। এনসিসি থাকলে এর মাধ্যমেই বিভিন্ন সাংবিধানিক, এমনকি বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানেও নিয়োগ প্রদান সম্ভব হবে। তবে এক্ষেত্রেও নিয়োগ প্রক্রিয়াটি যাতে স্বচ্ছ ও কারসাজিমুক্ত হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল গঠনের জন্য অবশ্য সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন পড়বে।

১.২ নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনকে চারটি সুস্পষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দায়িত্বগুলো হলোঃ রাষ্ট্রপতির নির্বাচন অনুষ্ঠান, জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান, সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণ এবং ভোটার তালিকা তৈরি। লক্ষণীয় যে, সংবিধানে নির্বাচন কমিশনকে স্থানীয় সরকারের নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। অতীতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় তথা সরকারের অনুরোধেই নির্বাচন কমিশন স্থানীয় সরকার নির্বাচন পরিচালনা করেছে।

সংবিধানে উপরোল্লেখিত এসব কাজ এবং *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২ (আরপিও) অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা করার জন্য ২০০৮ সালে অধ্যাদেশ হিসেবে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়, যা *নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন*, ২০০৯ নামে পরিচিত। এ আইনে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন, রাষ্ট্রপতি, জাতীয় সংসদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি করপোরেশন ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহের নির্বাচন পরিচালনাসহ উপ-নির্বাচন এবং গণভোট অনুষ্ঠান, ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ, নির্বাচনের ফলাফল একত্রীকরণ এবং সরকারি গেজেটে প্রকাশ, স্থানীয় পরিষদে নির্বাচনি দরখাস্ত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ট্রাইব্যুনাল গঠনসহ বেশ কিছু দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে।

ভোটার তালিকা তৈরির সঙ্গে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) প্রণয়ন, সংরক্ষণ ও বিতরণ ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। কিন্তু জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত বিষয়াদি সংবিধানিকভাবে নির্বাচন কমিশনকে বা অন্য কোনো স্বাধীন কর্তৃপক্ষকে না দেওয়ার কারণে গত আওয়ামী লীগ সরকার উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এ দায়িত্ব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করতে আইন প্রণয়ন করেছিল, যা এখনও বহাল আছে। আমরা শঙ্কিত যে, ভবিষ্যতেও জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত বিষয়াদি সরকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নিয়ে যাওয়ার অপচেষ্টা চালাতে পারে, যা জাতীয় পরিচয়পত্র তথা ভোটার তালিকার বিশ্বাসযোগ্যতা হুমকির মধ্যে ঠেলে দিতে পারে। তাই আমরা অবিলম্বে এনআইডি ব্যবস্থাপনা নির্বাচন কমিশনে ফেরত আনার জন্য উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

তবে জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান একটি বিরাট ও স্পর্শকাতর কর্মযজ্ঞ এবং নির্বাচন কমিশনকে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের কাজেই নিবিষ্ট থাকা ও সর্বশক্তি নিয়োগ করা আবশ্যক। এছাড়াও এনআইডি ব্যবস্থাপনা একটি জটিল বিষয় যার জন্য বিশেষ কারিগরি দক্ষতা আবশ্যক। এছাড়াও ভবিষ্যতে জন্মনিবন্ধনের তথ্যাবলিও এনআইডির সঙ্গে যুক্ত হবে এবং এর ব্যবস্থাপনার কাজটি ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হবে। তাই সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের ভিত্তিতে আমরা ভবিষ্যতে এনআইডি ব্যবস্থাপনার জন্য একটি স্বাধীন সংবিধিনিবদ্ধ কমিশন স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

অংশীজনের মতামত, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও আমাদের পর্যালোচনার ভিত্তিতে জাতীয় পরিচয়পত্র সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে আমরা নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে এ সংক্রান্ত সুপারিশসমূহ জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) ব্যবস্থাপনা ও ভোটার তালিকা অধ্যায়ে সংযুক্ত করেছি। এছাড়াও আমরা কমিশনের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশন সংক্রান্ত নিম্নের সুপারিশগুলো করছি:

সুপারিশ

১. স্থানীয় সরকারের নির্বাচন অনুষ্ঠানের পুরো দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের কাছে ন্যস্ত করার।

২. ভোটার শিক্ষা ও সচেতনতা এবং গবেষণা কার্যক্রমকে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা। এসব কার্যক্রমে শিক্ষার্থী ও বেসরকারি সংস্থার সহায়তা গ্রহণ করার।

৩. আউয়াল কমিশন ২০২৩ সালে যেসব বিতর্কিত রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধন প্রদান করেছে, যথাযথ তদন্তসাপেক্ষে সেগুলোর নিবন্ধন বাতিল করার।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতির ও জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান নির্বাচন কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব। একইভাবে নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণও কমিশনের অন্যতম। এই বিষয়গুলো এই প্রতিবেদনের অন্যত্র আলোচিত হয়েছে।

২.০ নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা

পৃথিবীর অনেক দেশের নির্বাচন কমিশন 'স্বাধীন' বিশেষণে বিশেষায়িত হলেও সরকারকে নানাভাবে কমিশনের কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করতে দেখা যায়। তাই নির্বাচন কমিশন আইনগতভাবে স্বাধীন হলেই যে বাস্তবে নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে, তার নিশ্চয়তা নেই। আবার অনেক দেশে আইনি স্বাধীনতা ছাড়াই নির্বাচন কমিশনকে সরকারের হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বাধীনভাবে নির্বাচন পরিচালনা করতে দেখা যায়। বিভিন্ন দেশের সংবিধান, নির্বাচনি আইন, নির্বাচনি কার্যক্রম পরিচালনা প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতাকে বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন: ১. কাঠামোগত স্বাধীনতা (structural independence), ২. কার্যগত স্বাধীনতা (operational independence), ৩. আর্থিক স্বাধীনতা (financial independence), এবং ৪. আচরণগত স্বাধীনতা (behavioral independence)।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৮(৪) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, "নির্বাচন কমিশন দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন এবং কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন হইবেন।" এ ধরনের স্বাধীনতা কাঠামোগত স্বাধীনতা হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের জন্য কাঠামোগত স্বাধীনতার পাশাপাশি কার্যগত এবং আর্থিক স্বাধীনতাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী "নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হইবে" এমন বিধান থাকা সত্ত্বেও নির্বাহী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কমিশনকে অতীতে সহায়তা না করার অনেক উদাহরণ আছে। যেমন, ২০১১ সালে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন নির্বাচনের সময় কমিশন সেনাবাহিনী নিয়োগের জন্য সরকারকে চিঠি দিয়েছিল। সেনা নিয়োগ করা তো দূরের কথা, সরকার সে চিঠির জবাব পর্যন্ত দেয়নি। অতীতে অনেক ক্ষেত্রেই সরকার নির্বাচন কমিশনকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করেছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সফলও হয়েছে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় বিশেষ বাহিনীকেও ব্যবহার করেছে। বস্তুত সরকারের হাতে অনেক কলকব্জা ও ক্ষমতা আছে যা দিয়ে সরকার যে কোনো প্রতিষ্ঠানকেই নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। তাই সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব ড. সা'দত হুসাইনের মতে, আমাদের সমাজে একমাত্র সরকারই স্বাধীন। কিন্তু সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য কমিশনের স্বাধীনতা অপরিহার্য।

কমিশনের স্বাধীনতার প্রতিফলন ঘটে এর সচিবালয়ের স্বাধীনতার ওপর। তাই ২০০৮ সালে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে সম্পূর্ণ স্বাধীন সচিবালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে *নির্বাচন কমিশন সচিবালয় অধ্যাদেশ, ২০০৮* জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে সংসদে অনুমোদনের মাধ্যমে অধ্যাদেশটি *নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন, ২০০৯* নামে অবহিত হয়। এই আইনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে স্বাধীন সচিবালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছে। ২০০৯-১২ পর্যন্ত ড. এটিএম শামসুল হুদার নেতৃত্বে গঠিত কমিশন এর সচিবালয়কে সরকারের প্রভাবমুক্ত রাখতে সক্ষম হলেও পরবর্তীতে অন্যান্য অনেক কারণের পাশাপাশি এই আইনের দুর্বলতার সুযোগে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় সরকারের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং কমিশনারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়।[১৪]

[১৪] বদিউল আলম মজুমদার, 'সিইসির একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংবিধান পরিপন্থী,' *প্রথম আলো*, ২০ জুলাই ২০১৭

সরকারের নির্বাহী বিভাগ থেকে সচিবসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নিয়োগ এবং ঐসব কর্মকর্তার মাধ্যমে কমিশনের সিদ্ধান্তকে সরকারের পক্ষে নিয়ে যাওয়া এবং ২০১২-২০২৪ সময়কালে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবর্তে ক্ষমতাসীন দলকে নির্বাচনে জিতিয়ে আনার জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণই নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের প্রধান কাজ ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। নির্বাচন কমিশনে পর্যাপ্ত দক্ষ জনবল থাকা সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রেষণে অন্যান্য বিভাগ থেকে কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়ে সরকারের এজেন্ডা বাস্তবায়ন ছিল ওই সময়ের সচিবালয়ের অন্যতম দায়িত্ব। এসময়ে এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয় যে কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তারা তাদের স্বকীয়তা হারিয়ে অসহায়ত্ব বোধ করেন। অনেক কর্মকর্তা বাধ্য হয়ে অথবা পদোন্নতিসহ অন্যান্য সুবিধা পাওয়ার আশায় সরকারের আজ্ঞাবহ হয়ে যান।

নির্বাচন কমিশনকে তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হলে এর আর্থিক স্বাধীনতাও নিশ্চিত করা আবশ্যক। এ লক্ষ্যে সংবিধানের সংবিধানের ৮৮ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে কমিশনের সদস্যদের পারিশ্রমিক ও প্রশাসনিক ব্যয়কে রাষ্ট্রের সংযুক্ত তহবিলে দায়যুক্ত করা হয়েছে। তবে কেবল পারিশ্রমিক ও প্রশাসনিক ব্যয় সংযুক্ত তহবিলে অন্তর্ভুক্ত করাই যথেষ্ট নয়, কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের, বিশেষত নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যয়কেও রাষ্ট্রের সংযুক্ত তহবিলের ওপর দায়যুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ অতীতে সরকার নির্বাচন কমিশনের চাহিদামতো অর্থ বরাদ্দ দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি সরকার কমিশনের সদস্যদের পারিশ্রমিকের অর্থ ছাড় দিতেও গড়িমসি করেছে। সরকারের এ ধরনের নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রমকে প্রভাবিত করেছে এবং কমিশনের স্বাধীনতা খর্ব করেছে।

আচরণগত স্বাধীনতা নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। আচরণগত স্বাধীনতা বলতে নির্বাচন কমিশন ও এর সদস্যদের আচরণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোনো প্রকার চাপ ও প্রভাবের বাইরে থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতাকে বোঝায়। এটি শুধু আইনি কাঠামো বা সংবিধান প্রদত্ত স্বাধীনতার ওপর নির্ভর করে না; বরং কমিশনের সদস্যদের নৈতিক মান, পেশাদারিত্ব এবং নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের আচরণগত স্বাধীনতার বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে প্রশ্নবিদ্ধ। সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হলেও এর সদস্যদের আচরণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রায়শই পক্ষপাতদুষ্টতা ও রাজনৈতিক চাপের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। বিশেষত নির্বাচনের সময় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা নির্ধারণ, ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া পরিচালনা এবং নির্বাচনের ফল ঘোষণার ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক চাপ দ্বারা প্রভাবিত হতে দেখা গেছে। এসব ক্ষেত্রে কমিশনের পেশাদারিত্বের অভাবও পরিলক্ষিত হয়, যা কমিশনের সদস্য নিয়োগে রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে আরও তীব্র হয়েছে। কমিশনের কার্যক্রম নিয়ে কেউ সমালোচনা করলে সেটি পেশাদারিত্বের সঙ্গে মোকাবিলা না করে বরং কমিশনকে সমালোচনাকারীদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতেও দেখা গেছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের গাম্ভীর্য ও মর্যাদা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। যেমন, সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল ২০২২ সালে গণমাধ্যমের কাছে মন্তব্য করেছিলেন অবাধ নির্বাচন আয়োজনের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের একার নয়।[১৫] ২০২৩ সালে তিনি আবার মন্তব্য করেছিলেন, নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে চিন্তিত নয়।[১৬] নির্বাচনে সহিংসতা রোধ করার দায়িত্বও নির্বাচন কমিশনের নয় বলে অনেক কমিশন মন্তব্য করেছেন।[১৭] এ ধরনের পরিস্থিতি নির্বাচন কমিশনের প্রতি জনগণের আস্থা কমিয়ে দিয়েছে এবং নির্বাচনি প্রক্রিয়ার গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

আচরণগত স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে একটি কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ জরুরি। প্রথমত, কমিশনের সদস্য নিয়োগে স্বচ্ছ ও প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা প্রয়োজন। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রস্তাবিত নির্বাচন কমিশন আইনে এ বিষয়টির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, কমিশনের পেশাদারিত্ব উন্নয়নের জন্য সদস্যদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক, যাতে তাঁরা দায়িত্ব পালনকালে দক্ষতা, সদাচারণ ও নৈতিক মানদণ্ড বজায় রাখতে পারেন। এছাড়াও কমিশনের কার্যক্রমের ফলপ্রসূতা প্রদর্শনে গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের মাধ্যমে কমিশনের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং গঠনমূলক সমালোচনার সুযোগ তৈরি করতে হবে, যা কমিশনের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা এবং গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে সহায়ক হবে।

২.১ নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা

নির্বাচন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার যতদূর সম্ভব নিরঙ্কুষ হওয়া আবশ্যক, যাতে কমিশনের পক্ষে নির্বাচনকালীন রেফারির কাজটি যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব হয়। বস্তুত আমাদের উচ্চ আদালত সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার (inherent power) স্বীকৃতি দিয়েছে এবং প্রয়োজনে বিধি-বিধানের সাথে সংযোজনের অধিকারও কমিশনকে দিয়েছে।[১৮]

---

[১৫] 'New CEC Awal thinks EC will not be solely responsible for fair elections,' *bdnews24.com*, 27 February 2022.

১৬ 'EC not worried about 'legitimacy' of next polls: CEC,' *The Daily Star*, 05 October 2023.

১৭ 'EC cannot stop poll violence, political parties have to take responsibility: CEC,' *The Business Standard*, January 15, 2025.

[১৮] *Altaf Hossain vs Abul Kashem* [45 DLR (AD) (1993)]

প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা: নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বিশেষ করে নির্বাচনে প্রার্থিতা সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কমিশনের ক্ষমতাই যে চূড়ান্ত ইতোমধ্যেই আমাদের উচ্চ আদালত সে স্বীকৃতি দিয়েছে। আমরা নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে একমত।

এক্ষেত্রে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত অনুচ্ছেদ ১২৫(গ) নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতাকে আরও দৃঢ় করেছে। এটি কমিশনকে নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: "কোনো আদালত, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হইয়াছে এইরূপ কোনো নির্বাচনের বিষয়ে, নির্বাচন কমিশনকে যুক্তিসংগত নোটিশ ও শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া, অন্তর্বর্তী বা অন্য কোনো রূপে কোনো আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করিবেন না।" তবে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী সংক্রান্ত হাইকোর্টের সাম্প্রতিক রায় এ সাংবিধানিক বিধানকে ঝুঁকিতে ফেলতে পারে। তাই মামলাটি আপিল নিষ্পত্তির সময়ে যেন এ বিধানটি রক্ষা পায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

সুপারিশ

১. কোনো প্রার্থীর মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও বাতিলের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার রিটার্নিং কর্মকর্তা ও নির্বাচন কমিশনকে প্রদান করা।
২. শুধু নির্বাচন কমিশনের এখতিয়ার বহির্ভূত ও বেআইনি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে (coram non judice ও malice in law) আদালতের হস্তক্ষেপের এখতিয়ার রাখা।

সচিবালয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা: আমাদের সংবিধানের ১১৮(২) অনুচ্ছেদে বলা আছে যে, একাধিক কমিশনার নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। জাতীয় পার্টি মামলার[১৯] রায়ে আমাদের উচ্চ আদালত নির্বাচন কমিশনকে একটি কম্পোজিট বডি বা বা যৌথ সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। অর্থাৎ দৈনন্দিন রুটিন বিষয় ব্যতীত কমিশনের সকল সিদ্ধান্ত হবে সর্বসম্মতভাবে বা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে। তবে কমিশন এর যে কোনো সদস্যকে কমিশন বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য অনুমতি দিতে পারবে। তাই রিটার্নিং কর্মকর্তা, সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা-সহ ও নির্বাচনি কর্মকাণ্ডে জড়িত সকল কর্মকর্তা নিয়োগ ও তাদের কাজের তদারকির এবং নির্বাচন পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব থাকবে যৌথভাবে নির্বাচন কমিশনের ওপর। নির্বাচন কমিশনের সচিবালয় থাকবে অবশ্যই কমিশনের অধীনে, এককভাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের ওপর নয়। এই লক্ষ্যে আমরা নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে আরপিও'র অধ্যায় ২ এবং *নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন*, ২০০৯ সংশোধনের পক্ষে।

সুপারিশ

১. আরপিও ও নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন সংশোধনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের পুরো কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কমিশনের পরিপূর্ণ এখতিয়ার প্রতিষ্ঠা করা।

২. নির্বাচন কমিশনের সচিব নিয়োগের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে কমিশনের ওপর ন্যস্ত করা।

নির্বাচন কমিশনের ফলাফল বাতিলের ক্ষমতা: নির্বাচন কমিশনের নির্বাচনি ফলাফল বাতিলের এবং পুনর্নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা নিয়ে কিছুটা অস্পষ্টতা রয়েছে। বিগত আউয়াল কমিশন এ অস্পষ্টতা সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। আউয়াল কমিশন ৯০ ধারাতে 'নির্বাচনের' জায়গায় 'ভোট' শব্দটি প্রতিস্থাপন করে এ অস্পষ্টতা সৃষ্টি করেছে।[২০] আমাদের সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের *নূর হোসেন বনাম নজরুল ইসলাম* মামলায় বিচারপতি কাজী এবাদুল হক সুস্পষ্ট রায় দিয়েছেন যে, নির্বাচন চলাকালীন অনিয়মের অভিযোগ উঠলে কমিশন তদন্তসাপেক্ষে নির্বাচনি ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দিতে পারবে।[২১]

সুপারিশ

১. আরপিও'র ৯১(ক) অনুচ্ছেদ সংশোধন করে নির্বাচনকালীন অনিয়মের অভিযোগের ক্ষেত্রে নির্বাচনি ফলাফল স্থগিত রেখে অভিযোগের তদন্ত, তদন্তের ফলাফলের ভিত্তিতে নির্বাচন বাতিল এবং পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনকে প্রদান করা।

২. আরপিও'র ৯১ ধারায় 'ভোট' শব্দের জায়গায় 'নির্বাচন' শব্দটি আবার প্রতিস্থাপন করা।

নির্বাচন স্থগিত করার ক্ষমতা: বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিগত কয়েক দশকে একাধিক বিতর্কিত ও কারচুপির নির্বাচনের কারণে ক্রমাগত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। বিশেষ করে ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালের নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম ও গ্রহণযোগ্যতার অভাবে পুরো নির্বাচন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। ফলে এ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানটির প্রতি জনগণের আস্থা হ্রাস পেয়েছে। একটি অবাধ, সুষ্ঠু

[১৯] *Jatiya Party vs Election Commission* [53 DLR (AD) (2001)]
[২০] বদিউল আলম মজুমদার, 'নির্বাচন কমিশন কেন আত্মঘাতী হলো,' *সমকাল*, ৬ জুলাই ২০২৩
[২১] *Noor Hossain vs Nazrul Islam* [5 BLC (AD) (2000)]

এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর একটি অপরিহার্য অংশ। তবে নির্বাচনি ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর পক্ষপাতিত্ব, আইনের দুর্বল প্রয়োগ এবং রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে নির্বাচনগুলো প্রায়ই প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। এই ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলে কমিশন যাতে নির্বাচন স্থগিত করতে পারে সে বিধান থাকা আবশ্যক।

সুপারিশ

১. ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালের মতো বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যা বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে, লিখিতভাবে যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রদর্শনপূর্বক, সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে, সর্বোচ্চ ৯০ দিনের জন্য নির্বাচন স্থগিত করার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনকে প্রদানের জন্য রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের কাছে মতামত চাওয়ার বিধান করা।

নির্বাচনকালীন নির্বাহী বিভাগের কার্যক্রমে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা: বাংলাদেশে নির্বাচনকালীন নির্বাহী বিভাগের ভূমিকা প্রায়শই বিতর্ক সৃষ্টি করে, বিশেষত দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলোতে ক্ষমতাসীন দলের প্রভাব ও প্রশাসনিক কর্তৃত্বের অপব্যবহারের ফলে এ নির্বাচনগুলো চরমভাবে বিতর্কিত ও অগ্রহণযোগ্য নির্বাচনের নজির হয়ে পড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশনকে কার্যকর করার এবং এর যথাযথ ক্ষমতায়নের কোনো বিকল্প নেই।

সুপারিশ

১. নির্বাচনকালীন নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে পারে নির্বাহী বিভাগের পক্ষ থেকে এমন কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের অনুমতি নেওয়ার বিধান করা। একইসঙ্গে প্রস্তাবিত *নির্বাচন কমিশন আইন*, ২০২৫-এ এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই প্রাধান্য পাওয়ার বিধান যুক্ত করা।

প্রার্থিতা বাতিলের ক্ষমতা: নির্বাচনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রার্থীদের প্রার্থিতা বাতিলের ক্ষেত্রে কমিশনের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা রয়েছে। বিশেষ করে হলফনামায় মিথ্যা তথ্য দিলে বা কোনো তথ্য গোপন করলে প্রার্থিতা বাতিলের ক্ষমতা কমিশনের রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কমিশনকে কখনো এ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে দেখা যায়নি। তাই নির্বাচন কমিশনের প্রার্থিতা বাতিলের ক্ষমতা যথাযথভাবে নির্ধারিত করা গুরুত্বপূর্ণ।

সুপারিশঃ

১. নির্বাচনি তফসিলের সময় বাড়িয়ে দিয়ে প্রার্থিতা চূড়ান্ত করার সময় বেশি করা এবং প্রচার-প্রচারণার সময় কমানোর সুপারিশ করা।

২. মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সময় প্রার্থীদের হলফনামা যাচাই-বাচাই করে মিথ্যা তথ্য পেলে প্রার্থিতা বাতিলের বিধান কঠোরভাবে প্রয়োগ করা।

৩. হলফনামায় মিথ্যা তথ্য দেওয়ার কারণে আদালত কর্তৃক কারো নির্বাচন বাতিল হলে তাকে পরবর্তী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে অযোগ্য করা।

৪. আচরণবিধি লঙ্ঘনের কারণেও প্রার্থিতা বাতিলের ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনকে প্রদান করা।

১.৫ নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতা

গণতান্ত্রিক শাসনের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো নজরদারিত্ব। বস্তুত আধুনিক রাষ্ট্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য হলো এ নজরদারিত্বের ভূমিকা পালনের জন্য 'পাহারাদার' সৃষ্টি। আধুনিক রাষ্ট্র কাঠমো যে তিনটি প্রায় 'কো-ইকোয়েল' বা সমগুরুত্বপূর্ণ বিভাগে বিভক্ত – নির্বাহী বিভাগ, আইনসভা ও বিচার বিভাগ – তার অন্যতম লক্ষ্যই হলো ক্ষমতার বিভাজন করে একটি নজরদারিত্বের কাঠামো গড়ে তোলা, যাতে কোনো একটি বিভাগ বাড়াবাড়ি বা অন্যায় করে পার পেয়ে যেতে না পারে। এমনি নজরদারিত্বের কাঠামোতে প্রত্যেক বিভাগের বাড়াবাড়ি নিয়ন্ত্রণে রাখতে, এমনকি বিহিত করতে পারে অন্য দুটি বিভাগ। যেমন, নির্বাহী বিভাগ ক্ষমতার অপব্যবহার করে যাতে পার পেয়ে যেতে না পারে, তার প্রতিকারের ক্ষমতা রয়েছে আইনসভা ও বিচার বিভাগের কাছে। এ ধরনের নজরদারিত্বের কাঠামোর মূল লক্ষ্য হলো নাগরিকের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ। ক্ষমতার বিভাজন তথা নজরদারিত্বের এ কাঠামো ভেঙে যাওয়ার ফলেই বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গত ১৫ বছরে দানবে পরিণত হয়েছে। এর মাধ্যমে চার্লস লুইস মন্টেস্কোর ১৭৮৫ সালের উক্তিই সত্যে পরিণত হয়েছে – 'There would be an end of everything where the same man or the same body exercise the three powers.' (সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে যদি একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তিন ধরনের ক্ষমতাই ভোগ করে।)

বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতার আলোকে সৃষ্ট ক্ষমতার এমন বিভাজন এবং সরকারের তিনটি বিভাগের পরস্পরের ওপর নজরদারিত্বের এমন কাঠামোর মূল কারণ হলো প্রায় সর্বজনীন একটি মানবিক দুর্বলতা। এ দুর্বলতাটি হলো সাধারণত কোনো ব্যক্তি যখন ক্ষমতা পায়, তখন সে তা কুক্ষিগত করার চেষ্টা করে। একইসঙ্গে সে ক্ষমতার অপব্যবহার করে। তাই আধুনিক রাষ্ট্রে ক্ষমতার বিভাজন এবং একাধিক ক্ষমতার কেন্দ্র সৃষ্টির মাধ্যমেই ক্ষমতা কুক্ষিগতকরণ ও ক্ষমতা অপব্যবহার রোধ করা হয়। জন লক ও মন্টেস্কোর মত পণ্ডিতেরা ক্ষমতার বিভাজনের এ নীতির উদ্ভাবক, যা আধুনিক রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামোতে পরিণত হয়েছে।

শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধার্থে রাষ্ট্রের ক্ষমতার বিভাজনের উপরিকাঠামোর নিচে অনেক ক্ষমতার কেন্দ্র তৈরি করা হয়, যেগুলোর প্রতিষ্ঠানিকীকরণ ও কার্যকারিতার ওপর সরকারের সফলতা নির্ভর করে। এই ক্ষমতার কেন্দ্রগুলোর গুরুত্ব অসম। সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতার কেন্দ্রগুলো রাষ্ট্রের সংবিধান দ্বারা সৃষ্টি হয় এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলে পরিচিতি লাভ করে। অন্য কম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতার কেন্দ্রগুলো আইন দ্বারা সৃষ্টি এবং এগুলোকে বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান বলা হয়। আমাদের শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচন কমিশন একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশ সংবিধানের 'নির্বাচন' শীর্ষক সপ্তম ভাগের ১১৮ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। পূর্বের আলোচনা থেকে এটি সুস্পষ্ট যে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে কোনো প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা অপরিসীম নয়। এর ক্ষমতাও নিরঙ্কুশ নয়। সংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হলেও নির্বাচন কমিশনের গঠন, কার্যপরিধি, ক্ষমতা ও স্বাধীনতা আইন দ্বারা নির্ধারিত হয়। আইন দ্বারা এর দায়বদ্ধতাও নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক, যাতে কমিশন ক্ষমতার অপব্যবহার করে জনগণের অধিকার পদদলিত করতে না পারে, যেমনিভাবে গত তিনটি নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশের মানুষের ভোটাধিকার হরণ করেছে। তা সম্ভব হয়েছে কারণ নির্বাচন কমিশনের জন্য আমাদের দেশে একটি যথোপযুক্ত আইন ছিল না – ছিল না একটি নজরদারিত্বের কাঠামো। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, বহু গড়িমসির পর ২০২২ সালে যে আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছিল তা ছিল মূলত নির্বাচন কমিশন নিয়োগ আইন, যা দিয়ে ক্ষমতাসীনদের পক্ষে তাদের পছন্দের ব্যক্তিদেরকে নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠন করা সম্ভব ছিল, যারা জনস্বার্থের পরিবর্তে তাদের নিয়োগকর্তাদের স্বার্থে কাজ করেছিল এবং আমাদের নির্বাচনব্যবস্থাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের বহু নাগরিককে প্রাণ দিতে এবং অনেককে গুরুতরভাবে আহত হতে হয়েছে। তাই আমরা নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের জন্য একটি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দায়বদ্ধতার কাঠামো সৃষ্টির সুপারিশ করেছি।

বিদ্যমান ব্যবস্থায় নির্বাচন কমিশন দেশের আমলাতন্ত্র তথা নির্বাহী বিভাগের কাছে অনেকটাই জিম্মি। যেমন, কমিশনের নির্বাচনি আইন-কানুন সংস্কারের প্রস্তাব আইন মন্ত্রণালয়ে যায়, যার চূড়ান্ত রূপ নির্ভর করে নির্বাহী বিভাগের সিদ্ধান্তের ওপর। তেমনিভাবে কমিশনের আর্থিক বরাদ্দের প্রস্তাব যায় অর্থ মন্ত্রণালয়ে, যার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তও নির্ভর করে আমলাতন্ত্রের ওপর। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমলাতন্ত্র ও নির্বাহী বিভাগের ওপর নির্বাচন কমিশনের এমন নির্ভরশীলতা দূর করতে আমরা নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কার কমিশনের পক্ষে নির্বাচন কমিশনের নির্বাচন সংক্রান্ত সকল ব্যয় প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিলের ওপর দায়যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা করেছি। প্রসঙ্গত, বর্তমানে নির্বাচন কমিশনারদের পারিশ্রমিক ও সচিবালয় সংক্রান্ত ব্যয় প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিলের ওপর দায়যুক্ত।

একইসঙ্গে আমরা নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী বিভাগের কর্তৃত্বের আওতা থেকে মুক্ত করে সংসদের উচ্চকক্ষের একটি সর্বদলীয় বিশেষ কমিটির মাধ্যমে সরকারের সঙ্গে সকল যোগাযোগের মাধ্যমে পরিণত করার গুরুত্বও অনুধাবন করছি। এই কমিটি নির্বাচন কমিশনের আইন-সংক্রান্ত, আর্থিক ও অন্যান্য প্রস্তাব যাচাই-বাছাই করে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। এ যাচাই-বাছাইয়ের প্রক্রিয়ায় নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বিশেষ কমিটির আলাপ-আলোচনা এবং কমিশনের পক্ষ থেকে তাদের প্রস্তাবের যৌক্তিকতা তুলে ধরার সুযোগ হবে, যা বিদ্যমান ব্যবস্থায় ঘটে না। বিশেষ কমিটির দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের কাজের তদারকি করা বা কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া নয়, বরং কমিশনের কাজে সহায়কের ভূমিকা পালন করা, যাতে কমিশন নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হতে পারে।

বিশেষ সংসদীয় কমিটির আরেকটি দায়িত্ব হবে নির্বাচন কমিশনকে, মেয়াদ শেষে, তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা ও শপথ ভঙ্গের জন্য দায়বদ্ধ করা। মেয়াদকালে অসদাচরণের দায়ে নির্বাচন কমিশনকে, সংবিধানের ১১৮(৫) অনুচ্ছেদ অনুয়ায়ী, সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতির দারস্থ হওয়ার সুযোগ রয়েছে, যদিও গত সরকারের আমলে এটি কার্যকর ছিল না।[২২] কিন্তু মেয়াদ অবসানের পর নির্বাচন কমিশনকে দায়বদ্ধ করার কোনো আইন বর্তমানে বাংলাদেশে নেই, যদিও একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কেউই দায়বদ্ধতার ঊর্ধ্বে নয়।

অস্ট্রেলিয়া এবং যুক্তরাজ্যসহ পৃথিবীর বেশ কিছু দেশে নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য স্পিকারের নেতৃত্বে পার্লামেন্টারি কমিটি আছে। এ কমিটি নির্বাচন কমিশনের আইনি, আর্থিক ও প্রশাসনিক চাহিদা নিশ্চিত করার পাশাপাশি কমিশনের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করে। প্রস্তাবিত দায়বদ্ধতার কাঠামো উদ্দেশ্য নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা খর্ব করা নয়, বরং কমিশনকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া, যাতে কমিশন তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে। সর্বোপরি কমিশন যেন মেয়াদকালে কোনো অপকর্মে জড়িত হয়ে না পড়ে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে। প্রসঙ্গত, এ ধরনের গার্ড-রেইল থাকলে গত রকিবউদ্দিন, নূরুল হুদা এবং আউয়াল কমিশন বিতর্কিত নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগে নিশ্চয়ই এর পরিণাম সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবত। এর এ ধরনের জবাবদিহিতার কাঠামো না থাকার কারণেই এ তিনটি কমিশন জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে ও ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে।

---

[২২] ২০১৮ সালে জালিয়াতির নির্বাচন অনুষ্ঠানের কারণে চরম অসদাচরণের অভিযোগ তুলে ২০২১ সালে ৪২ জন নাগরিক – যার মধ্যে বর্তমান কমিশন প্রধান বদিউল আলম মজুমদারও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন – নূরুল হুদা কমিশনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে দরখাস্ত করেছিলেন, কিন্তু রাষ্ট্রপতি এতে কর্ণপাতও করেনি।

সুপারিশ

১. নির্বাচন কমিশনারদের পারিশ্রমিক ও কমিশনের সাচিবিক ব্যয়ের পাশাপাশি কমিশনের সকল নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যয় প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিলে দায়যুক্ত করা।

২. নির্বাচন কমিশনের আইনি, আর্থিক ও প্রশাসনিক প্রস্তাব কোনো মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে প্রস্তাবিত সংসদীয় কমিটির নিকট উপস্থাপনের বিধান করা।

৩. প্রস্তাবিত *নির্বাচন কমিশন আইন* ২০২৫-এ কমিশনারদেরকে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা, আর্থিক অনিয়ম ও শপথ ভঙ্গের কারণে স্পিকারের নেতৃত্বে সংসদের উচ্চকক্ষের একটি সর্বদলীয় বিশেষ সংসদীয় কমিটিকে তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করা।

৪. *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ* ১৯৭২-এর ধারা সংশোধনপূর্বক নির্বাচনি অপরাধের মামলা দায়েরের সময়সীমা রহিত করা।

৫. একটি 'বিশেষ তদন্ত কমিশন' গঠনের মাধ্যমে ২০১৮ সালের জালিয়াতির নির্বাচনের দায় নিরূপণ করে দায়ী ব্যক্তিদেরকে বিচারকদের আওতায় আনা। প্রস্তাবিত কমিশনের কার্যপরিধি অন্যান্য নির্বাচনের ক্ষেত্রেও প্রসারিত করা, একইসঙ্গে আদালতের সঙ্গে জালিয়াতির মাধ্যমে যারা রায় বদলিয়ে দিয়ে আমাদের নির্বাচনি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে তাদেরকেও তদন্তের আওতায় আনা।

নির্বাচনের সার্টিফিকেশন

নির্বাচন কমিশনের মূল দায়িত্ব সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান। দুর্ভাগ্যবশত স্বাধীনতা অর্জনের গত ৫০ বছর পরও আমরা আমাদের জন্য একটি বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারিনি। ফলে বিতর্কিত ও জালিয়াতির নির্বাচনের গ্লানি জাতি হিসেবে আমাদেরকে বহন করতে হয়েছে। বিগত তিনটি নির্বাচন ছিল সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য এবং এগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু এ ব্যর্থতার দায় কোনা কমিশনই গ্রহণ করেনি। বরং তারা একদিকে নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়ার পক্ষে সাফাই গেয়েছে, অন্যদিকে নির্বাচনে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় রিটার্নিং কর্মকর্তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান নির্বাচন কমিশনের দাযিত্ব, তাই কমিশনকেই বিতর্কিত ও অগ্রহণযোগ্য নির্বাচনের দায় নিতে হবে। তাই আমরা নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে নিম্নের সুপারিশগুলো করছি:

সুপারিশ

১. জাতীয় নির্বাচনের পর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে, ফলাফল গেজেট আকারে প্রকাশের পূর্বে, নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের সুষ্ঠুতা, নিরপেক্ষতা ও সঠিকতা 'সার্টিফাই' করা এবং গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তা জনগণকে অবহিত করা।

২. নির্বাচনের সুষ্ঠুতা, নিরপেক্ষতা এবং গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কিত নির্বাচন কমিশনের ঘোষণায় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী কোনো রাজনৈতিক দল সংক্ষুব্ধ হলে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল বা সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে অভিযোগ করার সুযোগ সৃষ্টির বিধান করা। কমিশন/আদালত কর্তৃক সর্বোচ্চ ৭ কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি করার বিধান করা।

১.৬ নির্বাচনি মাঠ প্রশাসন

রিটার্নিং এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ: *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২-এ কাকে রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হবে, সে বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা নেই। তবে ১৯৭৩ সাল থেকে বাংলাদেশের সকল জাতীয় নির্বাচনে জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারদেরকে জাতীয় এবং স্থানীয় নির্বাচনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রশাসন ক্যাডার থেকে রিটার্নিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে বেশিরভাগ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রধানত প্রশাসন থেকে, বর্তমানে উপজেলা নির্বাহী অফিসারদেরকে সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু জেলা প্রশাসকদেরকে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগের মাধ্যমে নির্বাচনি ফলাফল সরকারি দলে পক্ষে নেওয়ার অভিযোগে বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজসহ বিভিন্ন অংশীজনরা কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তাদেরকে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ দেওয়ার দাবি তুলেন এবং এ দাবি ক্রমান্বয়ে জোরালো হচ্ছে।

একজন রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় সর্বেসর্বা। তিনি প্রিজাইডিং এবং সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ এবং তাদের কাজ মনিটরিং করতে পারেন। প্রয়োজনে একটি ভোটকেন্দ্র এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারেন। তিনি নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে পারেন, আবার পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে উপেক্ষাও করতে পারেন। তিনি নিরাপত্তা বাহিনীকে নির্বাচনি অপরাধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ডাকতে পারেন, আবার পক্ষপাতী হয়ে নীরব ভূমিকাও রাখতে পারেন। তাই নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য করতে রিটার্নিং অফিসারের নিরপেক্ষ ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে জেলা প্রশাসকদেরকে রিটার্নিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেওয়ায় নিম্নের সমস্যাগুলো সৃষ্টি হয়।

- আমাদের সিভিল সার্ভিসকে বিশেষ করে গত ১৫ বছরে শোচনীয়ভাবে দলীয়করণ করা হয়েছে। কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদোন্নতি এবং পদায়ন অনেকাংশে তাদের রাজনৈতিক রঙের ওপর নির্ভর করে। তাই একজন রাজনৈতিক জেলা প্রশাসকের পক্ষে নির্বাচনে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করা প্রায় অসম্ভব।

- বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণ আইন-শৃঙ্খলা কমিটির প্রধান থাকেন। একই ব্যক্তি আইন-শৃঙ্খলা কমিটির প্রধান ও রিটার্নিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করলে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় এবং স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ সৃষ্টি হয়, যা সুষ্ঠু নির্বাচনের ক্ষেত্রে বড় অন্তরায়। এ বিষয়ে ২০১৮ সালে আদালতে একটি রিট হয়, যেখানে শুনানি নিয়ে ১২ ডিসেম্বর ২০১৮ সালে আদালত জেলা প্রশাসকদের রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ কেন অবৈধ হবে না সে বিষয়ে রুল জারি করেন।[২৩]

- বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসককে নির্বাচনের পূর্বে এবং পরে সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে থেকে সরকারের মন্ত্রী ও এমপিদের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করতে হয়। এই সকল মন্ত্রী ও এমপিগণই সাধারণত নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ফলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও এমপিগণের সঙ্গে ভবিষ্যৎ দীর্ঘমেয়াদি সমন্বয়ের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসকের পক্ষে প্রভাবমুক্ত থেকে নিরপেক্ষ আচরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

- তাই বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক সরকারের প্রতিনিধি হওয়ায় তাদেরকে রিটার্নিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হলে প্রচ্ছন্নভাবে নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রমের ওপর সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের বদলি, শৃঙ্খলা বিধান ও চাকরির অন্যান্য সুবিধাবলিসহ পূর্ণাঙ্গ নিয়ন্ত্রণ সরকারের কাছে ন্যাস্ত থাকার কারণে তাদের পক্ষে সরকারের সিদ্ধান্তের বাহিরে গিয়ে নিরপেক্ষভাবে কাজ করা অত্যন্ত কঠিন। বিশেষত সরকারকে অসন্তুষ্ট করতে পারে, নির্বাচন কমিশনের এমন সিদ্ধান্ত তাদের পক্ষে বাস্তবায়ন করা দুরূহ হয়ে পড়ে।

নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তাগণ নির্বাচন কমিশনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে থাকেন। ফলে নিজস্ব কর্মকর্তাদের রিটার্নিং/সহকারী রিটার্নিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হলে নির্বাচন ব্যবস্থাপনার ওপর কমিশনের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। এতে নির্বাচন পরিচালনা সহজতর এবং নির্বাচনি অনিয়মের বিরুদ্ধে দ্রুততম সময়ে পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হবে। এছাড়া নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তাগণ নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করে থাকেন। তাদের নির্বাচন প্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধানে রাখা হলে পেশাদারিত্ব এবং নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে। তবে নির্বাচন কমিশনের কর্মকমর্তাদেরকে রিটার্নিং/সহকারী রিটার্নিং অফিসার হিসেবে নিয়োগে দিলে প্রশাসনিক কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে কিনা এবং প্রয়োজনীয় সহায়তার অভাবে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের পক্ষে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবে কিনা তা নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন রয়েছে। তবুও প্রায় সকল অংশীজনই নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদেরকে রিটার্নিং ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্বে নিয়োগ দেওয়ার পক্ষে।

সুপারিশ

১. নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রিটার্নিং ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ করা। এ দায়িত্ব পালনের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক কমিশনের কর্মকর্তা পাওয়া না গেলে প্রশাসনসহ অন্য ক্যাডার থেকে নিয়োগ করা।

২. রিটার্নিং বা সহকারী রিটার্নিং অফিসাদের জন্য একটি আচরণবিধিমালা প্রণয়ন এবং সেগুলো প্রয়োগের বিধান করা।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা: *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ* ১৯৭২-এ ২০০১ সালে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংজ্ঞায় প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ যুক্ত করা হয়, যা ২০০৮ পর্যন্ত যুক্ত ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে এ সংজ্ঞা থেকে এ প্রতিষ্ঠানকে বাদ দেওয়া হয়।

সুপারিশ

১. পুনরায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংজ্ঞায় প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ যুক্ত করা।

১.৭ নির্বাচন কমিশনের জনবল কাঠামো

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, মাঠ প্রশাসন এবং ইলেক্টোরাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে বর্তমানে মোট ৫,১১২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত আছেন। এর মধ্যে মাঠ প্রশাসনে ৩,৩৫০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কাজ করছেন। ৫,১১২ জনের মধ্যে ১,১৪৮ জন আউটসোর্সিংয়ের অংশ হিসেবে কর্মরত আছেন। নির্বাচন কমিশনের বর্তমান জনবল কাঠামো মূলত ২০১০ সালে অর্থাৎ আজ থেকে ১৪ বছর আগে প্রণয়ন করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২০১৭ সালে মুল কাঠামোতে কোনো পরিবর্তন না এনেই জনবল বাড়ানো হয়েছে। বর্তমান বাস্তবতার আলোকে তাই এটি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। এখানে উল্লেখ্য যে, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইনের ১৭(১) ধারায়ও কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো সময়ে সময়ে পর্যালোচনার কথা বলা হয়েছে।

[২৩] Legality of appointing DCs as returning officers questioned; The Daily Star, 10 January 2025

বর্তমানে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাগণ ক্যাডারভুক্ত নন। নির্বাচনের বিশাল কর্মযজ্ঞে একজন নির্বাচন কর্মকর্তাকে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা/থানা পর্যায়ে প্রশাসন, জুডিশিয়ারি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ অন্যান্য ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক সমন্বয়সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়, যা একজন নন-ক্যাডার কর্মকর্তা হিসেবে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তাদেরকে অনেক সময় প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। এছাড়াও জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচনসহ বিভিন্ন স্থানীয় নির্বাচনে কমিশনের কর্মকর্তাগণ রিটার্নিং/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করেন। কমিশনের কর্মকর্তাগণ ক্যাডার/সার্ভিসভুক্ত না হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই অন্যান্য ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ তাদের অধীনে দায়িত্ব পালনে অনীহা প্রকাশ করেন, যা নির্বাচনি কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

নির্বাচনকালীন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী নির্বাচন কমিশনের অধীনে প্রেষণে কাজ করে থাকে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ওপর পূর্ণাঙ্গ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না হলে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান অসম্ভব হয়ে পড়ে। আর এ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হয়। কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ক্যাডার সার্ভিসভুক্ত হওয়ায়, নন-ক্যাডার কর্মকর্তা হিসেবে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের পক্ষে তাদের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক কার্য সম্পাদন করা অনেক সময় অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়ে। অধিকন্তু সরকারের অন্যান্য অনেক বিভাগ যেমন, পরিসংখ্যান, সমবায়, পরিবার পরিকল্পনা, আনসার, ইকোনমিক, ইত্যাদি ক্যাডারগুলোতে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের চেয়ে অনেক কমসংখ্যক কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও তারা ক্যাডার সার্ভিসভুক্ত। অথচ নির্বাচন কমিশনের মতো একটি বৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সার্ভিসভুক্ত বা ক্যাডারভুক্ত করা হয়নি। প্রতিটি নির্বাচনের পূর্বেই রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ ও নির্বাচন বিশেষজ্ঞদের পক্ষ থেকে কমিশনের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির তাগিদ দেওয়া হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো নির্বাচন ক্যাডার প্রতিষ্ঠা করে এই সার্ভিসটিকে একটি মর্যাদাপূর্ণ পেশা হিসেবে গড়ে তোলা। নির্বাচন ক্যাডার/সার্ভিস কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হলে কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তারা রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পালনে আরও অধিক দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে পারবেন বলে আশা করা যায়। প্রসঙ্গত, নির্বাচন কমিশন কর্মকর্তাদের কার্যপরিধি ও গুরুত্ব বিবেচনায়, ১৯৮৩ সালে প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত 'এনাম কমিটি' নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের ক্যাডার সার্ভিসভুক্ত করার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (TIB) ২০০৬ সালে নির্বাচন কমিশনের ওপর 'Bangladesh Election Commission: A Diagnostic Study' শীর্ষক গবেষণায় নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নির্বাচন কর্মকর্তাদের ক্যাডারভুক্ত করার সুপারিশ করেছিল। সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ.টি.এম শামসুল হুদা নির্বাচন কর্মকর্তাদের পৃথক ক্যাডার গঠনের উদ্যোগী নিয়েছিলেন। এসব প্রস্তাব এবং অংশীজনের মতামত বিবেচনায় নিয়ে আমরা নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে নিম্নের সুপারিশ করছি।

সুপারিশ

১. কমিশনের সচিবালয় এবং আঞ্চলিক কার্যালয়ের অর্গানোগ্রাম ও জনবল কাঠমো একটি আন্তর্জাতিক অডিট ফার্মের মাধ্যমে নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

২. একটি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য একটি পৃথক সার্ভিস সৃষ্টির বিধান করা।

১.৮ নির্বাচন কমিশনের কার্যপদ্ধতি

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এর ধারা ৩ এবং *নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন* ২০০৯-এর ধারা ১৯-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন তার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণে ২০১০ সালে *নির্বাচন কমিশন (কার্যপ্রণালি) বিধিমালা ২০১০* প্রণয়ন করে। এ বিধিমালা অনুযায়ী কমিশন সভায় উপস্থাপিত বিষয়ে যতদূর সম্ভব সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোনো মতদ্বৈততা দেখা দিলে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে বিষয়টি নিষ্পত্তি করবে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইনের ধারা ৫(১) অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ প্রধান নির্বাচন কমিশনারের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। অধিকন্তু, ধারা ৫(৩) এ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের দায়িত্ব বণ্টনও প্রধান নির্বাচন কমিশনারের ওপর ন্যাস্ত করা হয়েছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের এ ধরনের ক্ষমতা থাকার কারণে গত ১৫ বছরে প্রধান নির্বাচন কমিশনার, সচিব এবং অন্য কমিশনারদের মধ্যে এক ধরনের টানাপোড়েন দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কমিশন সভার আলোচ্যসূচি অন্য কমিশনারদের সঙ্গে আলোচনা না করে নির্ধারণ করতেন।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একটি যৌথ সত্তা। বিদ্যমান আইনে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের আধিপত্য থাকায় কমিশন সমন্বিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। অধিকন্তু, নির্বাচন কমিশনের কার্যপদ্ধতিতে স্বচ্ছতা না থাকায় নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচনের প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট হয়ে যায়। তাই আমরা নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ সংশোধন করে কমিশনকে একটি যৌথ সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার লক্ষ্যে নিম্নের সুপারিশ করছি।

সুপারিশ

১. একটি যৌথ সত্তা হিসেবে দৈনন্দিন রুটিন কার্যক্রম ব্যতীত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলিসহ নির্বাচন কমিশনের সকল সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে বা সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে কমিশনের সভায় গৃহীত হওয়ার বিধান করা।

২. নির্বাচন-সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম কমিশনের যৌথ সিদ্ধান্তে পরিচালিত করার বিধান করা।

২. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা

জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও, স্বাধীন বাংলাদেশে একটি কার্যকর নির্বাচনি ব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক শাসন কায়েমে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। বস্তুত বিচ্যুতির পরিমাণ এবং মাত্রাগত পার্থক্য থাকলেও স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত দলীয় সরকারের অধীনে একটি নির্বাচনও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। তাই বাংলাদেশে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক, গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রস্তাব বেশ অভিনব হলেও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সেটা বেশ কার্যকরী ছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হওয়া নির্বাচনগুলো সম্পর্কে পরাজিত দলগুলো নির্বাচনের মান নিয়ে বাগাড়ম্বরপূর্ণ কিছু রাজনৈতিক বক্তব্য দিলেও দেশ-বিদেশে সেসব নির্বাচন কমবেশি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

জনগণের প্রত্যাশার বিপরীতে গিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করার সময়ই এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল তৎকালীন সরকার নির্বাচনব্যবস্থাকে পুরোপুরি নিজের কব্জায় এনে ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত করতে চাইছে। পরবর্তী তিনটি চরম কারসাজিপূর্ণ নির্বাচন বাংলাদেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে কার্যত ধ্বংস করে ফেলেছে। তাই ভবিষ্যতে রাষ্ট্র এবং জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য দেশের নির্বাচন ব্যবস্থাকে জনগণের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতেই হবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে এবং বাতিলের পরে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে আমাদের অভিজ্ঞতা মোটেও সুখকর নয়। বিশেষত সুখকর ছিল না যে অসাংবিধানিক প্রক্রিয়ায়, জালিয়াতির মাধ্যমে এবং একতরফাভাবে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা হয়েছে।[২৪] বিশেষ করে বিগত তিনটি নির্বাচনের অভিজ্ঞতা ছিল খুবই তিক্ত। এটাও প্রমাণিত হয়েছে কাগজে-কলমে নির্বাচন কমিশনের যতই স্বাধীনতা কিংবা ক্ষমতা থাকুক না কেন, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তারা দলীয় সরকারের অধীনে কোনোভাবেই একটি সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে পারবে না। এর মূল কারণ হলো সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন মূলত রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বিষয়, যদিও নির্বাচন কমিশনের সায় না থাকলে বিতর্কিত নির্বাচন করে সরকারের পক্ষে পার পেয়ে যাওয়া দুরুহ। কারণ নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে না পারলেও তারা জালিয়াতির নির্বাচন বন্ধ করতে পারে, যদি তারা তা করতে চায়। সঙ্গত কারণেই সাম্প্রতিককালের আমাদের রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা বহুলাংশে নিবদ্ধ ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহালের বিষয়ে।

আনন্দের কথা যে, গত জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ হাইকোর্টের বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশিষ রায় সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীকে – যে সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে বাতিল করা হয় – অসাংবিধানিক ঘোষণা করেছেন। হাইকোর্টের রায়টি সম্ভববত আপিল বিভাগে যাবে। এছাড়াও সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে বর্তমানে বিচারপতি খায়রুল হকের ২০১২ সালে দেওয়া ত্রয়োদশ সংশোধনী সংক্রান্ত আপিল বিভাগের বিভক্ত রায়টি, যে রায়টির মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হয়, রিভিউয়ের পর্যায়ে রয়েছে। আমরা আশা করি যে আদালতের রায়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা আবার ফিরে আসবে। কমিশনের সঙ্গে মতবিনিময় কালে অংশীজনরাও এ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করছেন। তাদের অনেকেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে সংবিধানে স্থায়ী রূপ দেওয়া, এ ব্যবস্থায় বিচারপতিদেরকে না রাখার এবং এর মেয়াদ কিছুটা বাড়িয়ে এর অধীনে জাতীয় ও স্থানীয় সব নির্বাচন আয়োজন করার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন থেকে যায়, কী ধরনের ও কী পদ্ধতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফিরে আসবে? এ প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আগের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় ভয়াবহ ত্রুটি ছিলো এবং এ ত্রুটির কারণে আমাদের বিচারব্যবস্থা চরম দলীয়করণের শিকার হয়েছে এবং অনেকটা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে। এমন দলীয়করণের কারণে বাংলাদেশের সাবেক প্রধান বিচারপতি এম রুহুল আমিনের মতে আমাদের বিচারালয়ে এক মহাপ্রলয় ঘটে গিয়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে ভবিষ্যতের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা নিয়ে আমাদেরকে একটি রাজনৈতিক বন্দোবস্তে পৌঁছতে হবে। এ জন্য ভবিষ্যতে প্রয়োজন হবে সকল রাজনৈতিক দল, বিশেষজ্ঞ, নাগরিক সমাজ ও সমাজের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা, যে কমিটির দায়িত্ব হবে জনগণের মতামত, আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা এবং নিজেদের সর্বোচ্চ বিবেচনাশক্তি ব্যবহার করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার একটি রূপরেখা প্রণয়ন করা।

আমরা নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের পক্ষ ভবিষ্যতের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের কিছু সুপারিশ নিম্নে তুলে ধরছি।

সুপারিশ

১. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার মেয়াদ চার মাস নির্ধারিত করা এবং এর মেয়াদকালে জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচন সম্পন্ন করা।

২. তত্ত্বাবাধায়ক সরকারের পক্ষে সরকার পরিচালনায় রুটিন কার্যক্রমের বাইরেও সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি-বিধানের সংস্কার এবং প্রশাসনিক রদবদলের ক্ষমতা প্রদানের বিধান করা।

৩. স্থায়ী জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিলের পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের নাম চূড়ান্ত করা এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানসহ অন্য ২০ জন উপদেষ্টাকে নিয়োগ দেওয়া।

৪. সংবিধান সংশোধন কমিশন প্রদত্ত স্থায়ী জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিলের সুপারিশ গৃহীত না হলে, সকল রাজনৈতিক দল, বিশেষজ্ঞ, নাগরিক সমাজ ও সমাজের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠনের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটি রূপরেখা প্রণয়ন করা এবং ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক তা বাস্তবায়ন করা।

---

[২৪] দেখুন বদিউল আলম মজুমদার, *তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলের রাজনীতি* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০২৩)।

৩. রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

রাষ্ট্রপতি একটি রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৮(২) অনুচ্ছেদে বলা আছে, রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সব ব্যক্তির ঊর্ধ্বে স্থান লাভ করবেন। তাই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। তবে বাংলাদেশের সাংবিধানিক স্কিমে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। বাংলাদেশের সংবিধানে ৪৮(৩) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতিকে শুধু দুটি কাজ স্বাধীনভাবে করার ক্ষমতা দিয়েছে: প্রধান বিচারপতি নিয়োগ এবং প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ। এছাড়া অন্য সব বিষয়েই রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শের ওপর নির্ভর করতে হয়। তাই বাংলাদেশের বর্তমান সাংবিধানিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি বলতে গেলে ক্ষমতাহীন ঠুঁটো জগন্নাথ। সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের ভাষায়, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির মিলাদ পড়া আর কবর জিয়ারত ছাড়া অন্য কোনো কাজ নেই। বস্তুত বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীই হলেন সর্বেসর্বা এবং আমাদের দেশে সরকার পরিচালিত হয় প্রধানমন্ত্রীশাসিত ব্যবস্থায়। আর প্রধানমন্ত্রীশাসিত এ ব্যবস্থা থেকে উৎসারিত অপরিসীম ক্ষমতাই শেখ হাসিনাকে চরম স্বৈরাচারী হওয়ার একটি বড় কারণ। তাই বহু দিন থেকেই চিন্তাশীল নাগরিকদের পক্ষ থেকে আমাদের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতার ভারসাম্যের দাবি উঠেছে।

বাংলাদেশের অতীতের রাষ্ট্রপতিগণ

কীভাবে বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার একটি ইতিহাস আছে। গত ৫৩ বছরের পথ পরিক্রমায় বাংলাদেশ নির্বাচন পদ্ধতি ও ক্ষমতার ব্যাপ্তির দিক থেকে বিভিন্ন রকম রাষ্ট্রপতি দেখেছে। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার অর্থাৎ প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ছিল রাষ্ট্রপতিশাসিত, যেখানে শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করা হয় এবং তাঁর অবর্তমানে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। ১৯৭৩ সালের সংসদ নির্বাচন হবার আগ পর্যন্ত বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতিশাসিত ব্যবস্থা চালু ছিল এবং শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭৩ সালের সংসদ নির্বাচনের পর সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ একটি সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নির্বাহীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর ১৯৭৫ সালে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আবার রাষ্ট্রপতি হন শেখ মুজিবুর রহমান এবং রাষ্ট্রপতি পদে প্রধানমন্ত্রীর পদের ক্ষমতাও সংযোজিত হয়। একদলীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠান সাংবিধানিকভাবে একজন ব্যক্তির কর্তৃত্বে চলে যায়। রাষ্ট্রপতিশাসিত ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন এবং 'চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্স' ব্যবস্তা ভেঙে পড়ে। এরপর ১৯৯১ সালে সংবিধানের ১২তম সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় পদ্ধতি আবার ফিরে আসে। এই সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা এবার প্রধানমন্ত্রীর পদে যুক্ত করা হয় এবং বাংলাদেশে এক ধরনের 'ইম্পেরিয়াল প্রিমিয়ারশিপ' বা রাজকীয় প্রধানমন্ত্রীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত তিনবার সরাসরি জনগণের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথমবার ১৯৭৮ সালে, দ্বিতীয়বার ১৯৮১ সালে, তৃতীয়বার ১৯৮৬ সালে। ১৯৯১ সালে পরোক্ষ ভোটে অর্থাৎ সংসদ সদস্যগণের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিধান চালু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত সাতবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরমধ্যে মাত্র একবার রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনে একাধিক প্রার্থী থাকায় সংসদে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৯১ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তৎকালীন ক্ষমতাসীন বিএনপি আব্দুর রহমান বিশ্বাসকে রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন দিয়েছিল। আর ওই সময়ে বিরোধী দল আওয়ামী লীগ প্রার্থী করেছিল বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীকে। ওই নির্বাচনে আব্দুর রহমান বিশ্বাস বিজয়ী হন। এছাড়া প্রত্যেকবার একক প্রার্থী হিসেবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন, ফলে সংসদে ভোটগ্রহণের প্রয়োজন পড়েনি।

একনজরে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনসমূহ

	নির্বাচনের বছর	নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ	ব্যবস্থা	নির্বাচনের ধরন	নির্বাচিত প্রার্থী
প্রথম	১৯৭৪	২৪ জানুয়ারি ১৯৭৪	সংসদীয় ব্যবস্থা	গোপন ব্যালটের মাধ্যমে অপ্রত্যক্ষ নির্বাচন	মোহাম্মদ মোহাম্মদউল্লাহ
দ্বিতীয়	১৯৭৮	৩ জুন ১৯৭৮	সামরিক সমর্থিত রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা	প্রত্যেক্ষ নির্বাচন, জনগণের ভোটের মাধ্যমে	জেনারেল জিয়াউর রহমান
তৃতীয়	১৯৮১	১৫ নভেম্বর ১৯৮১	রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি	প্রত্যক্ষ নির্বাচন, জনগণের ভোটের মাধ্যমে	আবদুস সাত্তার

	নির্বাচনের বছর	নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ	ব্যবস্থা	নির্বাচনের ধরন	নির্বাচিত প্রার্থী
চতুর্থ	১৯৮৬	১৫ অক্টোবর ১৯৮৬	সামরিক সমর্থিত রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি	প্রত্যক্ষ নির্বাচন, জনগণের ভোটের মাধ্যমে	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ
পঞ্চম	১৯৯১	৮ অক্টোবর ১৯৯১	সংসদীয় ব্যবস্থা	সংসদ সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে পরোক্ষ নির্বাচন	আবদুর রহমান বিশ্বাস
ষষ্ঠ	১৯৯৬	২২ আগস্ট ১৯৯৬	সংসদীয় ব্যবস্থা	পরোক্ষ নির্বাচন, সংসদ সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে	শাহাবুদ্দীন আহমেদ
সপ্তম	২০০১	১৪ নভেম্বর ২০০১	সংসদীয় ব্যবস্থা	পরোক্ষ নির্বাচন, সংসদ সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে	এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী
অষ্টম	২০০২	১৬ সেপ্টেম্বর ২০০২	সংসদীয় ব্যবস্থা	পরোক্ষ নির্বাচন, সংসদ সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে	ইয়াজউদ্দিন আহমেদ
নবম	২০০৯	১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৯	সংসদীয় ব্যবস্থা	পরোক্ষ নির্বাচন, সংসদ সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে	জিল্লুর রহমান
দশম	২০১৩	২২ এপ্রিল ২০১৩	সংসদীয় ব্যবস্থা	পরোক্ষ নির্বাচন, সংসদ সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে	আবদুল হামিদ
একাদশ	২০১৮	১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	সংসদীয় ব্যবস্থা	পরোক্ষ নির্বাচন, সংসদ সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে	আব্দুল হামিদ
দ্বাদশ	২০২৩	১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩	সংসদীয় ব্যবস্থা	পরোক্ষ নির্বাচন, সংসদ সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে	মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন; ২. নেসার আমিন, *বাংলাদেশের নির্বাচনি ব্যবস্থা ও ফলাফল*, (ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০২৩)

প্রধানমন্ত্রীর একনায়কতন্ত্র

সংবিধানের ৪৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন সংসদ সদস্যদের দ্বারা। এ নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। সংসদে কোনো দলের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেই তাদের প্রস্তাবিত ব্যক্তির রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়া অবধারিত। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের কারণে ক্ষমতাসীন দলের কোনো সদস্য রাষ্ট্রপতি পদে দলের মনোনীত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারেন না। অর্থাৎ সংসদ নেতা ও দলীয় প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী তথা একজন ব্যক্তির ইচ্ছার ওপরেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়া সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে।

১৯৯১ সাল থেকে রাষ্ট্রপতিগণ কার্যত নির্বাহী ক্ষমতাবিহীন রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে ওঠেন। তখন থেকেই প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্যহীনতা নিয়ে আলোচনা চলছে এবং বাংলাদেশের শাসন কাঠামোর আলোচনার ক্ষেত্রে এটা সবচেয়ে বেশি চর্চিত একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মূল কারণ হলো একদিকে সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে অত্যন্ত নগণ্য ক্ষমতা দিয়েছে, অপরদিকে যে প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান ব্যবস্থায় একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন সেটাও এই পদটিকে অন্তর্নিহিতভাবে দুর্বল করে রেখেছে। যেহেতু রাষ্ট্রপতি সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন, রাষ্ট্রপতি কে হবেন এটা প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায়ের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় সব ক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রী ও ক্ষমতাসীন দলের প্রধান এবং সংসদ নেতা একই ব্যক্তি হওয়ার কারণে দলের অনুগত সদস্য বা প্রধানমন্ত্রীর খয়েরখারাই রাষ্ট্রপতি হয়ে যান। তাই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দলীয় সম্পৃক্ততা ব্যতীত প্রার্থীদের দক্ষতা, কর্ম অভিজ্ঞতা ও সততার বিষয়গুলো ক্রমান্বয়ে অগুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই কারণে একজন রাষ্ট্রপ্রধানের যে ধরনের ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতা থাকা দরকার সেটি এখন আর দেখা যায় না।

তবে এসব সত্ত্বেও অতীতে বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের মতো অত্যন্ত মর্যাদাবান ও নির্দলীয় ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগ দেওয়ার বিরল ঘটনা ঘটেছে। ১৯৯৬ সালে তৎকালীন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সাবেক বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য মনোনীত করে, যা ছিল একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। দলের বাইরে থেকে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একজন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত করার এই সিদ্ধান্ত সবার প্রশংসা অর্জন করে। এতে এক ধরনের 'চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্স' প্রতিষ্ঠা করে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার অপপ্রয়োগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তাই পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্কে টানাপোড়েনে সৃষ্টি হয়। এ কারণে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর সহযোগীদেরকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের বিরুদ্ধে বিষোদাগার করতে দেখা গেছে। আরও নাটকীয় ঘটনা অবশ্য ঘটেছে পরবর্তী রাষ্টপতি ডা. বদরুদ্দোজ চৌধুরীর ক্ষেত্রে। রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে 'দলের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে' অবস্থান নেওয়ার অভিযোগে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়। এসব অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য অনেক বিতর্কিত ব্যক্তি দলের মনোনয়ন পেয়েছেন, যাঁদের দলের প্রতি, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আনুগত্য ছির প্রশ্নাতীত।

সাম্প্রতিককালে রাষ্ট্রপতি জনাব মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিনের নিয়োগ নিয়ে প্রবল বিতর্ক ওঠেছে। রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ লাভের পূর্বে তিনি দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার ছিলেন। *দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪*-এর ৯ ধারায় বলা আছে যে, একজন প্রাক্তন কমিশনার প্রজাতন্ত্রের কোনো লাভজনক পদে নিয়োগ পাওয়ার যোগ্য নন। কিন্তু আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে তাঁকে রাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে উচ্চ আদালতের ২০০৭ সালের *রুহুল কুদ্দুস বনাম বিচারপতি আজিজ* মামলার রায়েকে উপক্ষো করা হয়েছে।[২৫] এমনি প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী এম এ আজিজ খান হাইকোর্টে রাষ্ট্রপতি পদে জনাব সাহাবুদ্দিনের নিয়োগের বৈধতা নিয়ে একটি রিট আবেদন করেন, যদিও আদালত তা খারিজ করে দেন। এরপর অ্যাডভোকেট আজিজ খান আপিল বিভাগে 'লিভ টু আপিল' দায়ের করলে, আদালত শুধু তা খারিজই করে দেননি, অ্যাডভোকেট খানকে এক লাখ টাকা জরিমানাও করেন।[২৬] গত ৫ আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের পর বাদী সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আবেদন করেছেন, যা শুনানির অপেক্ষায় আছে।

এছাড়াও বর্তমান রাষ্ট্রপতির নিয়োগ আরও কিছু বিষয় বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। অভিযোগ রয়েছে যে, জনাব সাহাবুদ্দিনের মাধ্যমে মহা দুর্নীতি এবং টাকা পাচারের দায়ে অভিযুক্ত এস আলম গ্রুপ ইসলামী ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন[২৭] এবং হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাট করেছেন। এ ধরনের গুরুতর অভিযোগ ও বিতর্ক সত্ত্বেও জনাব সাহাবুদ্দিনের রাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগ লাভ একটি চরম কলংকজনক ঘটনা এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বেচ্চাচারিতামূলক আচরণেরই নগ্ন প্রতিফলন।

অংশীজনের প্রস্তাবনা

অংশীজনের সঙ্গে মতবিনিময়কালে আমরা লক্ষ করেছি যে, আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিনকে নিয়ে জনগণের মনে ব্যাপক অসন্তোষ বিরাজ করছে। তারা তাঁর অপসারণ চান এবং পরিবর্তে একজন সৎ, যোগ্য ও সুনামসম্পন্ন ব্যক্তিকে সরাসরিভাবে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত করতে চান। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের পক্ষে ৪৬ হাজারের বেশি খানার অংশগ্রহণে বিবিএস পরিচালিত এক জরিপ থেকে দেখা যায় যে, ৮২ শতাংশ উত্তরদাতা সরাসরি ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পক্ষে মত দিয়েছেন। তবে এ পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের একটি জটিলতা হলো যে, সাধারণত যে ব্যক্তি যত বেশি মানুষের সম্মতিতে তথা ভোটে পদাধিকারী হন, তিনি তত বেশি ক্ষমতাবান হন। প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন পরোক্ষভাবে, নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের ভোটে। অর্থাৎ সংসদ সদস্যগণ চাইলে অপেক্ষাকৃত সহজে বিদ্যমান প্রধানমন্ত্রীর স্থলে নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করতে পারেন। তাই আমাদের দেশের বিদ্যমান সংসদীয় পদ্ধতির গণতন্ত্রে সরাসরি ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হতে পারে। তবে জনগণের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের এবং আরও যোগ্য ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগের লক্ষ্যে আরও বড় নির্বাচকমণ্ডলী আবশ্যক। এছাড়াও আমাদের দুঃখজনক অভিজ্ঞতার আলোকে দল নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের মধ্য থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করার বিষয়টি বিবেচনার দাবি রাখে।

এছাড়া দেশের সকল নাগরিকের সরাসরি ভোটের পরিবর্তে এবং শুধু সংসদ সদস্যদের ভোটের বিপরীতে, অপেক্ষাকৃত বড় নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে পারেন। এর একটি বড় দৃষ্টান্ত রয়েছে আমাদের প্রতিবেশী ভারতে। ভারতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংসদের দুই কক্ষ এবং প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত একটি ইলেক্টোরাল কলেজ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে। বাংলাদেশ যেহেতু ফেডারেল রাষ্ট্র নয়, তাই মাত্র ৩০০ জন সংসদ সদস্যের পরিবর্তে, সংসদের দুই কক্ষের সদস্যগণ এবং সকল ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি করপোরেশনের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, অর্থাৎ একটি বৃহত্তর নির্বাচকমণ্ডলী, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ইলেক্টোরাল কলেজের সদস্য করা যেতে পারে।

সুপারিশ

১. রাজনৈতিক দলসমূহের কেবল দলনিরপেক্ষ, সৎ, যোগ্য ও সুনামসম্পন্ন ব্যক্তিদের রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেওয়ার বিধান করা, যাতে একজন নির্দলীয় ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হতে পারেন।

২. জাতীয় সংসদের উভয় কক্ষের সদস্য এবং স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত বৃহত্তর নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার বিধান করা।

---

[২৫] Badiul Alam Majumdar, 'Does President Hold Office of Profit?' *New Age,* March 03, 2023.
[২৬] Advocate M. A. Aziz Khan vs The Election Commission of Bangladesh and others, Petition no. 3185
[২৭] 'Curious Case of Chittagong Connection, ' *The Daily Star*, June 14, 2017

৪. জাতীয় সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন

বর্তমানে বাংলাদেশে একটি এক-কক্ষ বিশিষ্ট সংসদীয় পদ্ধতি বিরাজমান। অনেক অংশীজনের মতে, এই এককেন্দ্রিকতাই আমাদের দেশে কর্তৃত্ববাদী স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য মূলত দায়ী। রাষ্ট্র পরিচালনায় অধিকতর 'চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্স' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পুনরুত্থান রোধকল্পে রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য অংশীজনের কাছ থেকে আমাদের দেশে একটি দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি উঠেছে। এ দাবির পেছনে আরেকটি যুক্তি হলো এর মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনায় সমাজের সর্বস্তরের জনগণের সম্পৃক্ততার সুযোগ হবে। আমাদের গত কয়েকটি সংসদের সদস্যদের প্রোফাইলের দিকে তাকালে কারোই সন্দেহ থাকার কথা নয় যে, আমাদের জাতীয় সংসদ ক্রমান্বয়ে ব্যবসায়ীদের ক্লাবে এবং অনেকটা দূর্বত্তদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। ফলে এটি তার জনপ্রতিনিধিত্বশীলতার চরিত্র বহুলাংশে হারিয়েছে। তাই সর্বস্তরের জনগণের প্রতিনিধিদের নিয়ে সংসদের উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা রয়েছে। প্রসঙ্গত, আমাদের দেশে সংসদের উচ্চকক্ষ স্থাপনের ব্যাপারে মোটামুটিভাবে একটি রাজনৈতিক ঐকমত্য বিরাজ করছে।

এমনকি আমাদের থেকে অপেক্ষাকৃত উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিরাজ করে সে সব দেশেও সংসদের উচ্চকক্ষ থাকার গুরুত্বপূর্ণ যৌক্তিকতা রয়েছে। সংসদের নিম্নকক্ষ দ্রুততা ও হঠকারিতামূলক আচরণের মাধ্যমে অবিবেচনামূলক আইন প্রণয়ন করতে পারে। তারা আবেগ, স্বেচ্ছাচারিতা ও দলীয় স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হতে পারে। এমন আচরণের পেক্ষাপটে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে গঠিত সংসদের উচ্চকক্ষ আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অতি প্রয়োজনীয় ভারসাম্য সৃষ্টি করতে পারে। ফলে উচ্চকক্ষ যেমন জনস্বার্থ বিরোধী কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না, আবার তেমনিভাবে নিম্নকক্ষও কোনো অপরিপক্ক সিদ্ধান্ত নিলে উচ্চকক্ষ সেটা পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ পাবে।

বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়ান ফেডারেশন, ফ্রান্স, জার্মানি ও অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট সংসদ রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার ভারসাম্য টিকিয়ে রাখা ও নজরদারিত্বের কাঠামো জোরদার করার জন্য দেশটির প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকেই সিনেট ও হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ (প্রতিনিধি পরিষদ) নামে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট সংসদীয় কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যুক্তরাজ্যেও দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট সংসদ কার্যকর, যা হাউজ অব লর্ডস ও হাউজ অব কমন্স নামে পরিচিত। এছাড়াও রাশিয়ায় ফেডারেশন কাউন্সিল ও স্টেট ডুমা, ফ্রান্সে সিনেট ও ন্যাশনাল এসেম্বলি, জার্মানিতে ফেডারেল কাউন্সিল ও ফেডারেল ডায়েট এবং অস্ট্রেলিয়ায় সিনেট ও হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ নামে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট সংসদ বিদ্যমান।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ, মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কা ছাড়া অন্যান্য দেশে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট সংসদ রয়েছে। বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে রাজ্যসভা (কাউন্সিল অব স্টেটস) ও লোকসভা (কাউন্সিল অব দ্য পিপল) নামে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট সংসদ রয়েছে। বাংলাদেশের আরেক প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারেও ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি ও পিপলস অ্যাসেম্বলি নামে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট সংসদ বিরাজমান। এছাড়া পাকিস্তানে সিনেট ও ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি, ভুটানে ন্যাশনাল কাউন্সিল ও ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি, নেপালে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি ও হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভস নামে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট সংসদ রয়েছে।

আফ্রিকা মহাদেশের মিশর, সুদান, ইথিওপিয়া, দক্ষিণ সুদান ইত্যাদি দেশগুলোতেও দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট সংসদ রয়েছে। মিশরে মজলিসে শুরা ও মজলিসে সা'ব, সুদানে ন্যাশনাল লেজিসলেচার ও কাউন্সিল অব স্টেটস, ইথিওপিয়ায় হাউজ অব ফেডারেশন ও হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং দক্ষিণ সুদানে ন্যাশনাল লেজিসলেচার ও কাউন্সিল অব স্টেটস নামে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট সংসদ রয়েছে।

আমরা নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে সংসদের উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবের সঙ্গে একমত। তবে এটি সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনেক জটিলতা রয়েছে। যেমন, এর সদস্য সংখ্যা কত হবে, কোন পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষের সদস্যরা নির্বাচিত হবেন, দুই কক্ষের মধ্যে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় কেমন বিভাজন বিরাজ করবে– সে ব্যাপারে আমাদের সমাজে দৃশ্যমান কোনো ঐকমত্য নেই। বস্তুত সংসদের উচ্চকক্ষের ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতার ঝুঁলি সম্পূর্ণ শূন্য।

দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট সংসদীয় ব্যবস্থায় দুই কক্ষের নির্বাচন সাধারণত দুটি ভিন্ন (non-congruent) পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। যেহেতু আমাদের জাতীয় সংসদের নিম্নকক্ষের নির্বাচন সহজ সংখ্যাধিক্য পদ্ধতিতে (এফপিটিপি) পরিচালিত হয় এবং তা অব্যাহত থাকার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে, তাই সংসদের উচ্চকক্ষের সদস্যদের নির্বাচন প্রকাশ্য তালিকা (open list) ব্যবহার করে সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে হওয়াই যৌক্তিক হবে। এই পদ্ধতিতে ৩০ শতাংশ আসন নির্দলীয় নারীদের জন্য এবং ২০ শতাংশ আসন সমাজের সর্বক্ষেত্রের যেমন, সংখ্যালঘু, শ্রমিক, সাংস্কৃতিক কর্মী, নাগরিক সমাজের – নির্দলীয় প্রতিনিধির জন্য রাখা যেতে পারে।

সুপারিশ

- সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতিতে ১০০ আসনবিশিষ্ট সংসদের উচ্চকক্ষ স্থাপন করা।
- প্রত্যেক দলের প্রাপ্ত আসনের ৫০ শতাংশ দলের সদস্যদের মধ্য থেকে এবং অবশিষ্ট ৫০ শতাংশ আসন নির্দলীয় ভিত্তিতে নাগরিক সমাজ, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, মানবসেবা প্রদানকারী, শ্রমজীবীদের প্রতিনিধি, উন্নয়নকর্মী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ইত্যাদির মধ্য থেকে সংখ্যানুপাতিক হারে নির্বাচিত করার বিধান করা।
- দলীয় ও নির্দলীয় সদস্যদের মধ্যে কমপক্ষে ৩০ শতাংশ নারীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা।
- দলীয় ও নির্দলীয় সদস্যদের মধ্যে কমপক্ষে ১০ শতাংশ ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত রাখা।
- সংসদের উচ্চকক্ষে অপেক্ষকৃত ছোট দলগুলোর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নকক্ষের নির্বাচনে ন্যূনতম ৩ শতাংশ ভোট প্রাপ্তির মানদণ্ড নির্ধারণ করা।
- সংসদের উচ্চকক্ষের সদস্যদের বয়স ন্যূনতম ৩৫ বছর এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে স্নাতক নির্ধারণ করা।
- সংসদের উচ্চকক্ষের সদস্যদের অন্যান্য যোগ্যতা-অযোগ্যতা নিম্নকক্ষের অনুরূপ করা।
- উচ্চকক্ষের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য বিষয়াদি আইনের দ্বারা নির্ধারণ করা।
- সংসদের উচ্চকক্ষে বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকারের পদ দেওয়া।

৫. সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ

নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ (Electoral constituency delimitation) নির্বাচনি প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। বিশ্বাসযোগ্য সীমানা নির্ধারণ অবাধ, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন আয়োজনের জন্য অপরিহার্য। বিশ্বাসযোগ্য সীমানা নির্ধারণের মাধ্যমে নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ করার পথ প্রশস্ত হয়। অন্যদিকে সীমানা নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় পক্ষপাতিত্ব বা জালিয়াতির (gerrymandering) আশ্রয় নিয়ে পৃথিবীতে অসংখ্য নির্বাচনের ফলাফল পরিবর্তনের উদাহরণ আছে, যা নানা জটিলতার সৃষ্টি করেছে। পক্ষপাতদুষ্টভাবে সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা হলে তা কেবল নির্বাচনি প্রক্রিয়ার গ্রহণযোগ্যতাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে না, বরং জনগণের আস্থাকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তাই বিশ্বাসযোগ্য প্রক্রিয়ায় সীমানা নির্ধারণ না করা হলে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

পৃথিবীর অনেক দেশের ন্যায় বাংলাদেশ সীমানা নির্ধারণের গুরুত্ব অনুধাবন করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে জাতীয় সংসদের সীমানা নির্ধারণের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া হয়েছে। এর লক্ষ্য হলো সীমানা নির্ধারণ প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ, ন্যায্য এবং নিরপেক্ষ রাখা, যেন ভোটাররা তাদের সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে ন্যায্য সুযোগ পান। তবে সীমানা নির্ধারণের কাজটি চ্যালেঞ্জিং এবং তা কার্যকর করার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। আর এটি নিশ্চিত করতে হলে প্রয়োজন যথাযথ মানদণ্ড এবং গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির কঠোর অনুসরণ। কারণ জনসংখ্যার পরিবর্তন, ভৌগোলিক অবস্থার ভিন্নতা এবং সামাজিক কাঠামোর ভারসাম্য বজায় রেখে এটি সম্পন্ন করতে হয়। সীমানা নির্ধারণের প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ না হলে তা শুধু নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে না, সামগ্রিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেও দুর্বল করে।

সীমানা নির্ধারণে অনুসরণীয় নীতিমালা (Guiding Principles)

নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কিছু অনুসরণীয় নীতিমালা রয়েছে। Commonwealth Secretariat, Venice Commission, International Foundation for Electoral System (IFES)-সহ বেশকিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সীমানা নির্ধারণ বিশেষজ্ঞ বিশ্বাসযোগ্য সীমানা নির্ধারণ প্রণয়নে এসব নীতিমালাগুলো অনুসরণের কথা বলেছেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য[২৮] হলো:

- **নিরপেক্ষতা** (Impartiality): এটি কাঙ্ক্ষিত যে, একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞতালব্ধ একটি পেশাদার সংস্থা সীমানা নির্ধারণ করবে। যেহেতু সীমানা নির্ধারণ একটি প্রায়োগিক কাজ, তাই এটি কাঙ্ক্ষিত যে, এ সকল নীতিমালা অনুসরণে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সীমানা নির্ধারণ কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। এ ধরনের স্বাধীন প্রতিষ্ঠানে অবশ্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচন কর্মকর্তা, ভূগোলবিদ, মানচিত্রকার, পরিসংখ্যানবিদ, নগর পরিকল্পনাবিদ, তথ্য-প্রযুক্তিবিদ ও জনসংখ্যাবিদ যুক্ত থাকতে হবে। যুক্তরাজ্য ও ভারতে এমন উদাহরণ বিদ্যমান।

- **প্রতিনিধিত্ব** (Representativeness): নির্বাচনি এলাকা এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে ভোটাররা তাদের সত্যিকারের প্রতিনিধিত্ব করে এমন প্রার্থীদের নির্বাচিত করার সুযোগ পান। নির্বাচনি সীমানা নির্ধারণে প্রশাসনিক সীমানা, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এবং জনগণের মতামত ও জনস্বার্থ বিবেচনায় নেওয়া আবশ্যক। একটি নির্বাচনি এলাকার নির্দিষ্ট সীমানা, গঠন, অভিগম্যতা (accessibility) ও অন্য কোনো স্থানীয় সমতার বিষয়-সহ ভৌগোলিক বিষয়সমূহ ও বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।

- **ভোটারের সমতা** (Equality of voting strength): সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকায় প্রায় সমান সংখ্যক ভোটার বা অধিবাসী রয়েছে। সমানসংখ্যক সম্ভাব্য ভোটারবিশিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় ভোটাররা তাদের প্রতিনিধি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সমান প্রভাব ফেলতে পারেন। যেসকল নির্বাচনি এলাকার মধ্যে জনসংখ্যার বিশাল ব্যবধান থাকে সেখানে সমতার মানদণ্ড ক্ষুণ্ন হয়। কারণ আদর্শিকভাবে ভোট প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক ভোটারের সম্ভাব্য সমান প্রভাব থাকা জরুরি। ভেনিস কমিশনের মতামত অনুযায়ী (২০০২), নির্ধারিত মানদণ্ড থেকে ১০ ভাগের বেশি বিচ্যুতি ঘটানো যাবে না এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে তা কোনোভাবেই ১৫ ভাগের বেশি হবে না।

- **বৈষম্যহীনতা** (Non-discrimination): বৈষম্যহীনতা নির্বাচনি সীমানা নির্ধারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। এর অর্থ হলো নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ প্রক্রিয়া অবৈধ প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হবে, যেন গোত্র, বর্ণ, ভাষা, ধর্ম বা এরূপ কোনো বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ভোটারদের মধ্যে বৈষম্যের সৃষ্টি না হয়। নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বৈষম্যহীনতা নিশ্চিত করার জন্য ভারত, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড-সহ অনেক দেশেই আইনি বিধি-বিধান রয়েছে। ভারতে প্রতিটি জেলায় তফসিলভুক্ত গোত্র ও তফসিলভুক্ত উপজাতির সংখ্যা বিবেচনায় নেওয়া হয়।

- **স্বচ্ছতা** (Transparency): স্বচ্ছতা নির্বাচনি সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। এর অর্থ হলো, প্রক্রিয়াটি জনগণের নিকট যতদূর সম্ভব স্বচ্ছ ও অভিগমনযোগ্য হতে হবে। নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হলে অংশীজনদের পক্ষে প্রক্রিয়াটি, এমনকি এর ফলাফল মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়, যা জনসমর্থনের জন্য অপরিহার্য। এ প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে পরামর্শ গ্রহণ ও গণশুনানি অংশীজনদের অভিযোগ সমাধান করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

---

[২৮] মো. আব্দুল আলীম (২০১৩), সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ পত্র, ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ।

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা

সীমানা নির্ধারণের কাজটি প্রধানত তিন ধরনের প্রতিষ্ঠান করে থাকে: (১) নির্বাচন কমিশন (২) আইনসভা (legislature) এবং (৩) স্বতন্ত্র সীমানা নির্ধারণ কর্তৃপক্ষ বা কমিশন। আইনসভা বা নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে সীমানা নির্ধারণ একটি পুরানো ধারণা। তাই অনেক দেশে যেখানে এখনও নির্বাচন কমিশন কিংবা আইনসভা সীমানা নির্ধারণ করে থাকে, সেসব দেশে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সীমানা নির্ধারণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ দায়িত্ব উক্ত প্রতিষ্ঠানের হাতে অর্পণ করা হচ্ছে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় ৬০% দেশে স্বতন্ত্র সীমানা নির্ধারণ কর্তৃপক্ষ এ দায়িত্ব পালন করে। ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ভুটান, কানাডা, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, আলবেনিয়া, বতসোয়ানা, ইত্যাদি যার উদাহরণ। বুলগেরিয়া, বেলজিয়াম, ক্রোয়েশিয়া, ফিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, সুইডেন প্রভৃতি দেশে আইনসভা সীমানা নির্ধারণ করে থাকে। পক্ষান্তরে, পাকিস্তান, কেনিয়া, নাইজেরিয়া, তাঞ্জানিয়ার মত দেশে নির্বাচন কমিশন এ দায়িত্ব পালন করে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ব্যতীত সার্কভুক্ত দেশসমূহে নির্বাচন কমিশনের পরিবর্তে স্বতন্ত্র সীমানা নির্ধারণ কর্তৃপক্ষ বা কমিশন সীমানা নির্ধারণের কাজ করে।

পৃথিবীর অনেক দেশের ন্যায় যুক্তরাজ্যে নির্বাচন কমিশনের পরিবর্তে Boundary Commission এ কাজের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। England, Scotland, Wales and Northern Ireland-এর জন্য চারটি আলাদা Boundary Commission রয়েছে। প্রতিটি কমিশন একজন চেয়ারম্যান, একজন ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং দুজন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত। প্রতি ৮ বছর পর পর যুক্তরাজ্যে সীমানা নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণের কাজ করা হয়। সংরক্ষিত এলাকা (protected constituency) ব্যতীত আন্তর্জাতিক অনুসরণীয় নীতিমালা অনুযায়ী দেশটির প্রতিটি নির্বাচনি এলাকার আয়তন ১৩ হাজার বর্গ কিলোমিটার। যে কোনো নির্বাচনি এলাকার ভোটার সংখ্যা অবশ্যই যুক্তরাজ্যের নির্বাচনি কোটার (UK electoral quota) ৯৫ শতাংশের কম এবং সেই কোটার ১০৫ শতাংশের বেশি হয় না। ভারতও কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া +/- ১০ শতাংশ রেঞ্জ অনুসরণ করে।[২৯]

স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে যুক্তরাজ্যে আইন অনুযায়ী Boundary Commission দুই ধাপে মতামত ও পরামর্শ গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রথম ধাপে কমিশন একটি খসড়া প্রস্তাব প্রস্তুত করে যা প্রস্তাবিত প্রতিটি নির্বাচনি এলাকার নির্দিষ্ট একটি স্থানে মতামতের জন্য উন্মুক্ত থাকে, একইসঙ্গে তা ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করা হয়। এটাকে বলা হয় 'প্রাথমিক কনসালটেশন' এবং এ সময়ের মধ্যে প্রস্তাব সম্পর্কে কমিশনের নিকট লিখিত মতামত প্রদান করা যায়। কমিশন প্রাথমিক কনসালটেশনে প্রাপ্ত মতামতসমূহ পর্যালোচনা করে, অতঃপর দ্বিতীয় ধাপের কনসালটেশনের দিকে এগিয়ে যায়। নির্বাচনি এলাকা পর্যায়ে পরামর্শসভারও আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারণ আইন ও এর সীমাবদ্ধতা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৫(২) অনুচ্ছেদে ৩০০ সংসদ সদস্যকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত করার লক্ষ্যে সমগ্র দেশকে উক্ত সংখ্যক একক আঞ্চলিক নির্বাচনি এলাকায় বিভক্ত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, সংবিধানের ১১৯(১)(গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণের জন্য দায়িত্বপাপ্ত। ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত সীমানা দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৬ সালের শুরুতে তৎকালীন সরকার সর্বপ্রথম The Delimitation of Constituencies Ordinance, 1976 নামে একটি আইন প্রণয়ন করে। ১৯৭৬ সালের আইনের আওতায় সীমানা নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ করে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২০২১ সালে উক্ত আইনটি রহিতপূর্বক *জাতীয় সংসদের নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন*, ২০২১ নামে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়, যা ছিলো মূলত আগের অধ্যাদেশটির বাংলা অনুবাদ।

১৯৭৬ সালের আইনটি যখন প্রণয়ন করা হয় তখন সীমানা নির্ধারণ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক অনুসরণীয় নীতিমালা ছিল না। কাজেই ১৯৭৬ আইনে উক্ত নীতিমালাগুলো বিবেচনা করার সুযোগ ছিল না। কিন্তু ২০২১ সালের আইন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এতে সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত যে সকল আন্তর্জাতিক অনুসরণীয় নীতিমালাগুলো রয়েছে সেগুলোর কোনো প্রতিফলন ঘটেনি। অধিকন্তু ২০২১ সালের আইনে নির্বাচন কমিশনকে অবারিত ক্ষমতা দেওয়া হয় – এতে সীমানা নির্ধারণের বিষয়ে দেশের কোনো আদালত বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে প্রশ্ন তোলার সুযোগ রাখা হয়নি, যা ভোটারের অধিকার ক্ষুণ্ন করেছে।

আন্তর্জাতিকভাবে অনুসরণীয় নীতিমালা অনুসারে সর্বোচ্চ জনসংখ্যার আসনের সাথে সংশ্লিষ্ট আসনে গড় জনসংখ্যার কম বেশি ৫ শতাংশ পার্থক্য রেখে সীমানা নির্ধারণের মানদণ্ড থাকলেও, বাংলাদেশে এই প্রার্থক্য অনেক বেশি। উদাহরণস্বরূপ ২০০৮, ২০১৪ এবং ২০১৮ সালে ঢাকা-১৯ আসনে ভোটার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৬,০২,৩৮৬; ৬,৭৮,২৩৮ এবং ৭,৪৭,৩০১। উক্ত সালগুলোতে চট্টগ্রাম-১৬, চট্টগ্রাম-৩ এবং পিরোজপুর-৩ এর ভোটার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১,৫৩,০১৮; ১,৭৬,৮৬৭ এবং ১,৮৯,৭৬৩। ১৯৭৩ সাল থেকে অনুষ্ঠিত সকল নির্বাচনেই এ ধরনের ব্যবধান দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ ১৯৭৩ সাল থেকে অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন থেকে শুরু করে বাংলাদেশের কোনো নির্বাচনেই অনুসরণীয় নীতিমালাগুলো অনুসরণ করা হয়নি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ও ভৌগোলিক অখণ্ডতাকে প্রাধান্য দিয়ে সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে। তাই বাংলাদেশের নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইনটি

[২৯] মো. আব্দুল আলীম (২০১৪). পিএইচডি অভিসন্দর্ভ: 'Electoral Governance and Political Parties in Bangladesh,' জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ত্রুটিপূর্ণ এবং সেকেলে (outdated)। আর এ ত্রুটিপূর্ণ আইনের কারণে বাংলাদেশে বিশ্বাসযোগ্য প্রক্রিয়ায় কখনও সীমানা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। অধিকন্তু এ আইনের মাধ্যমে জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে নির্বাচনি ফলাফল পাল্টে দেওয়ার অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে এবং এতদ্বসংক্রান্ত বিষয়ে অনেকের কাছ থেকে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন অভিযোগও পেয়েছে। অনেকেই জোরালোভাবে বিদ্যমান আইন বাতিলের দাবি করেছেন।

২০০৮-২০২৩ সালের সীমানা নির্ধারণে বিতর্ক

২০০১ সালের নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে সীমানা নির্ধারণ নিয়ে বিশেষ কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যাপকভিত্তিক সীমানা পুনর্নির্ধারণের কাজ করা হয় ২০০৮ সালে। এসময় জাতিসংঘের সহায়তায় একজন আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ধারণ বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ দিয়ে একটি গবেষণা করা হয়, যদিও ওই গবেষণার সকল পরামর্শ গ্রহণ করা হয়নি। ২০০৮ সালে মূলত প্রশাসনিক অখণ্ডতা বিবেচনায় প্রাথমিকভাবে ১৩৩টি আসনে পরিবর্তন প্রস্তাব আনা হয়। এ প্রস্তাবের বিপক্ষে ৩২টি জেলার ৯৫টি আসনে ৩ হাজার ৬৯০টি লিখিত আপত্তি উত্থাপিত হয়। শুধু সাতক্ষীরা-৩ আসনেই ৯৮০টি আপত্তি জমা পড়ে। শুনানির পর ৮৪টি আসনে পরিবর্তন করে ৩০০ আসনের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়, যাতে বিভিন্ন নির্বাচনি এলাকার ভোটার সংখ্যায় অসমতা পরিলক্ষিত হয়। ২০১৪ থেকে ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত শেষ তিনটি জাতীয় নির্বাচনে মোট ১৯৮টি আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাস করা হলে নানান রাজনৈতিক বিতর্ক সৃষ্টি হয় এবং অনেকে আইনি ব্যবস্থা নেয়। ২০১৩ সালের সীমানা পুনর্নির্ধারণে বেশ কয়েকটি আসনে মন্ত্রী এবং এমপিদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের পছন্দ অনুযায়ী সীমানা নির্ধারণ করার অভিযোগ উঠে।[৩০] ২০১৮ সালের নির্বাচনে মূলত ২০১৩ সালের সীমানা অপরিবর্তিত রাখা হয়।[৩১]

২০২৪ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ২০২৩ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণের খসড়া প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনের ৩৮টি আসনের সীমানা পরিবর্তনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ১৮৬টি আপত্তি জমা পড়ে।[৩২] এই খসড়ায় সর্বশেষ জনশুমারি অনুযায়ী ৭৫টি আসনে জনসংখ্যার বড় ব্যবধান থাকলেও তা পরিবর্তনের জন্য বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। সর্বোচ্চ জনসংখ্যার আসনের সঙ্গে সর্বনিম্ন জনসংখ্যার আসনের মধ্যে সাতগুণের বেশি ব্যবধান হলেও (৮৮ শতাংশ) তা আমলে নেওয়া হয়নি। অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও শহরের আসনগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গ্রামের আসনগুলোতে জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। সীমানা পুনর্নির্ধারণে জনশুমারির প্রাথমিক প্রতিবেদনকে গুরুত্ব দেওয়া এবং বিবেচনা করা হয়নি। এছাড়া আঞ্চলিক অখণ্ডতার কথা বলা হলেও বিদ্যমান সীমানার ৩৫টি আসনে আঞ্চলিক অখণ্ডতা সংক্রান্ত অসামঞ্জস্যতা থাকলেও তা নিরসনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। পূর্বের ন্যায় এসব আসনে এক বা একাধিক ইউনিয়নকে অন্য উপজেলার সঙ্গে যুক্ত রেখেই সংসদীয় আসন ঘোষণা করা হয়েছে। সার্বিকভাবে, সীমানা পুনর্নির্ধারণের অন্যতম লক্ষ্য নির্বাচনি এলাকাসমূহের মধ্যে ভোটার সংখ্যায় সমতা আনার বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি। শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন আসনের মধ্যে জনসংখ্যার বৃহৎ পার্থক্য রেখে সীমানা প্রশাসনিক ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার দোহাই দিয়ে মাত্র ১০টি আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাস করা হয়।[৩৩] এ আসনগুলো হলো: পিরোজপুর-১ ও ২, গাজীপুর ২ ও ৫, ফরিদপুর ২ ও ৪, কুমিল্লা ১ ও ২ এবং নোয়াখালী ১ ও ২ আসন।

অভিযোগ রয়েছে যে, ২০০৮ সালে ৮৪টি আসন পুনর্বিন্যাস করার কথা বলা হলেও বাস্তবে আসন বিন্যাস হয়েছিল ১৩০টির। আসনগুলো হলো: টাঙ্গাইল-১, ৫, ৬; কিশোরগঞ্জ-১, ২; ফরিদপুর-২, ৪; শরীয়তপুর-২, ৩; মানিকগঞ্জ-১, ২; জামালপুর-২, ৩, ৪, ৫; নেত্রকোনা-২, ৫; ময়মনসিংহ-১, ২, ৩, ৪; ঢাকা-১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯; গাজীপুর-১, ২, ৩, ৫; নরসিংদী-১, ২, ৩, ৫; নারায়ণগঞ্জ-২, ৩, ৪; মুন্সীগঞ্জ-১, ২; সুনামগঞ্জ-৪, ৫; সিলেট-১, ২, ৩, ৪; মৌলভীবাজার-১, ২; ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১, ২, ৩, ৫, ৬; কুমিল্লা -১, ২, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০; চাঁদপুর-১, ২; ফেনী-১, ২, ৩; নোয়াখালী-১, ২,৩, ৪, ৫; লক্ষ্মীপুর-৪; চট্টগ্রাম-৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১৩, ১৪; কক্সবাজার-১; বরগুনা-১, ২; পটুয়াখালী-১, ২, ৩; বরিশাল-২, ৩, ৪; পিরোজপুর-২, ৩; যশোর-৩, ৪, ৫, ৬; খুলনা-১, ৪, ৬; সাতক্ষীরা-৩, ৪; রাজশাহী-২, ৩, ৪; কুড়িগ্রাম-২, ৩; বগুড়া-১, ৫, ৬, ৭; সিরাজগঞ্জ-১, ২, ৫,৬।[৩৪] এসকল আসনবিন্যাসে অনিয়ম রোধ করতে, অর্থাৎ ২০০৮ সালে করা আসনবিন্যাস সমুন্বত রাখতে বিগত নুরুল হুদা কমিশনের বিরুদ্ধে সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইনের ৮(৩) ধারায় পরিবর্তনের অভিযোগ রয়েছে।[৩৫]

সংসদীয় এলাকার অতীতের সীমানা পুনর্নির্ধারণ নিয়ে অনেক গুরুতর অনিয়মেরও অভিযোগ রয়েছে।[৩৬] উদাহরণস্বরূপ, ৩১ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে নির্বাচনি এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণের খসড়া তালিকা প্রকাশের পর খোদ সরকারি দলের একাধিক সংসদ সদস্য বিগত রকিবউদ্দীন কমিশনের বিরুদ্ধে গুরুতর পক্ষপাতদুষ্টতার অভিযোগ এনেছেন। অভিযোগ করা হয় যে, একজন প্রতিমন্ত্রীর মৌখিক অনুরোধে তাঁর নির্বাচনি এলাকার সীমানা পুনর্বিন্যাস করা হয়। এ পুনর্বিন্যাস করতে গিয়ে ঢাকার অন্য ১৫টি আসনের সীমানা

[৩০] টিআইবি (২০১৪). কার্যকর নির্বাচন কমিশন: অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়।

[৩১] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত ২০১৩ সালের সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত গেজেট।

[৩২] সূত্র: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।

[৩৩] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত ২০২৩ সালের সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত গেজেট।

[৩৪] সাইদুর রহমান, 'আওয়ামী লীগকে সুবিধা দিতে ১৩০ আসনের সীমানা বদল!', *ইত্তেফাক*, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৪।

[৩৫] গাজী শাহনেওয়াজ, '২০০১ সালের সীমানায় ফিরছে সংসদীয় আসন', *আমার দেশ*, ০৫ জানুয়ারি ২০২৫।

[৩৬] বদিউল আলম মজুমদার, 'সীমানা পুনর্নির্ধারণে জটিলতা হতে পারে,' *প্রথম আলো*, ২৩ অক্টোবর ২০১৭।

পুনর্নির্ধারণ করতে হয়েছে এবং ঢাকার আটজন সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে কমিশনে আপত্তি জানিয়েছেন। প্রস্তাবিত সীমানা পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে ঢাকা-৭ আসনের আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন অভিযোগ করেন, 'নির্বাচন কমিশন আমাদের সরকারের প্রভাবশালী একজন প্রতিমন্ত্রীর স্বার্থ রক্ষা করে ঢাকার আসনের সীমানা বিন্যাসের প্রস্তাব করেছে। একজনের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে ১৫ জনের স্বার্থহানি করাটা অন্যায়।'[৩৭]

সরকার দলীয় আরেকজন সংসদ সদস্য জাকির হোসেন এক নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বার্থে ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে কুড়িগ্রাম জেলার নির্বাচনি আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণের কাজে পক্ষপাতদুষ্ট হস্তক্ষেপ করার অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। কমিশনের শুনানিকালে তিনি দাবি করেন, 'কমিশন সচিবালয়ের নিচতলায় বসে কুড়িগ্রামের আসন তছনছ করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। একজন নির্বাচন কমিশনের ছেলে ও জামাতা কুড়িগ্রাম থেকে নির্বাচন করতে চাইছেন। তাদের জন্য পছন্দসই সীমানা সাজাতে কুড়িগ্রামের আসনগুলোতে হাত দিয়েছেন এই নির্বাচন কমিশনার।' প্রায় একই অভিযোগ করেন এই আসনের সাবেক সংসদ সদস্য জাপা নেতা গোলাম হাবিব ও চলচ্চিত্র পরিচালক বাদল খন্দকার।[৩৮] সীমানা নির্ধারণ প্রায়োগিক কাজ হওয়ায় এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অনুসরণীয় নীতিমালা আইন এবং কার্যক্ষেত্রে এর অনুসরণ না থাকায় নির্বাচন কমিশন প্রায় প্রতিটি নির্বাচনের আগে এমন বিতর্কের মুখে পড়েছে।

২০২১ সালের সীমানা নির্ধারণী আইনে আন্তর্জাতিকভাবে অনুসরণীয় নীতিমালার (Guiding Principles) প্রতিফলন না ঘটায় নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে আমরা মনে করি যে উক্ত আইন রহিত করা আবশ্যক। সীমানা নির্ধারণ একটি প্রয়োগিক কাজ। তাই আন্তর্জাতিক best practice অনুযায়ী ভবিষ্যতে নির্বাচন কমিশনের পরিবর্তে একটি আলাদা কমিশন গঠন করাও আবশ্যক। এর জন্য অবশ্য সংবিধান সংশোধন করতে হবে। তবে স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ হিসেবে জনসংখ্যার ঘনত্ব, সকল নাগরিকের প্রতিনিধিত্ব, বাংলাদেশের প্রশাসনিক অখণ্ডতা, ক্ষুদ্রতর জেলা, বৃহত্তর জেলা এবং বৃহত্তর সিটি করপোরেশন এলাকার ভোটারসংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সহায়তায় গঠিত একটি বিশেষায়িত কমিটির মাধ্যমে সীমানা পুনর্নির্ধারণের কাজটি করা যেতে পারে।

সুপারিশ

১. আন্তর্জাতিক best practice অনুযায়ী ভবিষ্যতে নির্বাচন কমিশনের পরিবর্তে একটি আলাদা সীমানা নির্ধারণ কমিশন গঠন করতে সংবিধান সংশোধন করা।

২. আলাদা কমিশন গঠন না করা পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের সহায়তায় একটি বিশেষায়িত কমিটি গঠন করা, যেখানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচন কর্মকর্তা, ভূগোলবিদ, মানচিত্রকার, পরিসংখ্যানবিদ, নগর পরিকল্পনাবিদ, তথ্য-প্রযুক্তিবিদ এবং জনসংখ্যাবিদসহ সংশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভুক্ত হবেন। কমিশন এ কাজে দেশি ও বিদেশি যে কোনো ব্যক্তির বা সংস্থার সহায়তা নিতে পারে। এ ক্ষেত্রে–

    ক. পল্লী এলাকার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন এবং সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার ক্ষেত্রে ওয়ার্ড কোনোভাবেই বিভক্ত না করা।

    খ. পার্বত্য এলাকার তিন জেলাকে তিনটি সুরক্ষিত সংসদীয় আসন (protected constituency) হিসেবে বিবেচনা করা। অন্যান্য জেলায় যেখানে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর বসবাস আছে সেগুলোতে ঐ জাতিগোষ্ঠীকে বিভক্ত না করে, অর্থাৎ একটি ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করে একই সংসদীয় আসনের অন্তর্ভুক্ত করা।

    গ. মেহেরপুর, পিরোজপুরসহ ছোট জেলাগুলোর জনসংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে একটি আলাদা জনসংখ্যা কোটা (smaller district population quota) বিবেচনা করে +/-১০% এর অধিক বিচ্যুতি না করে ঐসব জেলার সীমানা নির্ধারণ করা। বৃহত্তর জেলার জনসংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে একটি আলাদা জনসংখ্যা কোটা (greater district population quota) বিবেচনা করে +/-১০% এর অধিক বিচ্যুতি না করে ঐসব জেলার সীমানা নির্ধারণ করা। তবে ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের ক্ষেত্রে এ বিচ্যুতি ২৫% এর অধিক না করা।

আমাদের প্রস্তাবের একটি বড় যুক্তিকতা হলো নির্বাচন কমিশনকে বিতর্কের উর্ধ্বে রাখা। কারণ আবারও যদি সংসদীয় এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণ নিয়ে বড় ধরনের বিতর্ক হয়, যা নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে, তাহলে জাতি হিসেবে আমরা একটি বড় অনিশ্চয়তার দিকে ধাবিত হতে পারি। পুরো জাতিকে যার মাশুল দিতে হবে। এছাড়াও অতীতের ন্যায় নির্বাচন নির্বাচন কমিশন ভুল করলে, নাগরিকদের আর কোথাও যাওয়ার জায়গা থাকবে না। কারণ সীমানা নির্ধারণ আইনে আদালতের আশ্রয় নেওয়ার ব্যাপারে বিধি-নিষেধ রয়েছে, যদিও তা নিরঙ্কুশ নয়। পক্ষান্তরে প্রস্তাবিত বিশেষায়িত কমিটি ভুল করলে নাগরিকেরা নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রতিকারের জন্য যেতে পারবে।

এছাড়াও সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ একটি জটিল ও সময়ক্ষেপণকারী বিষয়, যেখানে বিশেষায়িত জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন। নির্বাচন কমিশনের এ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা আছে কি না তা নিয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। আর আগত নির্বাচনের প্রস্তুতির জন্য নির্বাচন কমিশনকে অনেক সময়-শ্রম দিতে হবে। তাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা যে, সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণের মতো কঠিন ও কষ্টসাধ্য কাজে সময় ব্যয় করার পরিবর্তে নির্বাচন কমিশন আসন্ন নির্বাচনের প্রস্তুতিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করুক। এছাড়াও জেমস মেডিসনের সে বিখ্যাত সাবধানবানী ভুললে চলবে না যে, কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাই স্বৈরাচারী শাসনের সূতিকাগার।

---

[৩৭] *প্রথম আলো*, ৩১ মার্চ ২০১৩।
[৩৮] *কালের কণ্ঠ*, ২৪ এপ্রিল ২০১৩।

৬. রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন

রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে নাগরিকেরা কোনো আদর্শ বা সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির ভিত্তিতে সংগঠিত হন এবং নির্ধারিত আদর্শ ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ব্যক্তির কল্যাণের পরিবর্তে জনকল্যাণই রাজনৈতিক দলের মূল লক্ষ্য। আর জনলকল্যাণমুখী রাজনৈতিক দলকে হতে হবে গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ।

রাজতন্ত্রের মতো চরম কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল ছিল অপ্রয়োজনীয় এবং অনপুস্থিত, কেননা সেখানে রাজার ইচ্ছাই ছিল আইন এবং জনগণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করার কোনো সুযোগ ছিল না। কিন্তু সামন্তবাদী সমাজের রূপান্তর এবং জনগণের মধ্যে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হওয়ার কারণে রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক শাসনের গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হয়ে ওঠেছে। বস্তুত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যামুয়েল পি. হান্টিংটনের মতে, আধুনিক সরকার ব্যবস্থার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরালভাবে রাজনৈতিক দলেরও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।[৭৯] রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে ধর্ম, বর্ণ, জাতিগত আইডেনটিটি বা পরিচিতি ও সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে বিভাজিত অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী, গোত্র ও জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে। তাদের দাবিদাওয়া ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে একত্রিত করে সেগুলো সমাধানের লক্ষ্যে কর্মসূচি প্রণয়ন করে। এছাড়াও রাজনৈতিক দল মানুষকে সংগঠিত করে এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।

রাজনৈতিক দল বর্তমানে গণতান্ত্রিক শাসনের অন্যতম সহায়ক শক্তি হলেও এগুলোকে ঐতিহাসিকভাবে অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন এবং বিভিন্ন নেতিবাচক ধারণার মধ্য দিয়ে পার হতে হয়েছে।[৮০] বস্তুত আমেরিকার জাতির পিতাদের অনেকেই রাজনৈতিক দলকে 'ইভিল' বা চরম ক্ষতিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবেই বিবেচনা করেছেন। টমাস জেফারসন তাঁর ১০ নম্বর ফেডারেলিস্ট পেপারে রাজনৈতিক দলকে জন ও সামষ্টিক স্বার্থ পরিপন্থি আবেগের দ্বারা তাড়িত দলাদলির হাতিয়ারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। "যদি আমার স্বর্গে যাওয়ার জন্য রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন হয়, তাহলে আমি স্বর্গেই যাব না"– তিনি এমন উক্তিও উচ্চারণ করেছেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। এমনকি জেমস মেডিসন এবং জন জেকুই রুশোও রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থহানিকর কাজে লিপ্ত হওয়ার প্রবণতা প্রদর্শনের অভিযোগ তুলেছিলেন।[৮১] তা সত্ত্বেও কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক শাসন প্রক্রিয়ার অন্যতম অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে এবং সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে। তাই গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের অবদান খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। এই অবদানের স্বীকৃতি হিসেবেই রাজনৈতিক দল আমাদের দেশে সংবিধান স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

তবে রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে সমাজে বিভেদ সৃষ্টির প্রবণতা, এমনকি পশ্চিমা উন্নত দেশেও ক্রমান্বয়ে লক্ষ করা যাচ্ছে। আমাদের মতো অপেক্ষাকৃত নবীন গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক দলের মধ্যকার অশুভ প্রতিযোগিতা অনেক ক্ষেত্রে বেসামাল পর্যায়ে পৌঁছে। এমনকি এসব প্রতিযোগিতা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত শত্রুতায়ও পরিণত হয়। রাজনৈতিক শত্রুতা অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপক সহিংসতায় রূপ নেয়। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এসব সহিংসতা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৮-২০০৮ সালে কেনিয়ায় সংঘটিত নির্বাচনি সহিংসতায় এক হাজারেরও বেশি লোক নিহত হয় এবং হাজার হাজার কেনিয়ান নাগরিক দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়।[৮২]

দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাসে রাজনৈতিক দলগুলোর গুরুত্বপূর্ণ অবদান থাকলেও গত দেড় শতকের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনকালে বাংলাদেশের রাজনীতি চরমভাবে পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হয়েছে। রাজনৈতিক অঙ্গন হয়েছে চরমভাবে কলুষিত। রাজনীতির লক্ষ্য পাবলিক সার্ভিস বা জনকল্যাণ হলেও, এটি ক্রমান্বয়ে ব্যক্তির কল্যাণে নিয়োজিত ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে রূপান্তরিত হয়েছে। মনোনয়ন বাণিজ্য বেসামাল পর্যায়ে পৌঁছেছে। বস্তুত নির্বাচনে মনোনয়ন ক্রয়-বিক্রয় একটি সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছে। শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক দল আমাদের সমাজে এখন অনেকটা সিন্ডিকেটের মতো আচরণ করে এবং রাজনীতিকে আর্থিক লেনদেনের হাতিয়ারে পরিণত করেছে। রাজনৈতিক দলগুলো যে কোনো মূল্যে ক্ষমতায় যাওয়ার ও ক্ষমতায় টিকে থাকার অশুভ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। গত দেড় দশকে আমাদের ক্ষমতাসীন দল আইন-কানুন, বিধি-বিধানের প্রতি বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করেনি। মানুষ এখন আমাদের দেশে রাজনীতিতে যুক্ত হয় কিছু প্রাপ্তির আশায়, জনকল্যাণ সাধনের জন্য নয়। যার ফলে দেশে ফায়দাভিত্তিক রাজনীতির উদ্ভব হয়েছে, যা কেবল রাজনৈতিক দলগুলোকেই গণতান্ত্রিক চর্চা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়নি, দেশের গণতন্ত্রকেও দুর্বল করে দিয়েছে।

---

[৭৯] Samuel Huntington, *Political Order in Changing Societies* (New Haven: Yale University Press, 1968), p. 90.

[৮০] Badiul Alam Majumdar, 'Inclusive Electoral Process: Transparency, Accountability and Internal Democracy of Political Parties,' (July 2012).

[৮১] Pippa Norris, ''Development in Party Communication,'' in *Political Parties and Democracy in the Theoretical and Practical Perspective,* (Washington DC: National Democratic Institute for International Affairs), p. 3.

[৮২] Ochieng, C. O. P., Matanga, F. K., & Iteyo, C. (2023). Causes and Consequences of Post-Election Violence in Kenya. *African Journal of Empirical Research*, *4*(2), 480-492.

রাজনীতিতে আর্থিক লেনদেন বৃদ্ধির পাশাপাশি অসহিষ্ণুতা ও হানাহানিও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। জনকল্যাণের পরিবর্তে যে কোনো মূল্যে ক্ষমতায় যাওয়া এবং ক্ষমতা ধরে রাখাই মূল লক্ষ্য হওয়ায় দলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক সহিংসতা নিত্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। মানবাধিকার সংগঠন *আইন ও সালিশ কেন্দ্র* কর্তৃক ২০১৩ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত মানবাধিকার প্রতিবেদন অনুযায়ী, এ দশ বছরে রাজনৈতিক সহিংসতায় ১ হাজার ৪৪৫ জন নিহত হয়েছেন।[৪৩] এছাড়া দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থলে ক্রমাগত একদলীয় ও কতৃত্ববাদী হয়ে ওঠায় বিরোধী দলগুলো ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক চরমভাবে নিগৃহীত হয়েছে। বিরোধী দলগুলোর হাজার হাজার নেতা-কর্মী হামলা-মামলা ও গ্রেপ্তারের সম্মুখীন হয়েছেন, যা তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে বাধাগ্রস্ত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৩ সালে *নিউইয়র্ক টাইমসে* প্রকাশিত এক নিবন্ধ অনুযায়ী, আওয়ামী লীগের শাসনামলে বিএনপির পাঁচ লাখ নেতা কর্মীর বিরুদ্ধে অসংখ্য মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং প্রায় অর্ধেকেই গায়েবি মামলা। একই নিবন্ধে দাবি করা হয় যে, ২০০৯ সাল থেকে বিএনপির নেতা-কর্মীদের ৮০০ জনকে হত্যা ও ৪০০ জনের অধিককে গুম করা হয়েছে এবং এককভাবে দলের সাধারণ সম্পাদক মীর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বিরুদ্ধেই ৯৩টি মামলা চলমান রয়েছে।[৪৪] ২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর তারিখে একটি সাজানো নাটক মঞ্চস্থ করে সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ার গ্যাস ফুটিয়ে বিএনপির একটি মহাসমাবেশ ভণ্ডুল করে দেয় এবং উল্টো গায়েবি মামলা দায়ের করে ২৫ হাজারের মত বিএনপির নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে। এর পাশাপাশি দেড় হাজারের মত বিএনপির নেতা-কর্মীকে তড়িগড়ি করে বিভিন্ন মেয়াদের সাজা দেয়, যাতে দলটির পক্ষে কয়েক মাস পরে অনুষ্ঠেয় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগহণ করা সম্ভব না হয়।

রাজনৈতিক দলের এসব যথেচ্ছার ও অগণতান্ত্রিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে দলগুলোকে একটি পরিছন্ন গণতান্ত্রিক ধারায় ফিরিয়ে আনার জন্যই রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন অপরিহার্য। জেমস মেডিসন একবার বলেছিলেন, মানুষ ফেরেশতা নয়। যদি হতো, তাহলে কোনো সরকারেরই প্রয়োজন পড়তো না। রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরাও অতিমানব নন, তাই সমাজে বিশৃঙ্খলা ও যথেচ্ছার এড়ানোর লক্ষ্যে সকল নাগরিকদের মতো তাদের আচরণের ওপরও বিধি-নিষেধ প্রয়োজন। কারণ কোনো সংঘবদ্ধ সমাজেই কেউ যা ইচ্ছা তা করতে পারে না – প্রত্যেকেরই কিছু বিধি-নিষেধ মানার প্রয়োজন পড়ে। রাজনৈতিক দলের বাধ্যতামূলক নিবন্ধনের বিধান এ বিধি-নিষেধ আরোপের প্রয়োজনীয়তা থেকেই উদ্ভূত। নিবন্ধনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দল আইনি কাঠামোর অধীনে আসে এবং সংযত ও আইনানুগ আচরণ করতে বাধ্য হয়। নিবন্ধনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের অধিকার ও দায়দায়িত্ব নির্ধারিত হয় এবং তাদের জন্য জনস্বার্থে দায়িত্ব পালনের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়, যদিও অনেক ক্ষেত্রে এসব বাধ্যবাধকতা উপেক্ষিত হয়। সর্বোপরি নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়াবলির সংস্কারের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধের নিয়ম প্রচলন হয় ১৯৭৬ সালে, জিয়াউর রহমানের আমলে। ১৯৭৬ সালের ২৮ জুলাই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জিয়াউর রহমান *রাজনৈতিক দল বিধি*, ১৯৭৬ সামে একটি বিধি জারি করেন। এ বিধি জারির ফলে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছিল তা প্রত্যাহার করা হয় এবং দলগুলো আবার রাজনৈতিক তৎপরতা শুরুর সুযোগ পায়। তবে বিধি অনুসারে তৎপরতা শুরু করতে হলে দলগুলোকে নিজেদের গঠনতন্ত্র, সাংগঠনিক কাঠামো, অর্থের উৎস ইত্যাদি সরকারের কাছে দাখিল করে অনুমোদন নিতে হতো। ১৯৭৬ সালের ৪ আগস্ট এবং ২৪ অক্টোবর এই রাজনৈতিক বিধিমালার দুটি সংশোধনী আনা হয়। এ বিধিমালার প্রেক্ষিতে ৫৬টি রাজনৈতিক দল সরকারের কাছে আবেদন করে; এদের মধ্যে ১৯টি দল বৈধ দল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বর রাজনৈতিক দলবিধি বাতিল করা হয় এবং পরবর্তীতে ১৯৭৮ সালে *Political Parties Ordinance, 1978* প্রণয়ন করা হয়। তবে সামরিক শাসক এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণ এবং নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নতুন করে শুরু হলে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রক্রিয়া অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে থাকে।

১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৭৫টি এবং ১৯৯৬ সালের সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৮১টি দল অংশ নেয়। সে সময় নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধনের বিষয়টি উত্থাপন করা হলে দলগুলোর পক্ষ থেকে চরম বিরোধিতা, এমনকি নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদেরকে হাসি-ঠাট্টার মুখোমুখি হতে হতো। ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনের সুপারিশে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করার বিধান করেন। কিন্তু প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর চাপে নির্বাচনের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি আরেকটি অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে বিধানটি বাতিল করে নিবন্ধনের বিষয়টিকে ঐচ্ছিক করেন।[৪৫] পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশন *Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2001* (অধ্যাদেশ নং ১, ২০০১)-এর ধারা ৯০-এর মাধ্যমে কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের বিষয়টি ঐচ্ছিক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত

[৪৩] Study of electoral violence in Bangladesh's 2024 national election, Final Report, THP & SHUJAN, September 2024
[৪৪]Mujub Mishal, ''Quietly Crushing a Democracy: Millions on Trial in Bangladesh,'' *New York Times,* September 2, 2023.
[৪৫] বদিউল আলম মজুমদার, *গণতন্ত্র, নির্বাচন ও সুশাসন* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৯)।

করে। এই অধ্যাদেশটি ২০০১ সালের ৫৭ নম্বর আইনে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু সে সময়ে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই নিবন্ধনের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেনি। শুধু একটি দল (জাতীয় পার্টি-জেপি) নিবন্ধন করেছিল। ২০০৮ সালে ৪২ নম্বর অধ্যাদেশের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণে আগ্রহী হলে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের বিধান করা হয়। পরবর্তীতে এই অধ্যাদেশটি ২০০৯ সালের ১৩ নম্বর আইনে রূপান্তরিত হয়।

বর্তমানে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ৪৮টি। এর মধ্যে বেশিরভাগ দলের নিবন্ধন হয়েছে ২০০৮ সালে। সর্বশেষ ২০২৪ সালে ৪টি দল নিবন্ধন লাভ করেছে। এর আগে ২০২৩ সালে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বেশ কয়েকটি দলকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়। এর মধ্যে অন্তরা হুদা ও শমসের মুবিন চৌধুরীর নেতৃত্বে 'তৃণমূল বিএনপি', ইমাম আবু হয়াতের নেতৃত্বে 'ইনসানিয়াত বিপ্লব-বাংলাদেশ', শাহ মোহাম্মদ আবু জাফরের নেতৃত্বে 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-বিএনএম', এবং শাহজাদা সৈয়দ সাইফুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে 'বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি'র নিবন্ধন প্রক্রিয়া নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে।[৪৬] নির্বাচনি মাঠে প্রধান বিরোধী দলগুলোর অনুপস্থিতিতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট বলে এ দলগুলো কিংস পার্টি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।[৪৭]

বর্তমানে রাজনৈতিক দলসমূহের নিবন্ধনের শর্তসংশ্লিষ্ট আরপিও'র অধ্যায়টি হলো অধ্যায় ৬ক। এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নির্বাচন কমিশন *রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮* নামে একটি বিধিমালাও প্রণয়ন করেছে। আরপিও-এর ৯০খ(১) অনুযায়ী রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধন পেতে হলে তিনটি শর্তের যে কোনো একটি পূরণ করতে হয়। শর্তগুলোর মধ্যে রয়েছে: স্বাধীনতার পর অনুষ্ঠিত যে কোনো সংসদ নির্বাচনে দলীয় নির্বাচনি প্রতীক নিয়ে কমপক্ষে একটি আসনে জয়ী হওয়ার রেকর্ড থাকতে হবে; যে কোনো একটি আসনে দলীয় প্রার্থীকে মোট প্রদত্ত ভোটের ৫ শতাংশ পেতে হবে; কেন্দ্রীয় কমিটিসহ একটি কেন্দ্রীয় কার্যালয়, অন্তত এক-তৃতীয়াংশ প্রশাসনিক জেলায় কার্যকর জেলা কার্যালয়, অন্তত ১০০টি উপজেলায় কার্যালয় এবং প্রতিটিতে সদস্য হিসেবে অন্তত ২০০ জন ভোটারের তালিকাভুক্তি থাকতে হবে। এছাড়া নিবন্ধন পেতে আগ্রহী দলগুলোকে তাদের দলীয় গঠনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় কমিটিসহ দলের সকল স্তরের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব অর্জন, ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠনকে অঙ্গ বা সহযোগী সংগঠন হিসেবে না রাখা এবং বিভিন্ন নির্বাচনে প্রার্থিতার জন্য তৃণমূলের ভোটে প্যানেল প্রস্তুত করার ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিধান রাখতে হবে। আরপিও'র ৯০গ(১) ধারায় দল নিবন্ধনের অযোগ্যতার বিধান রয়েছে। যেমন, গঠনতন্ত্রে বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ সংবিধানের পরিপন্থি হলে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ভাষা বা লিঙ্গভেদে কোনো বৈষম্য প্রতীয়মান হলে, গঠনতন্ত্রে দেশের ভৌগোলিক সীমার বাইরে কোনো কার্যালয়, শাখা বা কমিটি গঠন ও পরিচালনার বিধান থাকলে কোনো দল নিবন্ধন পাওয়ার যোগ্য হবে না।

আইনে দল নিবন্ধের এরূপ নানান শর্ত থাকলেও কার্যত বেশিরভাগ দলই এ শর্ত মানে না। দলগুলোর শর্ত না মানা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত প্রতিবেদনও প্রকাশিত হতে দেখা যায়। ১৭ জুলাই ২০২৩ সালে দৈনিক *সমকালে* প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী সে সময় পর্যন্ত নিবন্ধিত দলগুলোর কেউই শতভাগ শর্ত পূরণ করতে পারেনি। ন্যূনতম এক-তৃতীয়াংশ জেলা কার্যালয় ছিল মাত্র ৯টি দলের।[৪৮] আবার কিছু শর্তের ক্ষেত্রে দেখা যায়, নিবন্ধন পাওয়ার জন্য গঠনতন্ত্রে আইন মানা হলেও কার্যত মানে না। যেমন, ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠনকে অঙ্গ বা সহযোগী সংগঠন হিসেবে না রাখার বিধানটি দলগুলো গঠনতন্ত্রে মেনে চললেও বাস্তবে এগুলোকে নিজেদের লেজুড়বৃত্তি কাজে লাগায়।

অতীতের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি চিরতরে অবসান করে বাংলাদেশের জন্য গণতান্ত্রিক উত্তরণ ঘটাতে হলে বিদ্যমান ভঙ্গুর পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও জরাজীর্ণ প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর করার পাশাপাশি আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর গণতন্ত্রায়ন জরুরি হয়ে পড়েছে। একইসঙ্গে জরুরি হয়ে পড়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা করা, কারণ রাজনৈতিক দলগুলোই ভবিষ্যতে সরকার গঠন করবে এবং রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেবে।

অংশীজনের মতামত: বিভিন্ন মতামত

অংশীজনের সঙ্গে আলোচনাকালে রাজনৈতিক দল বিষয়ক অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিম্নে দেওয়া হলো: সকল স্তরের কমিটি গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচিত করা; একমাত্র দলীয় সদস্যদের চাঁদার মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোর অর্থের সংস্থান করা; অডিটকৃত হিসাব দাখিল করা; নির্বাচনে নারী সদস্যদের মনোনয়ন বৃদ্ধি করা; ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিক বা অন্য কোনো পেশার সদস্যদের নিয়ে দলের সহযোগী বা অঙ্গসংগঠন না রাখা; আইসিটি (আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল) আইনের অধীনে সাজাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সদস্য না করা; গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নির্বাচনে অযোগ্য করা; প্যানেলের মাধ্যমে প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়া; রাজনৈতিক দলের সদস্যদের নাম দলের ওয়েবসাইটে থাকা এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা, ইত্যাদি।

[৪৬] 'ভুঁইফোড়' সেই দুই দল বিএনএম ও বিএসপিকে নিবন্ধন দিল ইসি', *প্রথম আলো*, ১০ আগস্ট ২০২০৩

[৪৭] 'আলোচনায় কিংস পার্টি', *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪

[৪৮] 'ইসির নিবন্ধন শর্ত শুধু কাগজে, বাস্তবে নেই', *সমকাল*, ১৯ জুলাই ২০২৩

সুপারিশ

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ধারা ৯০ক থেকে ৯০জ-এ সংশোধন আনতে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১. নতুন দল নিবন্ধনের শর্ত শিথিলের লক্ষ্যে ১০% জেলা এবং ৫% উপজেলা/থানায় দলের অফিস এবং ন্যূনতম ৫,০০০ সদস্য থাকার বিধান করা।

২. দলের সকল সদস্যদের তালিকা প্রস্তুত ও তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।

৩. আরপিও'র ১২ ধারার অধীনে সংসদ সদস্য পদের জন্য অযোগ্য ব্যক্তিদেরকে কোনো নিবন্ধিত দলের সাধারণ সদস্য/কমিটির সদস্য হওয়ার অযোগ্য করা।

৪. আইসিটি আইনে সাজাপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তিকে কোনো দলের সাধারণ সদস্য/কমিটির সদস্য হওয়ার অযোগ্য করা।

৫. *আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনাল) আইন*, ১৯৭৩-এর ৯(১) ধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে আদালতে অভিযোগপত্র গৃহীত হলে সে সব ব্যক্তিকে কোনো নিবন্ধিত দলের সাধারণ সদস্য/কমিটির সদস্য হওয়ার অযোগ্য করা।

৬. দলের সদস্যদের গোপন ভোটে দলের স্থানীয় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল কমিটি নির্বাচিত করা।

৭. দলের সদস্যদের গোপন ভোটে প্রতিটি নির্বাচনি এলাকা থেকে সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য তিনজনের একটি প্যানেল তৈরি এবং তা থেকে দলীয় মনোনয়ন প্রদানের বিধান করা।

৮. দলের সদস্যদের চাঁদা ন্যূনতম ১০০ টাকা ও কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে অনুদান হিসেবে সর্বোচ্চ ৫০ লাখ টাকা নেওয়ার বিধান করা। এ অনুদান ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে গ্রহণের বাধ্যবাধকতা প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ট্যাক্স রিটার্নে প্রদর্শনের বিধান করা।

৯. দলের তহবিল ব্যবস্থাপনায় বর্তমানে বিদ্যমান ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে নিবন্ধিত দল কর্তৃক বাৎসরিকভাবে দাখিলকৃত অডিটেড আয় ও ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করা এবং নির্বাচন কমিশনে দাখিল করা। একইসঙ্গে কমিশন কর্তৃক অডিটেড হিসাব নিরীক্ষণের বিধান করা।

১০. নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকে *তথ্য অধিকার আইন*, ২০০৯-এর আওতাভুক্ত করা।

১১. দলের লেজুড়বৃত্তিক ছাত্র, শিক্ষক ও শ্রমিক সংগঠন, ভাতৃপ্রতিম বা যে কোনো নামেই হউক না কেন, না থাকার বিধান করা।

১২. দলের, যে নামেই হউক না কেন, বিদেশি শাখা না থাকার বিধান করা।

১৩. দলের সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়নের জন্য দলের সংশ্লিষ্ট দলের তিন বছরের সদস্য পদ থাকা বাধ্যতামূলক করা।

১৪. প্রতি ৫ বছর পর পর দল নিবন্ধন নবায়ন বাধ্যতামূলক করা।

১৫. পর পর দুটি নির্বাচনে অংশ না নিলে নির্বাচন বাতিলের বিধান বাতিল করা।

৭. জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) ব্যবস্থাপনা ও ভোটার তালিকা

একটি দেশের জাতীয় পরিচয় (National Identity) সিস্টেম একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ সিস্টেম। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে জাতীয় পরিচয় সিস্টেম গভীরভাবে জড়িত। এর কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের নাগরিকদের আইডেন্টিটি নিবন্ধন প্রক্রিয়া ভোটার তালিকায় নাগরিকদের যুক্ত করার প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। এই অধ্যায়ে আমরা বাংলাদেশের NID সিস্টেমের বিভিন্ন দিকের সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা আইডেন্টিটি সিস্টেমের বিভিন্ন মডেল এবং আইডেন্টিটির জীবন-চক্র সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। এর পরে বাংলাদেশে বিদ্যমান NID সিস্টেমের বিভিন্ন টেকনিক্যাল দিক এবং সমস্যা নিয়ে আলোকপাত করেছি। তারপরে আমরা একটি আধুনিক আইডেন্টিটি সিস্টেমের রূপরেখা নিয়ে আলোকপাত করেছি। সবশেষে এই আধুনিক পদ্ধতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কিছু সুপারিশ পেশ করেছি।

আইডেন্টিটি সিস্টেম মডেল এবং জীবন-চক্র

এই সেকশনে আমরা বিভিন্ন আইডেন্টিটি মডেল এবং আইডেন্টিটির জীবনচক্র সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করছি।

আইডেন্টিটি সিস্টেম মডেল

বিশ্বব্যাপী সরকার-স্বীকৃত আইডেন্টিটি সিস্টেম প্রধানত দুটি আইডেন্টিটি মডেল ব্যবহার করে: কেন্দ্রীভূত মডেল (Centralised model) এবং ফেডারেটেড মডেল (Federated model)। নিচে আমরা এই দুটি মডেল সংক্ষেপে আলোচনা করছি:

- **সেন্ট্রালাইজড মডেল:** সেন্ট্রালাইজড মডেলে একটি দেশের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সংস্থা আইডেন্টিটি সংক্রান্ত সকল সেবার জন্য একমাত্র কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। এই কর্তৃপক্ষ একটি যাচাইযোগ্য আইনি পরিচয় প্রদান করে যাকে সেই দেশের সরকারও স্বীকৃতি দেয়। সাধারণত, এই সংস্থা একটি authoritative আইডেন্টিটি রেজিস্টার মেইনটেইন করে, যা একটি দেশের সকল নাগরিকের আইডেন্টিটির তথ্য সংরক্ষণ করে। বেলজিয়ামের eCard, নেদারল্যান্ডসের DigiD এবং ভারতের আধার এরকম সেন্ট্রালাইজড মডেলের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই রেজিস্টার সংশ্লিষ্ট দেশের মৌলিক আইডি ডেটাবেস হিসেবে কাজ করে।

- **ফেডারেটেড মডেল:** কিছু দেশে সেন্ট্রালাইজড কোনো আইডেন্টিটি রেজিস্টারের বদলে, আইডেন্টিটির অন্য আরেকটি মডেল ব্যবহার করে যেখানে অনেক কর্তৃপক্ষ সেই দেশের নাগরিকেদের আইডেন্টিটির তথ্য সংরক্ষণ করে এবং তাদের আইডেন্টিটির কর্তৃত্বশীল উৎস (authoritative source) হিসেবে কাজ করে। এরকম আইডেন্টিটি কর্তৃপক্ষগুলোকে একটি ট্রাস্ট ফ্রেমওয়ার্ক বা ফেডারেশনের মাধ্যমে একত্রিত করে একটি সমন্বিত আইডেন্টিটি সিস্টেম গড়ে তোলা যায়। এই ধরনের মডেলকে ফেডারেটেড মডেল বলে। একটি ফেডারেশনের পরিচয় প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কোনো সরকারি এবং/অথবা বেসরকারি সংস্থা হতে পারে যারা আবার আইডেন্টিটির জন্য অন্য কোনো authoritative source এর ওপর নির্ভরশীল হতে পরে। সুইডেন, নরওয়ে এবং ফিনল্যান্ডের ব্যাংক আইডি, ডেনমার্কের NemID, বেলজিয়ামের Itsme এরকম ফেডারেটেড মডেলের কিছু উদাহরণ। আবার কিছু দেশে এরকম প্রতিটি সংস্থা তাদের নিজস্ব আইডেন্টিটি রেজিস্টার ব্যবহার করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে ইউকে এর GOV.UK Verify, কানাডার SecureKey এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

একটি নির্দিষ্ট দেশের প্রেক্ষাপট এবং বিদ্যমান তথ্য উৎসের বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর সেই দেশের জন্য আদর্শ মডেল কী রকম হবে তা নির্ভর করে।

আইডেন্টিটির জীবন চক্র (Life-cycle)

আইডেন্টিটির জীবন চক্র বলতে একটি আইডেন্টিটি সিস্টেমের মধ্যে আইডেন্টিটি তৈরি এবং পরিচালনার জন্য যে স্টেপগুলো জড়িত তাকে বোঝায়। এটি একটি ক্রমাগত প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি, আইডেন্টিটি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য আইডেন্টিটির ওপর নির্ভরশীল পক্ষের মধ্যে ট্রাস্টেড ইন্টারঅ্যাকশন নিশ্চিত করা যায়। প্রক্রিয়াটি আইডেন্টিটি সিস্টেমে একটি নতুন পরিচয় নিবন্ধন দিয়ে শুরু হয় এবং অথেন্টিকেশন, তথ্য আপডেট এবং সেই পরিচয়ের অবসর (retirement) এর মধ্যে শেষ হয়। আইডেন্টিটির জীবনচক্রে পাঁচটি পৃথক ধাপ রয়েছে: নিবন্ধন করা, ইস্যু করা, ব্যবহার করা, পরিচালনা করা এবং রিটায়ার করা। নিচে এই পাঁচটি ধাপ সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো।

- **নিবন্ধন:** আইডেন্টিটির জীবন চক্রের প্রাথমিক ধাপ হচ্ছে সঠিকভাবে যাচাইকরণের পর কোনো ব্যক্তির আইডেন্টিটি সিস্টেমে জেনারেট করা। এই প্রক্রিয়ায় দুটি উপ-ধাপ রয়েছে: আইডেন্টিটি ক্লেইম (identity claim) এবং আইডেন্টিটি প্রমাণীকরণ (identity proofing)। প্রথম ধাপে একজন ব্যক্তির শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য সংগ্রহ করা হয়। শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে সাধারণ বায়োগ্রাফিকাল তথ্য যেমন, ব্যক্তির নাম, জন্ম তারিখ, লিঙ্গ, ঠিকানা, ই-মেইল ঠিকানা এবং বায়োমেট্রিক

তথ্য যেমন, আঙুলের ছাপ, মুখের ছবি বা আইরিস স্ক্যান। বায়োগ্রাফিকাল তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করার জন্য ওই ব্যক্তির জন্ম সনদ বা পাসপোর্টের মতো অতিরিক্ত ডকুমেন্ট প্রদান করার দরকার হতে পারে। পরিচয় প্রমাণীকরণ ধাপে দাবিকৃত আইডেন্টিটি তথ্যের প্রামাণ্যতা (authenticity) যাচাই করার জন্য সহায়ক ডকুমেন্ট যাচাই-বাছাই করা হয়, তথ্যের এবং পরিচয়ের অনন্যতা (uniqueness) নিশ্চিত করতে অন্যান্য সব ব্যক্তির বায়োমেট্রিক তথ্যের সঙ্গে বর্তমান ব্যক্তির বায়োমেট্রিক তথ্য যাচাই করা হয়।

- **প্রদান:** সফল নিবন্ধনের পর, পরিচয় প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান একটি ক্রেডেনশিয়াল ইস্যু করে, যা রেজিস্টার্ড আইডেন্টিটির প্রমাণ হিসেবে কাজ করে। ক্রেডেনশিয়ালের বিভিন্ন প্রকার হতে পারে, যেমন, ফিজিক্যাল কার্ড, ডিজিটাল সার্টিফিকেট এবং মোবাইল আইডি। এই ক্রেডেনশিয়ালগুলোর ডিজাইন এবং সিকিউরিটি আইডেন্টিটি চুরি এবং প্রতারণার বিরুদ্ধে সিস্টেমের রিসিলিয়েন্স (risilience) এবং আইডেন্টিটি এক্সেসিবিলিটি নিশ্চিত করে।

- **ব্যবহার:** এই ধাপে ব্যক্তিরা কোনো পরিষেবা কিংবা বেনিফিট অ্যাক্সেস করার জন্য তাদের আইডেন্টিটি প্রমাণ করার উদেশ্যে কোনো সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তিকে ইস্যুকৃত আইডেন্টিটি ক্রেডেনশিয়াল উপস্থাপন করেন। এই ধরনের সেবা প্রদানকারী সংস্থা কিংবা ব্যক্তিকে আইডেন্টিটির ভাষায় Relying party বলে। উদাহরণস্বরূপ, সরকারি সংস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এগুলোকে relying party বলা যায়। এই ধাপের আবার দুটি উপ-ধাপ রয়েছে, যা নিচে বর্ণনা করা হলো।

    - **প্রমাণীকরণ (Authentication):** এই ধাপে এক বা একাধিক উপায়ে একটি ক্রেডেনশিয়াল উপস্থাপনকারী ব্যক্তির পরিচয় যাচাই করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি একটি ইউজারনেম এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে নিজেকে authenticate করতে পারেন। অথবা কোনো ছবি বা আঙুলের ছাপের মতো বায়োমেট্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করেও নিজেকে authenticate করতে পারেন।

    - **যাচাইকরণ (Verification):** এই প্রক্রিয়ায় কোনো ব্যক্তির জমা দেওয়া ক্রেডেনশিয়াল যাচাই করা হয়। যাচাই সফল হলে ব্যক্তিটি তার অনুরোধকৃত পরিষেবা অ্যাক্সেস করতে পারেন।

- **ব্যবস্থাপনা (Management):** সময়ের সঙ্গে সিস্টেমের নির্ভুলতা নিশ্চিত করতে আইডেন্টিটি তথ্য এবং ক্রেডেনশিয়ালের ক্রমাগত রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। এই প্রক্রিয়াতে নিম্নের ধাপগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:

    - **আইডেন্টিটি তথ্য আপডেট করা:** সময়ের পরিক্রমায় পরিবর্তিত হয় এমন আইডেন্টিটি তথ্য আপডেট করার ব্যবস্থা থাকতে হয়। যেমন, কোনো ব্যক্তির ঠিকানা বা বৈবাহিক অবস্থা এগুলোর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হতে পারে। এছাড়াও তথ্য আপডেটের সময় নতুন প্রদান করা তথ্যের প্রমাণীকরণের (proofing) প্রয়োজন হতে পারে।

    - **ক্রেডেনশিয়াল ম্যানেজ করা:** এই ধাপে ক্রেডেনশিয়াল ম্যানেজ করা হয়, যেমন ক্রেডেনশিয়াল নবায়ন, প্রত্যাহার এবং নিষ্ক্রিয় করা।

    - **ত্রুটি সংশোধন এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি করা:** আইডেন্টিটি তথ্যের ত্রুটি সংশোধন এবং নির্দিষ্ট অভিযোগ মোকাবেলার ব্যবস্থা রাখা খুবই জরুরি।

- **অবসর গ্রহণ:** আইডেন্টিটি জীবন চক্রের শেষ ধাপে সিস্টেম থেকে ব্যক্তির পরিচয় রেকর্ড মুছে ফেলা হয়। কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হলে বা নির্দিষ্ট আইডেন্টিটি সিস্টেমে তাদের আইডেন্টিটি যদি আর সংরক্ষণ করতে না হয়, তখন এই ধাপটির মাধ্যমে ওই ব্যক্তির আইডেন্টিটি রিটায়ার করানো হয়।

বাংলাদেশে বিদ্যমান এনআইডি সিস্টেম

এই সেকশনে বাংলাদেশের বর্তমান এনআইডি (জাতীয় পরিচয়) ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক উপস্থাপনের অংশ হিসেবে এনআইডি সিস্টেমে জীবনচক্রের ধাপগুলো বিশ্লেষণ করেছি। এরপরে আমরা এনআইডি ব্যবস্থার জন্য গৃহীত মানদণ্ডগুলো উপস্থাপন করেছি এবং বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে সুরক্ষা সেবা বিভাগে এনআইডি সিস্টেমের হস্তান্তরের উদ্যোগ সম্পর্কে আলোকপাত করেছি।

এনআইডি সিস্টেমের ইতিহাস

২০০৭ সালে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে নির্ভুল, নির্ভরযোগ্য ভোটার তালিকা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ সরকার ও ইউএনডিপি-সহ নয়টি আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন (Preparation of Electoral Roll with Photographs & Facilitating the Issuance of National Identity (ID) Card- PERP)

প্রকল্পের মাধ্যমে আন্তজার্তিক মান অনুসরণ করে ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা (Electoral Rolls with photographs) প্রস্তুতের কাজ শুরু করে। ভোটার তালিকার উপজাত (by product) হিসেবে এনআইডি ডাটাবেজ প্রস্তুত হয়, যার ভিত্তিতে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়। PERP প্রকল্পের স্থায়িত্ব কাল ছিল ২০ আগস্ট ২০০৭ থেকে ৩০ জুন ২০১২, যার অধীনে প্রায় ৮.৫ কোটি নাগরিককে কাগজের তৈরি প্লাস্টিক লেমিনেটেড জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়।

পরবর্তীতে বিশ্বব্যাংকের ঋণ সহায়তায় আইডিইএ (Identification System for Enhancing Access to Service- IDEA) প্রকল্পের মাধ্যমে আধুনিক, অধিক নির্ভরযোগ্য ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন 'স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র' প্রদানের কার্যক্রম শুরু হয়। IDEA প্রকল্পের স্থায়িত্ব কাল ছিল ০১ জুলাই, ২০১১ থেকে ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত। এখন IDEA প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়) এর মাধ্যমে উক্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যা শুরু হয়েছে ০১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে এবং চলমান থাকবে ৩০ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অধীন আইডিয়া প্রকল্পের আওতায় ৯ কোটি ভোটারের অধিক নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সংবলিত স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৫ সালে Oberthur Technologies-এর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে IDEA দ্বিতীয় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় ২ কোটি ৩৬ লক্ষ স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র মুদ্রণ ও বিতরণ লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এ লক্ষ্যে ২ কোটি ৩৬ লক্ষ স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র ক্রয়ের জন্য ইতোমধ্যে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

জাতীয় পরিচয়পত্রের মূল ভিত্তি হচ্ছে *জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন-২০১০*। তবে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার *জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন-২০১০* বাতিল করে বিতর্কিত *জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন-২০২৩* প্রণয়ন করে, যার মাধ্যমে জাতীয় পরিচয়পত্রের নিবন্ধন কার্যক্রম বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে সুরক্ষা সেবা বিভাগে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ ব্যাপারে পরে আলোকপাত করা হয়েছে।

এনআইডি অনুবিভাগ (NID Wing)

এনআইডি উইং (NIDW) নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অধীনে একটি অনুবিভাগ যার অধীনে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৭১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছে। NIDW তিনটি শাখা, সাতটি বিভাগ এবং নয়টি ইউনিটে ভাগ করা হয়েছে, যেগুলোর প্রতিটির নির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। NIDW-এর প্রধান দায়িত্বগুলো নিম্নরূপ:

- নাগরিকদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা এবং প্রতিটি নাগরিকের জন্য উপজাত হিসেবে জাতীয় পরিচয় তথ্য ও জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) তৈরি করা।
- জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত থাকা।
- জাতীয় পরিচয় তথ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত এনআইডি ডাটাবেজ রক্ষণাবেক্ষণ এবং অনুমোদিত সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোকে পরিচয় যাচাইকরণ পরিষেবা প্রদান-সহ সকল সম্পর্কিত কার্যক্রম তদারকি করা।
- তথ্য সংগ্রহ, যাচাইকরণ এবং চলমান তথ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া সহজতর করতে কেন্দ্রীয়, জেলা, উপজেলা এবং মাঠ পর্যায়ে আইসিটি অবকাঠামো স্থাপন করা।
- ভোটার নিবন্ধন এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা, যার মধ্যে নিবন্ধন কেন্দ্রে উপস্থিতি অন্তর্ভুক্ত।

আইডেন্টিটির জীবনচক্র

এই সেকশনে আমরা বাংলাদেশের এনআইডি সিস্টেমের আইডেন্টিটি জীবন চক্রের বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

ভোটার তালিকা এবং NID রেজিস্ট্রেশন

বাংলাদেশে এনআইডি সিস্টেমে রেজিস্ট্রেশন আলাদাভাবে হয় না। বরং ছবিসহ ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এনআইডি তথ্য এনআইডি ডেটাবেজে সন্নিবেশিত হয়। এই ছবিসহ ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম দুই ভাবে সম্পন্ন হয়:

- **ভোটার হালনাগাদ কার্যক্রমের মাধ্যমে:** নির্ধারিত সময়ে নিবন্ধন ফর্ম-২ নির্বাচন কমিশনের প্রধান কার্যালয় হতে প্রিন্ট করে উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসে প্রেরণ করা হয়। এই নিবন্ধন ফর্ম পরে তথ্য সংগ্রহকারী সুপারভাইজারদের মাঝে সরবরাহ করা হয়। সুপারভাইজারগণ তথ্য সংগ্রহকারীকে এই নিবন্ধন ফর্ম সরবরাহ করেন। এর পরে তথ্য সংগ্রহকারী ভোটারদের বাড়িতে বাড়িতে যান এবং ভোটারকে দিয়ে ফর্ম-২ পূরণ করান। তারপরে নিবন্ধনের তারিখ ও স্থান উল্লেখপূর্বক একটি

ভোটার স্লিপ প্রদান করেন। তথ্য সংগ্রহকারী কর্তৃক বিভিন্ন ভোটারের পূরণকৃত এবং খালি ফর্মসমূহ সুপারভাইজারের কাছে জমা দেন এবং তা পরে উপজেলা নির্বাচন অফিসারের নিকট জমা দেওয়া হয়। পরবর্তীতে উপজেলা নির্বাচন অফিসার কর্তৃক উক্ত ফর্মসমূহ যাচাই বাছাই করে নিবন্ধন স্থানে প্রেরণ করা হয়। নির্ধারিত তারিখে নিবন্ধন স্থানে ভোটাররা আগমন করেন এবং ডাটা এন্ট্রি অপারেটর কর্তৃক ফর্ম-২ মোতাবেক উপস্থিত ভোটারদের ডেমোগ্রাফিক এবং বায়োমেট্রিক তথ্য লাইসেন্সকৃত ল্যাপটপে সন্নিবেশ করা হয়। দিনশেষে নিবন্ধনকৃত সকল ভোটার ডাটা টিম লিডারের মাধ্যমে উপজেলা সার্ভারে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তী ধাপে প্রুফ রিডার কর্তৃক সকল ভোটারদের ডাটা ফর্ম-২ মোতাবেক প্রুফ রিডিং সম্পন্ন হয়। এর পরে উপজেলা নির্বাচন অফিসার কর্তৃক ভোটার ডাটা উপজেলার স্থানীয় সার্ভার হতে নির্বাচন কমিশনের সেন্ট্রাল সার্ভারে ভিপিএন কানেকশনের মাধ্যমে আপলোড করা হয়। এরপরে নির্বাচন কমিশনের সেন্ট্রাল সার্ভারে রক্ষিত প্রায় ১৩ কোটি ভোটারের বায়োমেট্রিক তথ্যের বিপরীতে AFIS (Automated Fingerprint Identification System) যাচাই সম্পন্ন করতে হয়। AFIS যাচাইয়ে সফলতার (ইতোপূর্বে ভোটার না হয়ে থাকলে) প্রেক্ষিতে NID নম্বর generation সম্পন্ন হয় এবং ভোটারকে এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত করা হয়।

- **উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসে স্বশরীরে হাজির হয়েঃ** ভোটার https://services.nidw.gov.bd ওয়েবসাইটে ভিজিট করে নিবন্ধন ফর্ম-২ অনলাইনে পূরণ ও প্রিন্ট করেন। ভোটার প্রিন্টেড ফর্ম এবং আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসে যান এবং উপজেলা নির্বাচন অফিসারের নিকট ফর্মটি জমা দেন। উপজেলা নির্বাচন অফিসার ফর্মটি যাচাই করেন এবং ভোটার হওয়ার যোগ্যতার ভিত্তিতে ইলেক্ট্রনিক অনুমোদন প্রদান করেন। এর পরে ভোটার বায়োমেট্রিক তথ্য প্রদান করেন, যা লাইসেন্সকৃত ল্যাপটপে সন্নিবেশ করা হয়। পরবর্তী ধাপে প্রুফ রিডার কর্তৃক সকল ভোটারদের ডাটা ফর্ম-২ মোতাবেক প্রুফ রিডিং সম্পন্ন হয়। এর পরে উপজেলা নির্বাচন অফিসার কর্তৃক ভোটার ডাটা উপজেলার স্থানীয় সার্ভার হতে নির্বাচন কমিশনের সেন্ট্রাল সার্ভারে ভিপিএন কানেকশনের মাধ্যমে আপলোড করা হয়। নির্বাচন কমিশনের সেন্ট্রাল সার্ভারে রক্ষিত প্রায় ১৩ কোটি ভোটারের বায়োমেট্রিক তথ্যের বিপরীতে AFIS যাচাই সম্পন্ন করতে হয়। AFIS যাচাইয়ে সফলতার (ইতোপূর্বে ভোটার না হয়ে থাকলে) প্রেক্ষিতে NID নম্বর generation সম্পন্ন হয় এবং ভোটারকে এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত করা হয়।

স্মার্ট এনআইডি কার্ড ইস্যু করা

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন দেশের সকল নাগরিককে প্রথমবার বিনামূল্যে স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করে থাকে। তবে কোনো নাগরিকের স্মার্ট কার্ড হারিয়ে গেলে বা তথ্য সংশোধনজনিত কারণে স্মার্ট কার্ড পুনঃমুদ্রণের প্রয়োজন হলে ফি সহ আবেদন দাখিল করতে হয়।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন উপজেলা/থানাভিত্তিক সকল নাগরিকের স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র মুদ্রণপূর্বক মাঠ পর্যায়ে উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসে প্রেরণ করে থাকে। পরবর্তীতে উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সমন্বয় করে তারিখ নির্ধারণকরত ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যায়ে বিতরণ কেন্দ্র হতে স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র বিতরণ করে থাকে। স্মার্ট কার্ড বিতরণ কার্যক্রমের শুরুর প্রথম পর্যায়ে দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন ও জেলার সদর উপজেলাগুলোতে স্মার্ট কার্ড মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য উপজেলার স্মার্ট কার্ড মুদ্রণ ও বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উপজেলা/থানাভিত্তিক হিসেবে সারা দেশে ৫১৯টি উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসের অধীন এলাকার মধ্যে ৩৫২টি উপজেলা/থানায় বিতরণ কার্যক্রম শেষ হয়েছে। এছাড়া ২১টি উপজেলায় স্মার্ট কার্ড বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং ২০টি উপজেলায় বিতরণের অপেক্ষায় রয়েছে।

ব্যবহার

এনআইডি কার্ড বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত একটি ক্রেডেনশিয়াল। বাংলাদেশের কোনো নাগরিক বিভিন্ন ধরনের সেবা, যেমন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা, মোবাইল সিম কার্ড কেনা, বিভিন্ন সরকারি নাগরিক সেবা গ্রহণ করা ও এক্সেস করার সময় তাদের আইডেন্টিটি যাচাইকরণের জন্য এনআইডি কার্ড ব্যবহার করতে পারেন। এই প্রক্রিয়া সহজতর করতে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ১৮৩টি সংস্থার সঙ্গে চুক্তি স্থাপন করেছে, যা টেবিল ১-এ উপস্থাপন করা হয়েছে। এই চুক্তির অধীনে, এই সংস্থাগুলো নির্বাচন কমিশন দ্বারা প্রদত্ত এপিআই ব্যবহার করে একজন নাগরিক দ্বারা প্রদত্ত তথ্য এবং বায়োমেট্রিক তথ্য সিকিউরলি অ্যাক্সেস এবং যাচাই করতে পারে।

টেবিল ১: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বিভিন্ন চুক্তিকৃত সংস্থা*

প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
সরকারি প্রতিষ্ঠান	৬৫
মোবাইল কোম্পানি	০৬
বাণিজ্যিক ব্যাংক	৬৩
আর্থিক প্রতিষ্ঠান	২৮
মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানি	০৯
বীমা প্রতিষ্ঠান	০৫
অন্যান্য	০৭
সর্বমোট	১৮৩

*উৎস: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

ব্যবস্থাপনা

এনআইডি সিস্টেমের ব্যবহারকারীদের নির্বাচন কমিশন দ্বারা তৈরিকৃত একটি ওয়েব পোর্টাল অ্যাক্সেস করার ব্যবস্থা রয়েছে, যার মাধ্যমে তারা তাদের কিছু এনআইডি তথ্য দেখতে পারেন। ব্যবহারকারীদেরকে authenticate করার জন্য নির্বাচন কমিশন একটি মোবাইল ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন প্রকাশ করেছে, যা অ্যাডভান্সড প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যবহারকারীদের লাইভ যাচাই (live verification) করতে পারে। যাচাইকরণের পরে ব্যবহারকারীরা ওয়েব পোর্টালের মধ্যে একটি ড্যাশবোর্ডে এক্সেস পান, যা তাদেরকে তাদের এনআইডি তথ্য থেকে কিছু তথ্য দেখার সুযোগ করে দেয়। যদি ব্যবহারকারীরা কোনো ভুল তথ্য শনাক্ত করেন, তবে তারা প্রযোজ্য ফি প্রদান করে এবং সঠিক তথ্য প্রদান করে একটি আপডেটের অনুরোধ করতে পারেন। সঠিক তথ্যের যাচাইকরণের জন্য ব্যবহারকারীদের কিছু সহায়ক সরকারি ডকুমেন্ট/সার্টিফিকেট জমা দিতে হয়, যেমন এসএসসি সার্টিফিকেট। ব্যবহারকারীরা এমনকি তাদের এনআইডি কার্ডের পিডিএফ কপিও ডাউনলোড করতে পারেন এবং বিভিন্ন পরিষেবা অ্যাক্সেস করতে এটি ব্যবহার করতে পারেন। এই ডাউনলোডকৃত এনআইডি কার্ড স্মার্ট এনআইডি কার্ডের বিকল্প হিসেবে কাজ করে।

রিটায়ারমেন্ট

একজন নাগরিক মৃত্যুবরণ করার পরে তার এনআইডি তথ্যের রিটায়ার করানোর লক্ষ্যে তথ্যের স্ট্যাটাস হিসেবে 'Deleted' যোগ করা হয়। এর পরে সেই নাগরিকের কোনো তথ্য এপিআই ব্যবহার করে আর যাচাই করা যায় না। তবে সেই মৃত নাগরিকের তথ্য ডেটাবেস থেকে ডিলিট করা হয় না।

টেকনোলজি এবং স্ট্যান্ডার্ড

বর্তমান এনআইডি সিস্টেম এনআইডি তথ্য এবং এনআইডি কার্ডের নিরাপদ ব্যবস্থাপনার জন্য Public Key Infrastructure (PKI) এবং Hardware Security Module (HSM) ব্যবহার করে। এনআইডি সার্ভারে রক্ষিত তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নাগরিকদের ডেমোগ্রাফিক তথ্যের ডিজিটাল স্বাক্ষর তৈরি করতে এবং আঙুলের ছাপ এনক্রিপ্ট করতে PKI এবং HSM ব্যবহৃত হয়।

একইসঙ্গে স্মার্ট কার্ডের চিপের কার্যক্রম নিরাপদে পরিচালনা করতে PKI এবং HSM ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে নিরাপদ এবং নিয়ন্ত্রিত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য চিপ আনলক করতে ট্রান্সপোর্ট কী, চিপে তথ্য লেখার জন্য write কী এবং চিপ থেকে তথ্য পুনরুদ্ধার করতে read কী ব্যবহৃত হয়।

তবে এনআইডি স্মার্ট কার্ড রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আইএসও/আইইসি ৭৮১০, আইএসও ৭৮১৬ এবং আইসিএও ৯৩০৩ এবং বায়োমেট্রিক তথ্যের জন্য আইএসও/আইইসি ১৯৭৯৪-এর মতো বিশ্বে বহুল ব্যবহৃত সুপ্রতিষ্ঠিত কোনো স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার করা হয় না।

কার্ড মুদ্রণ ব্যবস্থার জন্য ব্যাকএন্ড ডাটাবেজ হিসেবে ওরাকল আরএসি ডাটাবেজ ব্যবহৃত হয়।

সিস্টেমের সিকিউরিটি এবং প্রাইভেসি

এরপরে আমরা সংক্ষেপে এনআইডি সিস্টেমের সিকিউরিটি এবং প্রাইভেসির বিশ্লেষণ উপস্থাপন করছি।

সিকিউরিটি (Security)

বর্তমান সিস্টেমে বেশ কিছু নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

- **ডাটাবেজ সিকিউরিটি:** এনআইডি সিস্টেম Oracle ডাটাবেজের শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থা ব্যবহার করে, যার মধ্যে অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম রয়েছে।
- **মাল্টি-টিয়ার অ্যাপ্লিকেশন নিরাপত্তা:** এনআইডি সিস্টেম HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)/TLS (Transport Layer Security) এর মতো নিরাপদ যোগাযোগ প্রোটোকল ব্যবহার করে এবং স্ট্রং ফায়ারওয়াল সহ VPN (Virtual Private Network) ব্যবহার করে বিভিন্ন স্তরের সিকিউরিটি নিশ্চিত করে।
- **ফিজিকাল নিরাপত্তা:** এনআইডি সিস্টেমের স্মার্ট কার্ড মুদ্রণ ব্যবস্থায় অননুমোদিত কারো প্রবেশ রেস্ট্রিকটেড।
- **চিপ সিকিউরিটি:** এনআইডি সিস্টেমে অননুমোদিত প্রতিলিপি বা প্রবেশ রোধ করতে HSM ব্যবহার করে ট্রান্সপোর্ট, রিডিং এবং রাইটিং কীগুলো সুরক্ষিত করে।

উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলোর পাশাপাশি আরও অতিরিক্ত সিকিউরিটি সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যেগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো।

- গোপনীয়তা **(Confidentiality):**
  - তথ্য এনক্রিপশন: এনআইডি সিস্টেম ট্রানজিটে বায়োমেট্রিক এবং ডেমোগ্রাফিক তথ্য ট্রান্সফারের সময় এনক্রিপ্ট করতে এবং ডিজিটাল স্বাক্ষর তৈরি করতে PKI ব্যবহার করে।
  - কী ব্যবস্থাপনা: এনআইডি সিস্টেম এনক্রিপশন কী নিরাপদে ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ করতে HSM ব্যবহার করে, যার ফলে কী হাতছাড়া বা ফাঁস হওয়ার ঝুঁকি কমে।
  - অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ: এনআইডি সিস্টেম রোল-ভিত্তিক অ্যাক্সেস কন্ট্রোল (Role Based Access Control, RBAC) ব্যবহার করে, যার ফলে শুধু অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ সংবেদনশীল তথ্যে প্রবেশাধিকার পায়।
- **অখণ্ডতা (Integrity):** এনআইডি সিস্টেম তথ্য প্রসেসিং কিংবা সংরক্ষণের সময় বিভিন্ন হ্যাশিং অ্যালগরিদম যেমন, SHA-256, SHA-256withRSA ব্যবহার করে, যার মাধ্যমে কোনো তথ্য কোনো প্রকার টেম্পার যে করা হয়নি তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।
- প্রাপ্যতা **(Availability):**
  - রিডান্ডেন্সি: এনআইডি সিস্টেম হার্ডওয়্যার বা সফ্‌টওয়্যার ব্যর্থতার সময় (during failure) অপারেশনের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে মুদ্রণ ও সংরক্ষণের জন্য রিডানডেন্ট সিস্টেমের ওপর নির্ভর করে।
  - অ্যাক্সেস রিসিলিয়েন্স: এনআইডি সিস্টেম অ্যাপ্লিকেশনের জন্য লোড ব্যালেন্সিং এবং ক্লাস্টারিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডাউনটাইম কমায়।
- বিশ্বাসযোগ্যতা/প্রামাণ্যতা **(Authenticity):**
  - ডিজিটাল স্বাক্ষর: এনআইডি সিস্টেম যাচাইকরণ প্রক্রিয়ার সময় এর প্রামাণ্যতা নিশ্চিত করতে NID কার্ডের তথ্যের জন্য ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার করে।
  - চিপ নিরাপত্তা: এনআইডি সিস্টেম রিডিং ও রাইটিং অপারেশনের জন্য ইউনিক আইডেন্টিফাইয়ার এবং ক্রিপ্টোগ্রাফিক কী সহ ভেন্ডর-লক চিপ ব্যবহার করে।
- জবাবদিহিতা **(Accountability):**
  - অপারেটর ট্র্যাকিং: এনআইডি সিস্টেম অপারেটরদের ইউনিক ক্রেডেনশিয়াল বরাদ্দ করে এবং সিস্টেমের সঙ্গে সমস্ত ইন্টারঅ্যাকশন লগ করে।
  - চিপ অ্যাক্সেস লগ: এনআইডি সিস্টেম ট্রেসেবিলিটি নিশ্চিত করতে রিডিং এবং রাইটিং অপারেশন সহ চিপে প্রতিটি অ্যাক্সেস রেকর্ড করে।

- **অনস্বীকার্যতা (Non-repudiation):**
    - ডিজিটাল স্বাক্ষর: এনআইডি সিস্টেমে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অপারেশনে ডিজিটালি স্বাক্ষর ব্যবহার করে যার মাধ্যমে অনস্বীকার্যতা (Non-repudiation) নিশ্চিত হয়।
    - লগিং: সিস্টেমটি প্রতিটি কার্যক্রমের লগ সংরক্ষণ করে যার মাধ্যমে অডিট ট্রেইল নিশ্চিত করা যায়। তবে এই লগিং সিস্টেম কি immutable কিনা তা নিশ্চিত নয়।

গোপনীয়তা (Privacy)

এনআইডি সিস্টেমে ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তার বিভিন্ন বৈশিষ্টের ব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি।

এনআইডি তথ্য সুরক্ষা সেবা বিভাগে স্থানান্তরকরণ প্রক্রিয়া

১৭ মে ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক-১০ স্বাক্ষরিত চিঠির মাধ্যমে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন কার্যক্রম নির্বাচন কমিশনের পরিবর্তে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার এবং নির্বাচন কমিশনের মধ্যে অনেক কয়েকবার চিঠি আদান-প্রদান এবং বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন কার্যক্রম এখন নির্বাচন কমিশনের অধীনে আছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আইডেন্টিটি সিস্টেম এবং আইডেন্টিটি যাচাইকরণ পদ্ধতির পর্যালোচনা

এই বিভাগে আমরা বিশ্বের তিনটি দেশের আইডেন্টিটি সিস্টেম আমরা কিছু বৈশিষ্টের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করেছি। দেশ তিনটি হলো এস্তোনিয়া, ভারত এবং পাকিস্তান। এই দেশগুলোতে ব্যবহৃত আইডেন্টিটি সিস্টেমগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ টেবিল ২-এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

টেবিল ২: ভারত, পাকিস্তান এবং এস্তোনিয়ার আইডেন্টিটি সিস্টেমের তুলনামূলক পর্যালোচনা[৪৯]

বৈশিষ্ট্যসমূহ	ভারত	পাকিস্তান	এস্তোনিয়া
ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ	Unique Identification Authority of India (UIDAI)	National Database and Registration Authority (NADRA)	Police and Border Guard Board
প্রাপ্যতার যোগ্যতা	ভারতে বসবাসকারী ভারত সহ অন্য যেকোনো দেশের নাগরিক যারা ১৮০ দিনের বেশি বৈধভাবে ভারতে বসবাস করেছেন	পাকিস্তানের নাগরিক এবং অন্যান্য দেশের নাগরিক যারা বৈধভাবে পাকিস্তানের বসবাস করেন	এস্তোনিয়ার এবং ইইউ এর নাগরিক যারা এস্তোনিয়াতে বসবাস করছেন
নিবন্ধনের রিকোয়ারমেন্ট	ন্যূনতম বায়োগ্রাফিকাল তথ্য, আঙুলের ছাপ, আইরিস স্ক্যান এবং ছবি	এই সম্পর্কিত তথ্য অনলাইনে পাবলিক ডোমেইনে পাওয়া যায়নি	এই সম্পর্কিত তথ্য অনলাইনে পাবলিক ডোমেইনে পাওয়া যায়নি
NID নম্বরের ফরম্যাট	১২ ডিজিটের ইউনিক আইডেন্টিটি নম্বরকে (যা আধার নম্বর হিসেবেও পরিচিত) ভিত্তি ধরে ফিজিকাল আধার আইডি কার্ড	স্মার্ট ফিজিকাল আইডি কার্ড	স্মার্ট ফিজিকাল আইডি কার্ড। মোবাইলভিত্তিক ইলেকট্রনিক আইডি কার্ডের অপশন রয়েছে
অথেন্টিকেশনের পদ্ধতি	আধার নম্বর ব্যবহার করে বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশন	এই সম্পর্কিত তথ্য অনলাইনে পাবলিক ডোমেইনে পাওয়া যায়নি	আইডি কার্ডের সঙ্গে পিন কিংবা ডিজিটাল সিগনেচার ব্যবহার করে অথেন্টিকেশন
স্ট্যান্ডার্ডস	এই সম্পর্কিত তথ্য অনলাইনে পাবলিক ডোমেইনে পাওয়া যায়নি	এই সম্পর্কিত তথ্য অনলাইনে পাবলিক ডোমেইনে পাওয়া যায়নি	আইএসও/আইইসি ৭৮১০, আইএসও ৭৮১৬

[৪৯] Mittal, Anita. 2022. Catalog of Technical Standards for Digital Identification Systems, Washington, DC: World Bank License: Creative Commons Attribution 3.0 IGO (CC BY 3.0 IGO)

আধুনিক জাতীয় আইডেন্টিটি সিস্টেম

এই সেকশনে আমরা বাংলাদেশের জন্য একটি আধুনিক জাতীয় পরিচয় ব্যবস্থার রূপরেখা উপস্থাপন করছি। এই লক্ষ্যে আমরা প্রথমে বর্তমান সিস্টেমের সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

বিদ্যমান সিস্টেমের সমস্যাসমূহ

ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত আইডেন্টিটি মডেলগুলোতে, যেমন সেন্ট্রালাইজড মডেল এবং ফেডারেটেড মডেল, কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে যেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

- সেন্ট্রালাইজড মডেলে অন্য পক্ষের সঙ্গে আইডেন্টিটি তথ্য শেয়ার করার কোনো স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতি নেই। যদিও ফেডারেটেড মডেলে বিশ্বস্ত (trusted) অংশীদারদের সঙ্গে সিকিউরলি তথ্য শেয়ার করা যায়, তবে এটির স্কেলেবিলিটির সমস্যা এবং ব্যবস্থাপনাগত চ্যালেঞ্জ রয়েছে, বিশেষ করে যখন ফেডারেশনের সাইজ অনেক বড় হয়ে যায়।
- এই মডেলগুলোর কোনোটিই ব্যক্তিগত গোপনীয়তা-বান্ধব (privacy-friendly) নয়, কারণ এগুলো ব্যবহারের সময় ব্যবহারকারীদের তাদের নিজেদের আইডেন্টিটি তথ্যের উপরে হয় কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না, অথবা থাকলেও খুবই অল্প কন্ট্রোল থাকে। এজন্য এই মডেলগুলোকে প্রায়শই provider-centric মডেল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ এগুলোর মূল ফোকাস হল (পরিষেবা প্রদানকারী) সংস্থাগুলোকে তাদের ব্যবহারকারীর আইডেন্টিটি ম্যানেজ করার ব্যবস্থা করা। তাই এই মডেলগুলোতে ব্যবহারকারীদের প্রয়োজন এবং চাহিদা প্রায়শই উপেক্ষা করা হয়।

বাংলাদেশের বর্তমান আইডেন্টিটি সিস্টেম একটি সেন্ট্রালাইজড মডেলে পরিচালিত হয়, যার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই পূর্বে উল্লিখিত সীমাবদ্ধতাগুলো রয়েছে। তদুপরি বিদ্যমান ব্যবস্থায় আরও কিছু অতিরিক্ত সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেগুলো নিচে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হলো।

- বর্তমান ব্যবস্থায় ব্যবহারকারীর আইডেন্টিটি তথ্য এক্সেস কিংবা শেয়ার করার আগে সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারীর কাছ থেকে সম্মতি চাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। এই দুর্বলতা তৃতীয় পক্ষকে ব্যবহারকারীর অজ্ঞাতে বা সম্মতি ছাড়াই তাদের আইডেন্টিটি তথ্য এক্সেস কিংবা শেয়ারের সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমে আইডেন্টিটি তথ্যের অপব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করে। আইডেন্টিটির তথ্য এক্সেস কিংবা শেয়ারের আগে ব্যবহারকারীর অনুমতি (কনসেন্ট) নেওয়ার কোনো ব্যবস্থা থাকলে আইডেন্টিটির তথ্যে অননুমোদিত প্রবেশ কিছুটা হলেও রোধ করা সম্ভব হত।
- বর্তমান সিস্টেমের মধ্যে সংরক্ষিত আইডেন্টিটি তথ্য শক্তিশালী এনক্রিপশন কী ব্যবহার করে এনক্রিপ্ট করা হয়। তবে এই কীগুলো কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে থাকে। এই বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারীর অজ্ঞাতে এবং অনুমতি ছাড়াই আইডেন্টিটি তথ্যে অননুমোদিত প্রবেশকে সহজতর করে।
- বর্তমান সিস্টেমের মধ্যে একটি অডিট ট্রেইল আছে, তবে তা immutable না। কোনো immutable অডিট ট্রেইল ব্যতিরেকে অডিট ট্রেইলের সিকিউরিটি পুরোপুরি নিশ্চিত করা যায় না। তার উপরে ব্যবহারকারীদের অডিট ট্রেইলে কোনো প্রবেশাধিকার নেই, যার ফলে তাদের কোনো আইডেন্টিটি তথ্য তাদের অজ্ঞাতে ও সম্মতি ছাড়া অ্যাক্সেস করা হয়েছে কিনা তাদের পক্ষে তা বোঝার উপায় থাকে না।
- বর্তমানে জাতীয় পরিচয় তথ্য শুধু এনআইডি কার্ডের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করা হয়। স্মার্টফোনের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা বিবেচনা করে আইডেন্টিটি তথ্যের একটি আনুষঙ্গিক ডিজিটাল রিপ্রেজেন্টেশন প্রবর্তন করা খুবই দরকার, যা স্মার্টফোনে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা যেতে পারে।
- অনেক নাগরিক সেবা ডিজিটাইজ করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা অনলাইন পরিষেবায় চালু করেছে। বাংলাদেশের নাগরিকদের এই অনলাইন পরিষেবাগুলো অ্যাক্সেস করতে এই ওয়েবসাইটগুলোতে নিবন্ধন করতে এবং অ্যাকাউন্ট (আইডেন্টিটি) তৈরি করতে হয়। বারবার ভিন্ন ভিন্ন অনলাইন পরিষেবার জন্য এরকম আইডেন্টিটি তৈরি করা প্রতিটি নাগরিকের ওপর একটি বোঝাস্বরূপ, কেননা তাদেরকে এরকম একাধিক বিচ্ছিন্ন সিস্টেমে ছড়িয়ে থাকা বহু ডিজিটাল আইডেন্টিটি পরিচালনা করতে হয়। এছাড়াও এই সিস্টেমগুলোর মধ্যে কোনো আন্তঃপরিচালনযোগ্যতা এবং আন্তঃসংযোগ (interoperability and inter-connectivity) নেই। বর্তমান এনআইডি সিস্টেম 'এক নাগরিক, এক পরিচয়' ধারণা প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে, যার মাধ্যমে প্রতিটি ব্যবহারকারী তাদের জাতীয় পরিচয় ব্যবহার করে একাধিক নাগরিক সেবা অ্যাক্সেস করতে সক্ষম হবে। তবে, এর জন্য সকল নাগরিকের সিকিউরিটি এবং প্রাইভেসির সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

Self-sovereign Identity (সেল্ফ-সভরিন আইডেন্টিটি)

বিদ্যমান ব্যবস্থার সমস্যাগুলো দূর করতে এবং ব্যবহারকারীদের আইডেন্টিটি তথ্যের উপর ক্ষমতায়ন (empower) করতে, একটি নতুন ব্যবহারকারী-কেন্দ্রিক পরিচয় মডেলের আবির্ভাব ঘটেছে। উদ্ভূত এই মডেলটি সেল্ফ-সভরিন আইডেন্টিটি (Self-sovereign Identity) বা এসএসআই (SSI) নামে পরিচিত।

SSI মডেলের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো কোন ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিগত তথ্যের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে ব্যক্তিকে ক্ষমতায়ন করা। এটি ডিজিটাল আইডেন্টিটি পরিচালনায় একটি প্যারাডাইম শিফট হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা যেকোনো পরিচয়ের সম্পূর্ণ জীবনচক্র জুড়ে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার ক্ষমতা রাখে। SSI এর এই ভিশনকে বাস্তবে রূপ দিতে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (www) কনসোর্টিয়াম (W3C) বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি ডেভেলপ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে ডিসেন্ট্রালাইজড আইডেন্টিফায়ার্স[৫০] (Decentralized Identifiers বা DIDs) এবং ভেরিফায়েবল ক্রেডেনশিয়ালস[৫১] (Verifiable Credentials বা VCs), যেগুলো SSI-এর মৌলিক বিল্ডিং ব্লক হিসেবে কাজ করে।

SSI-এর মধ্যে তিনটি ভিন্ন অ্যাক্টর রয়েছে: হোল্ডার (ব্যবহারকারী, যেমন একটি দেশের নাগরিক), ইস্যুকারী (issuer) এবং যাচাইকারী (verifier)। প্রতিটা DID, SSI হোল্ডারের ক্রিপ্টোগ্রাফিক পাবলিক কী-এর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, যার মাধ্যমে সেই ব্যবহারকারীকে ইউনিকলি শনাক্ত করা যায়। অন্যদিকে VC হল একজন ইস্যুকারী দ্বারা একজন হোল্ডার সম্পর্কে একটি ক্রিপ্টোগ্রাফিকভাবে স্বাক্ষরিত স্টেটমেন্ট। একটি VC আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত যেকোনো ধরনের যাচাইযোগ্য নথি (verifiable document) কে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে, যেমন জাতীয় পরিচয়পত্র, শিক্ষাগত সার্টিফিকেট, ড্রাইভিং এবং অন্যান্য ধরনের লাইসেন্স এমনকি পাসপোর্ট। সাধারণত ইস্যুকারী এমন কোনো সংস্থাকে প্রতিনিধিত্ব করে যারা ব্যবহারকারীদের জন্য আইডেন্টিটি তথ্য পরিচালনা করে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের এনআইডি উইং-কে একটি ইস্যুকারী হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। একইভাবে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেও ইস্যুকারী হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। যেহেতু প্রতিটি VC কোনো ইস্যুকারী দ্বারা স্বাক্ষরিত, VC-এর প্রামাণ্যতা (authenticity) যেকোনো যাচাইকারী দ্বারা সহজেই যাচাই করা যেতে পারে। যাচাইকরণের সময় যাচাইকারী ওই ইস্যুকারীর সংশ্লিষ্ট DID পুনরুদ্ধার করেন এবং DID-এর সংশ্লিষ্ট পাবলিক কী ব্যবহার করে স্বাক্ষর যাচাই করেন। সুতরাং একজন যাচাইকারী এমন কোনো সংস্থাকে প্রতিনিধিত্ব করে যারা বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করে এবং যার জন্য ব্যবহারকারীর পরিচয় যাচাই করার প্রয়োজন হয়। অনেক সেনসিটিভ পরিষেবার জন্য যাচাইকারীদের যেকোনো ব্যবহারকারীর এনআইডি তথ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। হোল্ডারকে একজন ইস্যুকারী থেকে প্রাপ্ত VC-এর মালিক হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। হোল্ডার এইভাবে বিভিন্ন ইস্যুকারীর থেকে প্রাপ্ত VC-গুলোকে তার ডিজিটাল ওয়ালেটে সংরক্ষণ করেন। এই ডিজিটাল ওয়ালেট ব্যবহার করতে মূলত একটি স্মার্টফোন দরকার হয়। হোল্ডাররা কোনো অনলাইন পরিষেবা এক্সেস করার জন্য ডিজিটাল ওয়ালেটে সংরক্ষিত এক বা একাধিক VC কোনো যাচাইকারীর কাছে উপস্থাপন করেন। এই প্রেক্ষাপটে ব্লকচেইন DID ও তার সম্পর্কিত DID ডকুমেন্ট সংরক্ষণের জন্য একটি যাচাইযোগ্য তথ্য রেজিস্ট্রি (Verifiable Data Registry বা VDR) হিসেবে কাজ করে। যদিও DID বা তার সম্পর্কিত DID ডকুমেন্ট ব্লকচেইন ছাড়া কোনো ডাটাবেসেও সংরক্ষণ করা যায়, তথাপি ব্লকচেইনের অপরিবর্তনীয়তা এবং বিকেন্দ্রীকৃত (immutability এবং decentralisation) বৈশিষ্ট্যের কারণে VDR হিসেবে ব্লকচেইন বহুল ব্যবহৃত হয়। কেউ যদি ডাটাবেজ এই ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে চান সেইক্ষেত্রে এই অপরিবর্তনীয়তা এবং বিকেন্দ্রীকৃত বৈশিষ্ট্য নিশ্চিত করার জন্য অতিরিক্ত বেশ কিছু ব্যবস্থা নিতে হয়। হোল্ডার, ইস্যুকারী এবং যাচাইকারীদের মধ্যে নিরাপদ এবং এই ইউনিক ইন্টারঅ্যাকশন সহজতর করতে একটি SSI কানেকশন স্থাপন করা হয়। এই তিনটি সত্তার মধ্যে এই ইন্টারঅ্যাকশনগুলোর একটি গ্রাফিকাল রিপ্রেজেন্টেশন, যা SSI trust triangle নামেও পরিচিত, চিত্র ১-এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

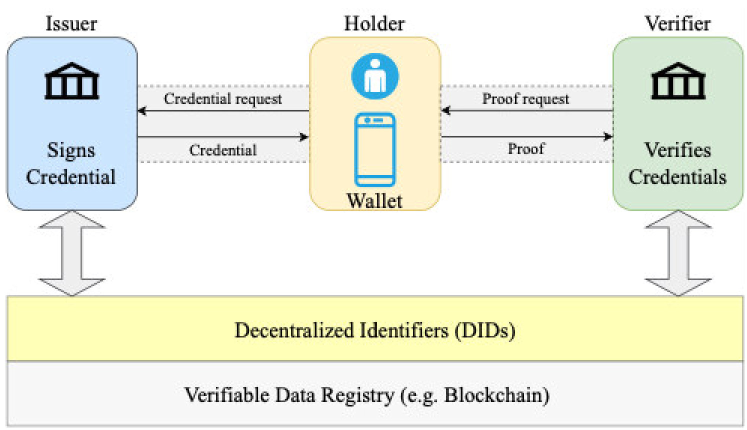

চিত্র ১: SSI এর trust triangle[৫২]

[50] Reed, et al. "Decentralized identifiers (dids) v1. 0." *Draft Community Group Report* (2020).
[51] "Verifiable Credentials Data Model v2.0", Accessed: 01-12-2024. [Online]. Available: https://www.w3.org/TR/vc-data-model-2.0/
[52] Ferdous et al. "In search of self-sovereign identity leveraging blockchain technology." *IEEE access* 7 (2019): 103059-103079.

SSI-এর কিছু প্রধান সুবিধা নিচে আলোচনা করা হলো:

- **গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তা:**
  - ব্যবহারকারীদের তাদের আইডেন্টিটি তথ্যের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে, কোন আইডেন্টিটি তথ্য কার সঙ্গে শেয়ার করবে ব্যবহারকারীরা তা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
  - আইডেন্টিটি চুরি এবং প্রতারণার বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করে।
- **ব্যক্তির ক্ষমতায়ন:**
  - ব্যবহারকারীরা তাদের ডিজিটাল পরিচয়ের মালিক এবং নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে।
  - ব্যক্তিগত তথ্য পরিচালনায় স্বায়ত্তশাসন এবং আত্মনির্ভরতা নিশ্চিত হয়।
  - ডিজিটাল অর্থনীতিতে আরও পূর্ণভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়।
- **দক্ষতা এবং সুবিধা:**
  - পরিচয় যাচাই এবং ক্রেডেনশিয়াল শেয়ার একটি স্ট্যান্ডার্ড প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করা যায়।
  - বিভিন্ন সিস্টেম এবং সংস্থার মধ্যে বৃহত্তর আন্তঃপরিচালনযোগ্যতার (interoperability) সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়।
- **ট্রাস্ট এবং স্বচ্ছতা:**
  - ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার এবং শেয়ার করার ব্যাপারে স্বচ্ছতা প্রদান করে।
  - অ্যাডভান্সড প্রাইভেসি এবং সিকিউরিটির কারণে ব্যক্তি এবং সংস্থার মধ্যে বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।
  - আরও ন্যায্য এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল সমাজ গড়ে তোলার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

কেস স্টাডি

- **ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন:** ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) সেল্ফ-সভরিন আইডেন্টিটি (এসএসআই) গ্রহণকারী সরকার হিসেবে একটি অগ্রণী উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। ইইউ এর ইউরোপিয়ান সেল্ফ-সভরিন আইডেন্টিটি ফ্রেমওয়ার্ক[৫৩] (ESSIF) ইইউ-এর মধ্যে একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, যার লক্ষ্য এর সদস্য দেশগুলোতে ডিজিটাল পরিচয় ব্যবস্থাপনায় বিপ্লব নিয়ে আসা। ESSIF প্রবর্তনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো নাগরিকদের তাদের আইডেন্টিটির উপরে ক্ষমতায়ন করা এবং তাদের আইডেন্টিটি তথ্যের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রদান করা। এটি সমস্ত ইইউ দেশের মধ্যে আন্তঃপরিচালনযোগ্যতা নিশ্চিত করবে এবং এই দেশগুলো থেকে পরিষেবা অ্যাক্সেস করার জন্য একটি সিমলেস (seamless) অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। ESSIF বৃহত্তর ইউরোপীয় ব্লকচেইন সার্ভিস ইনফ্রাস্ট্রাকচার (European Blockchain Service Infrastructure বা EBSI) প্রকল্পের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা ব্যবহার করে ইইউ-ব্যাপী আন্ত-বর্ডার সরকারি পরিষেবা প্রদান করা হয়। এর ফলে কোনো এক ইইউ দেশের নাগরিক নির্দিষ্ট নিয়ম ও প্রবিধান মেনে অন্য ইইউ দেশের সরকারি পরিষেবা অ্যাক্সেস করতে পারেন। ESSIF SSI-এ তিনজন অ্যাক্টর রয়েছে: ব্যবহারকারী (হোল্ডার), ইস্যুকারী এবং যাচাইকারী। হোল্ডার স্মার্টফোনের ডিজিটাল ওয়ালেটে তার জন্য বিভিন্ন ইস্যুকারী দ্বারা জারি করা VC সংরক্ষণ করেন। ESSIF EBSI-কে VDR হিসেবে ব্যবহার করে। যার ফলে ESSIF-এর অধীনে তৈরিকৃত DID এবং VC-এর অন্যান্য মেটাডেটার অপরিবর্তনীয়তা (immutability), তথ্যের উৎপত্তি (data provenance) এবং তথ্যের প্রাপ্যতা (data availability) নিশ্চিত করা যায়। ESSIF-এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো এটির গভর্নেন্স এবং ট্রাস্ট ফ্রেমওয়ার্ক যার মাধ্যমে ইইউ এর মধ্যে কোনো দেশের কোন ইস্যুকারীরা ট্রাস্টেড বলে বিবেচিত হবে তা নিশ্চিত করে এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের কাছে ট্রাস্টেড ভিসি শেয়ার করতে পারে।
- **ভুটান:** ভুটানের জাতীয় ডিজিটাল আইডেন্টিটি সিস্টেম একটি জাতীয় ডিজিটাল আইডেন্টিটি অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এটি ভুটানের জাতীয় ডিজিটাল পরিচয় আইন ২০২৩-এর মাধ্যমে আইনত কার্যকর করা হয়েছে। এই অবকাঠামো একটি বিকেন্দ্রীভূত (decentralised) পাবলিক কী ইনফ্রাস্ট্রাকচার (ডিপিকেআই) এবং সেল্ফ-সভরিন আইডেন্টিটি (SSI) নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এটির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তিদের তাদের আইডেন্টিটির উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রদান করা, যার মাধ্যমে তারা নিরাপদে তাদের ডিজিটাল ক্রেডেনশিয়াল ম্যানেজ ও শেয়ার করতে সক্ষম হবেন।

[৫৩] Du Seuil et al. "European Self Sovereign identity framework." 2019.

এই ব্যবস্থায় তিন এসএসআই অ্যাক্টর রয়েছে: হোল্ডার (নাগরিক), ইস্যুকারী এবং যাচাইকারী। এছাড়াও, অবকাঠামোতে ট্রাস্ট সার্ভিস প্রদানকারীদের ধারণা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে সার্টিফিকেশন সার্ভিস প্রদানকারী এবং ট্রাস্ট রেজিস্ট্রি। এই রেজিস্ট্রিগুলো বিশ্বস্ত সংস্থাগুলোর একটি তালিকা রক্ষণাবেক্ষণ করবে, যেখানে বিভিন্ন ইস্যুকারী এবং পরিষেবা প্রদানকারীরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ESSIF উদ্যোগের মতোই ভুটানের আইডেন্টিটি সিস্টেম আইডেন্টিটি তথ্য এবং DID ম্যানেজ করতে SSI ওয়ালেট ব্যবহার করবে। তবে এই ক্ষেত্রে DID সরাসরি কোনো ব্লকচেইন সিস্টেমের সঙ্গে সংযুক্ত কিনা তা স্পষ্ট নয়, কারণ ভুটানের পরিচয় আইনে এই দিকটি স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। এই পরিচয় আইন প্রবর্তনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো ব্যবহারকারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা এবং আইডেন্টিটি তথ্যের সিকিউরিটি এবং প্রাইভেসি সহজতর করা। এটি শুধু ভুটানের মধ্যেই নয়, বরং অন্যান্য দেশে যারা অনুরূপ SSI-ভিত্তিক আইডেন্টিটি ব্যবস্থা ব্যবহার করে তাদের সঙ্গেও আন্তঃপরিচালনযোগ্যতা নিশ্চিত করবে।

বাংলাদেশের জন্য একটি আধুনিক এবং ভবিষ্যৎমুখী আইডেন্টিটি সিস্টেম

পূর্ববর্তী সেকশনে প্রদত্ত আলোচনার ভিত্তিতে এটা স্পষ্ট যে একটি SSI-ভিত্তিক আইডেন্টিটি সিস্টেম যেকোনো সেন্ট্রালাইজড এবং ফেডারেটেড আইডেন্টিটি মডেলের তুলনায় অনেক বেশি সুবিধা প্রদান করে। বিশেষভাবে ব্যবহারকারীদের জন্য এই ধরনের আইডেন্টিটি সিস্টেম সুবিধাজনক কারণ এটি তাদের আইডেন্টিটি তথ্যের সিকিউরিটি এবং প্রাইভেসি নিশ্চিত করার চেষ্টা করে। যার কারণে বাংলাদেশের বর্তমান এনআইডি সিস্টেমের সঙ্গে সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে আমরা একটি SSI-ভিত্তিক আইডেন্টিটি সিস্টেম বাস্তবায়নের সুপারিশ করছি। এই সিস্টেমটি পাঁচটি পৃথক লেয়ার নিয়ে গঠিত হতে পারে: লেয়ার ১, লেয়ার ২, লেয়ার ৩, লেয়ার ৪ এবং লেয়ার ৫। ট্রাস্ট ওভার আইপি টেকনোলজি স্ট্যাকের[৫৪] ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের জন্য যে স্তর-ভিত্তিক আইডেন্টিটি সিস্টেম গ্রহণ করা যেতে পারে তার একটি রিপ্রেজেন্টেটিভ উদাহরণ চিত্র ২-এ দেখানো হয়েছে। প্রতিটি স্তর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিচে উপস্থাপন করা হয়েছে।

- **লেয়ার ১ (Identity Layer):** আইডেন্টিটি লেয়ারে প্রধানত সেই প্রক্রিয়াগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে, যা ব্যবহার করে সিস্টেমের মধ্যে কোনও ব্যক্তির আইডেন্টিটি রিপ্রেজেন্ট করা হয়। SSI-এর প্রেক্ষাপটে প্রতিটি ব্যবহারকারীকে একটি ডিসেন্ট্রালাইজড আইডেন্টিফায়ার (DID) দিয়ে ইউনিকলি রিপ্রেজেন্ট করা হয়। প্রতিটি DID জেনারেট করার জন্য মূলত কোনো ব্লকচেইনের ওপর নির্ভর করতে হয়। DID-এর প্রধান সুবিধা হলো যে ব্যবহারকারীরা DID এর মাধ্যমে কোনো আইডেন্টিটি তৈরি করার জন্য কোনো কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার ওপর নির্ভরশীল হতে হয় না। যার ফলে একজন ব্যবহারকারীর যত খুশি DID তৈরি করার এখতিয়ার থাকে, যার মাধ্যমে পরিচয়ের সার্বভৌমত্ব তারা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। অন্যদিকে সরকার-প্রদত্ত পরিচয়গুলো সাধারণত একটি দেশের সংশ্লিষ্ট সরকার দ্বারা তৈরি এবং প্রদান করা হয়। সাধারণত একজন ব্যবহারকারীর জন্য একটি নির্দিষ্ট দেশের মধ্যে এই ধরনের শুধু একটি পরিচয় থাকে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই পরিচয় হলো নির্বাচন কমিশন দ্বারা প্রদত্ত এনআইডি যার প্রাসঙ্গিক তথ্য এনআইডি ডাটাবেজে নিরাপদে সংরক্ষিত থাকে। প্রস্তাবিত সিস্টেমে DID-এর মাধ্যমে তৈরিকৃত আইডেন্টিটি এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত NID-ভিত্তিক আইডেন্টিটি হ্যান্ডেল করার সক্ষমতা রয়েছে।

- **লেয়ার ২ (P2P Communication Layer):** এই লেয়ারে বিভিন্ন SSI অ্যাক্টরের পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য প্রয়োজনীয় Peer-to-Peer (P2P) কমিউনিকেশন প্রোটোকল রয়েছে। এই প্রোটোকল ব্যবহার করে যেকোনো দুই SSI অ্যাক্টরের মধ্যে একটি pairwise সিকিউর এনক্রিপ্টেড কমিউনিকেশন চ্যানেল স্থাপন করা যায়। এটি SSI এর একটি বিশেষ সুবিধা কারণ এই এনক্রিপ্টেড কমিউনিকেশন চ্যানেলের মাধ্যমে ওই দুই SSI অ্যাক্টর ইন্টারনেটের উপরে একটি নিরাপদ ওভারলে বজায় রাখতে পারে। এই ওভারলের কারণে কোনো তৃতীয় পক্ষ ওই দুই অ্যাক্টরের মধ্যে বিনিময় করা তথ্য পর্যবেক্ষণ করতে পারে না।

- **লেয়ার ৩ (SSI Exchange Layer):** এই লেয়ার মূলত SSI ট্রাস্ট triangle কীভাবে পরিচালনা করা যায় সেটার ওপরে ফোকাস করে। SSI ট্রাস্ট triangle এর মধ্যে একজন হোল্ডার, একজন ইস্যুকারী এবং একজন যাচাইকারীরা পূর্বে স্থাপিত SSI চ্যানেল এবং হোল্ডারের ওয়ালেট ব্যবহার করে একে অপরের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করে। এছাড়াও এই লেয়ারে সেই প্রক্রিয়াগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে, যার মাধ্যমে ভেরিফায়েবল ক্রেডেনশিয়াল (Verifiable Credential বা VC) ব্যবহার করে একটি আইডেন্টিটিকে ডিজিটালি রিপ্রেজেন্ট করা যায়। এই লেয়ারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো SSI মোবাইল ওয়ালেট যা মূলত একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন। এই মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন প্রয়োজনীয় প্রাইভেট-পাবলিক কী জোড়া, বিভিন্ন ভিসি এবং অন্যান্য মেটাডেটা সংরক্ষণ করে। হোল্ডাররা তাদের ওয়ালেট ব্যবহার করে অন্যান্য ইস্যুকারী এবং যাচাইকারীদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় SSI কানেকশন স্থাপন করেন।

---

[৫৪] https://trustoverip.org/toip-model/

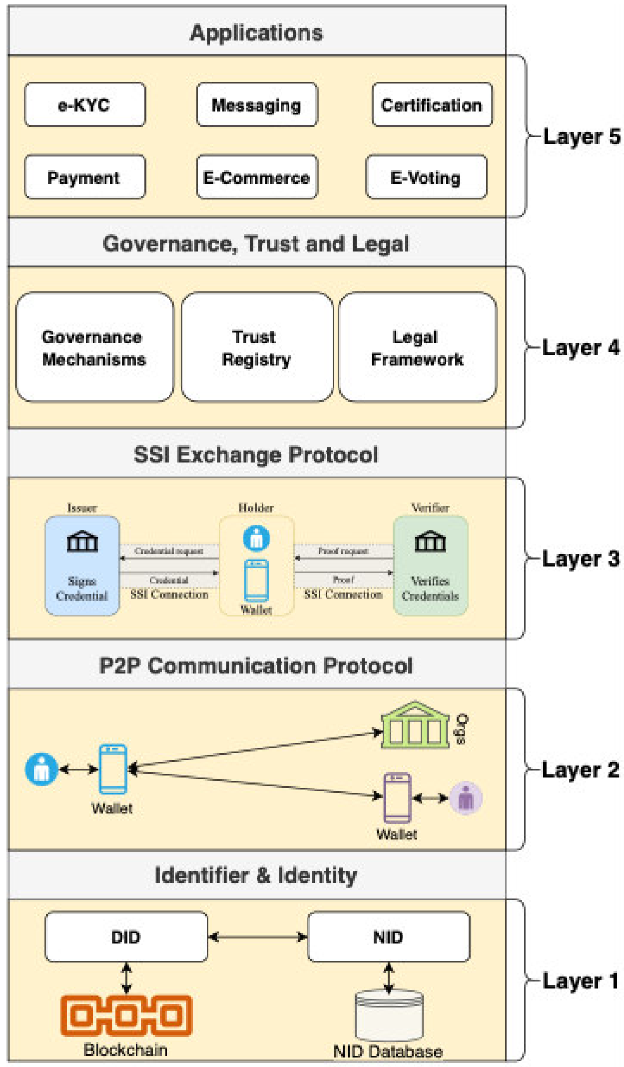

চিত্র ২: প্রস্তাবিত SSI-ভিত্তিক আইডেন্টিটি সিস্টেম

- লেয়ার ৪ (**Governance, Trust and Legal Layer**): এই লেয়ারের মধ্যে বিভিন্ন SSI অ্যাক্টরের মধ্যে ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে প্রক্রিয়াগুলো দরকার সেগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এরকম একটি প্রক্রিয়ার উদাহরণ হলো একটি ট্রাস্ট রেজিস্ট্রি মেইনটেইন করা, যা ব্যবহার করে কোনো SSI অ্যাক্টর আর কোন SSI অ্যাক্টরের সঙ্গে বিশ্বস্ততার সঙ্গে যোগাযোগ এবং আইডেন্টিটি তথ্য আদান প্রদান করতে পারবে তা ঠিক করতে পারে। এছাড়াও এই লেয়ারে SSI গভর্নেন্সের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে। সর্বোপরি এই লেয়ারের মধ্যে একটি আইনি কাঠামো মেইনটেইন করা হয় যার মধ্যে একটি দেশের মধ্যে একজন ব্যবহারকারীর আইডেন্টিটি সম্পর্কিত আইনগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে।

- লেয়ার ৫ (**Application Layer**): এই লেয়ারের মধ্যে SSI-ভিত্তিক আইডেন্টিটির ওপরে নির্ভরশীল অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে রাখা হয়। এরকম অ্যাপ্লিকেশন এমন যেকোনো টাইপের অ্যাপ্লিকেশন হতে পারে যা কোনো না কোনোভাবে কোনও ব্যক্তির আইডেন্টিটির ওপর নির্ভর করে। প্রস্তাবিত সিস্টেমে যেহেতু DID এবং বাংলাদেশে প্রচলিত NID ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে, তাই এটিকে বৈচিত্র্যময় নতুন ধরনের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ব্যবহারকারীরা কম গুরুত্বপূর্ণ অনলাইন পরিষেবা অ্যাক্সেস করার জন্য একটি DID-ভিত্তিক পরিচয় ব্যবহার করতে পারেন। বিপরীতে, ই-কেওয়াইসি (e-KYC) বা ব্যাংকিং-এর মতো পরিষেবার জন্য, যেখানে আইডেন্টিটির পুরো নিশ্চয়তা প্রয়োজন, সেখানে ব্যবহারকারীরা তাদের সরকার-প্রদত্ত এনআইডি ব্যবহার করতে পারেন। তদুপরি, DID এবং এনআইডি-এর সংমিশ্রণে নতুন এবং আকর্ষণীয় ব্যবহারের দ্বার উন্মোচিত হয়।

প্রস্তাবিত সিস্টেম ব্যবহার করে একজন ব্যবহারকারী এনআইডি সার্ভার, ব্যাংক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রত্যয়নকারী কর্তৃপক্ষ-সহ একাধিক ইস্যুকারী থেকে যাচাইযোগ্য VC এর ফরম্যাটে ডিজিটাল ক্রেডেনশিয়াল পেতে পারেন। এই VC গুলো তাদের ওয়ালেটে সংরক্ষিত থাকবে। ব্যবহারকারী সেই ভিসিগুলো সংশ্লিষ্ট পরিষেবা প্রদানকারীদের (যাচাইকারীদের) কাছে রিলিজ করবেন। যাচাইকারী এই ভিসি যাচাই করবেন এবং যাচাইকরণ সফল হলে ব্যবহারকারীকে পরিষেবা প্রদান করবেন। প্রয়োজন হলে যাচাইকারী প্রকাশিত VC ছাড়াও অতিরিক্ত বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশনের অনুরোধ করতে পারেন। একজন ব্যবহারকারী এমনকি বিভিন্ন ইস্যুকারী থেকে একাধিক ক্রেডেনশিয়াল একত্রিত করতে পারেন এবং সংশ্লিষ্ট যাচাইকারীদের কাছে ক্রেডেনশিয়ালের একটি সমন্বিত সেট জমা দিতে পারেন।

প্রস্তাবিত আইডেন্টিটি সিস্টেম একটি SSI-ভিত্তিক সিস্টেম হওয়ায় এটি ইতিমধ্যেই SSI-এর বেশ কিছু অন্তর্নিহিত সুবিধা পেয়েছে। নিম্নে আমরা সেই সুবিধাগুলোর কয়েকটি সংক্ষেপে বর্ণনা করছি:

- **ডিজিটাল আইডেন্টিটি:** প্রস্তাবিত SSI-ভিত্তিক পদ্ধতি বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত এনআইডিকে একটি ডিজিটাল আইডেন্টিটিতে কার্যকরভাবে রূপান্তর করবে যা ব্যবহারকারী এবং ইস্যুকারী উভয়ের জন্যই সুবিধাজনক। ব্যবহারকারীদের আর একাধিক ফিজিকাল আইডেন্টিটি কার্ড বহন করতে হবে না। এই সকল ফিজিকাল আইডেন্টিটি কার্ড সহজেই হারিয়ে যেতে পারে বা নষ্ট হয়ে যায়। তবে VC-ভিত্তিক ডিজিটাল কার্ড যেহেতু মোবাইল ফোনের ওয়ালেটে সংরক্ষণ করা হয়, তাই মোবাইল ফোন হারিয়ে গেলে এই ডিজিটাল VC গুলোও হারিয়ে যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীরা একটি নতুন স্মার্টফোনে সহজেই ন্যূনতম খরচে আবার সংশ্লিষ্ট ইস্যুকারীর কাছে নতুন VC রিকোয়েস্ট করতে পারেন। প্রস্তাবিত VC-ভিত্তিক এই পদ্ধতি ইস্যুকারীদের জন্যেও সুবিধাজনক, কারণ তাদের আর ফিজিকাল আইডেন্টিটি কার্ড তৈরি ও বিতরণ করতে হয় না।

- **মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ:** DID-ভিত্তিক আইডেন্টিটি সম্পূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারীর নিয়ন্ত্রণে থাকে। অনেক দেশে, যেমন এস্তোনিয়াতে, নাগরিকরা তাদের আইডেন্টিটি তথ্যের মালিকানা বজায় রাখতে পারেন যদিও এই ধরনের আইডেন্টিটি তথ্য সংশ্লিষ্ট সরকার দ্বারা সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। প্রস্তাবিত সিস্টেম ব্যবহারকারীদের আইডেন্টিটি তথ্যের ওপরে পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণ দেয়, যার মাধ্যমে তারা কোন তথ্য কার সঙ্গে শেয়ার করবেন সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এই মডেলে ইস্যুকারী এবং যাচাইকারীরা ব্যবহারকারীর অজ্ঞাতে কোনো আইডেন্টিটি তথ্য বিনিময় করতে পারে না। এই দুই অ্যাক্টরের মধ্যে প্রতিটি তথ্য শুধু ব্যবহারকারী অনুমতির পরেই শেয়ার করা সম্ভব হয়।

- **সিকিউর এবং গোপনীয়তা-বান্ধব (privacy-friendly) পদ্ধতি:** প্রস্তাবিত সিস্টেমে বেশ কিছু সিকিউরিটির ব্যবস্থা রয়েছে। প্রথমত, একজন ইস্যুকারী, যাচাইকারী এবং ব্যবহারকারীর মধ্যে পেয়ার-ওয়াইজ সিকিউর এনক্রিপ্টেড কমিউনিকেশন চ্যানেল স্থাপন করা হয় যার মাধ্যমে মাধ্যমে তথ্যের সিকিউর স্থানান্তর নিশ্চিত হয়। প্রতিটি VC-তে ডিজিটালি স্বাক্ষর থাকে, যার ফলে এটিকে কোনোভাবেই টেম্পার করা যায়না। যাচাইকরণ প্রক্রিয়ায় ইস্যুকারীর পাবলিক কী প্রয়োজন, যা সাধারণত একটি ব্লকচেইনে সংরক্ষিত থাকে, ফলে পাবলিক কী-এর প্রামাণ্যতা এবং অখণ্ডতা (authenticity এবং integrity) নিশ্চিত হয়। যেহেতু একজন ইস্যুকারী এবং একজন যাচাইকারীর মধ্যে প্রতিটি তথ্য বিনিময় একজন ব্যবহারকারীর মাধ্যমে সংঘটিত হয়, এটি গোপনীয়তার কিছু জিনিস নিশ্চিত করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যবহারকারীকে অবশ্যই তথ্য শেয়ার করার জন্য স্পষ্টভাবে সম্মতি দিতে হবে, এবং অন্যান্য পক্ষের সঙ্গে তথ্য বিনিময় কেবল ব্যবহারকারীর জ্ঞাতসারেই হয়ে থাকে।

- **স্ট্যান্ডার্ডাইজ্‌ড এবং আন্তঃপরিচালনযোগ্য (interoperable) আইডেন্টিটি:** প্রতিটি VC একটি আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ডের ওপর ভিত্তি করে জেনারেট করা হয়, যা ডিজিটাল আইডেন্টিটির রিপ্রেজেন্টেশনের জন্য একটি সুপ্রতিষ্ঠিত স্ট্যান্ডার্ড নিশ্চিত করে। এর ফলে শুধু এক দেশের মধ্যেই না, বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন SSI-ভিত্তিক সিস্টেমের মধ্যে আন্তঃপরিচালনযোগ্যতা নিশ্চিত করে। যার ফলে বিভিন্ন SSI অ্যাক্টরের সঙ্গে নির্বিঘ্নে যোগাযোগ এবং ইন্টারঅ্যাকশন করা সহজ হয়।

তবে বিদ্যমান সিস্টেমের অন্যান্য ত্রুটিগুলো মোকাবেলা করতে প্রস্তাবিত এই সিস্টেমের সঙ্গে অতিরিক্ত কিছু ফিচার যোগ করতে হবে। আমরা এই অতিরিক্ত ফিচারগুলো সংক্ষেপে নিচে আলোচনা করছি।

- **আইডেন্টিটি জীবনচক্র:** আইডেন্টিটি জীবনচক্রের সকল পর্যায়ে একজন ব্যবহারকারী সক্রিয়ভাবে যাতে জড়িত থাকতে পারে তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের প্রস্তাবিত SSI-ভিত্তিক সিস্টেম এটি একাই নিশ্চিত করতে পারবে না।

- **ব্যবহারকারী-নিয়ন্ত্রিত এনক্রিপশন:** এনআইডি সিস্টেমের মধ্যে আইডেন্টিটি তথ্যে অননুমোদিত প্রবেশ রোধ করার একটি উপায় হতে পারে যে এই ধরনের তথ্য ব্যবহারকারী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কী ব্যবহার করে এনক্রিপ্ট এবং সংরক্ষণ করা। যেহেতু SSI ওয়ালেটে ক্রিপ্টোগ্রাফিক কী সংরক্ষণ করা যায়, একজন ব্যবহারকারী তাদের এনআইডি তথ্য অ্যাক্সেসের সময় সেই এনক্রিপ্টেড তথ্যকে প্রাইভেট কী দিয়ে ডিক্রিপ্ট করতে পারবেন। এর পরে তাদের কাজ শেষ হলে আবার সংলিষ্ট পাবলিক কী দিয়ে এনক্রিপ্ট করতে পারবেন। তবে এই ধরনের পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য ওয়ালেটের মধ্যে সংরক্ষিত কী সিকিউরলি ব্যাকআপ করার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে একজন ব্যবহারকারী তার স্মার্টফোন হারিয়ে ফেললেও ওয়ালেটে সংরক্ষিত কী পুনরুদ্ধার করা যায়।

- **অডিট ট্রেইল:** এনআইডি সিস্টেমে একটি অপরিবর্তনীয় (immutable) অডিট ট্রেইল অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এর ফলে ব্যবহারকারীরা তাদের এনআইডি তথ্য কে কখন অ্যাক্সেস করেছে এবং কিংবা কার সঙ্গে শেয়ার করা হয়েছে তা বুঝতে পারবেন। যেহেতু immutable অডিট ট্রেইল চেঞ্জ করা সম্ভব হয় না, তাই কোনো ব্যবহারকারীর তথ্যে কেউ অননুমোদিত প্রবেশ করলে সেটার রেকর্ড অডিট ট্রেইলে থেকে যাবে।

- **ওয়ালেট ব্যাকআপ এবং পুনরুদ্ধার:** যেহেতু SSI ওয়ালেট প্রস্তাবিত সিস্টেমের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ, এটির সিকিউর ব্যাকআপ এবং পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা খুবই দরকারি। কোনো ব্যবহারকারী তাদের স্মার্টফোন এবং তাতে থাকা ওয়ালেট হারিয়ে ফেললে এই ব্যাকআপ থেকে ওয়ালেট আবার সিকিউরলি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে।

- **কী (Key) ব্যবস্থাপনা:** ক্রিপ্টোগ্রাফিক কী ব্যবস্থাপনা প্রস্তাবিত সিস্টেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই ক্রিপ্টোগ্রাফিক কীগুলোকে অতিরিক্ত সুরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে নিরাপদে ম্যানেজ করতে হবে।

প্রস্তাবিত আইডেন্টিটি সিস্টেম বাস্তবায়নের সময় বেশ কিছু বিষয় বিবেচনা করতে হবে। ব্লকচেইন প্রযুক্তি এই সিস্টেমে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কারণ প্রতিটি DID একটি নির্দিষ্ট ব্লকচেইনের ওপর নির্ভরশীল। ব্লকচেইনের immutability এবং decentralised বৈশিষ্ট্যের কারণে, ব্লকচেইন DID এর জন্য একপ্রকার ট্রাস্ট অ্যাংকর (trust anchor) হিসেবে কাজ করে। তবে একটি ব্লকচেইনের অনুপস্থিতিতে DID কে ট্রেডিশনাল ডাটাবেসের সঙ্গেও ব্যবহার করা সম্ভব। যদি একটি ডাটাবেজকে ট্রাস্ট অ্যাংকর হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে এর নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য এবং ট্রাস্ট অ্যাংকর হিসেবে ব্যবহার করার জন্য অতিরিক্ত কিছু ব্যবস্থা নিতে হতে পারে।

প্রস্তাবিত সিস্টেমে স্মার্টফোনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যদিও স্মার্টফোন মোটামুটি সহজলভ্য হয়ে গেছে, তবে আমাদের দেশে এখনও অনেকেই আছেন যাদের কোনো স্মার্টফোন নেই। তাদের জন্য প্রস্তাবিত SSI-ভিত্তিক সিস্টেম এক্সেস করা কঠিন হতে পারে। এই বৈষম্য মোকাবেলা করতে আমাদের একটি বিকল্প প্রক্রিয়া চিন্তা করতে হবে। বাংলাদেশের মোবাইল আর্থিক সেবা (এমএফএস) খাত যেইভাবে স্মার্টফোনের ব্যবহার সংক্রান্ত একই ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যে পদ্ধতি সফলভাবে ব্যবহার করেছে আমরা সেখান থেকে থেকে অনুপ্রেরণা পেতে পারি। এমএফএস পরিষেবা প্রদানকারীরা মোবাইল-ভিত্তিক আর্থিক সেবা প্রদান করতে মোবাইল টেলিকমিউনিকেশন চ্যানেল ব্যবহার করেছে, যেখানে যে কেউ এমনকি ফিচার ফোন ব্যবহার করেও মোবাইলভিত্তিক আর্থিক সেবা এক্সেস করতে পারে। মোবাইল টেলিকম সার্ভিস প্রদানকারীদের মাধ্যমে ক্লাউড SSI ওয়ালেট পরিষেবা হোস্ট করে, SSI-ভিত্তিক আইডেন্টিটি পরিষেবাগুলো মোবাইল কমিউনিকেশন চ্যানেলের মাধ্যমে অ্যাক্সেস করা যেতে পারে, যা স্মার্টফোন নেই এমন ব্যক্তিদের জন্যও অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে পারে। তবে এর জন্য অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ক্লাউড হোস্টিং সার্ভিস ডিজাইন করতে হবে যাতে ব্যবহারকারীরা স্মার্টফোন-ভিত্তিক ওয়ালেটের মতো একই সুবিধা, নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তার নিশ্চয়তা উপভোগ করতে পারেন।

আমাদের এনআইডি সিস্টেমকে একটি সিকিউর এবং প্রাইভেসি-বান্ধব সিস্টেমে রূপান্তরের চেষ্টায় আমরা একটি আধুনিক, সমসাময়িক এবং ভবিষ্যৎমুখী আইডেন্টিটি সিস্টেমের রূপরেখা উপস্থাপন করেছি। এটি আমাদের বিদ্যমান এনআইডি সিস্টেম রূপান্তরের জন্য একটি মৌলিক ব্লু-প্রিন্ট হিসেবে কাজ করবে।

আইনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন

প্রস্তাবিত SSI-ভিত্তিক এনআইডি ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে নিম্নলিখিত আইনগুলোর হালনাগাদ এবং প্রণয়ন করার দরকার হতে পারে:

- *জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন-২০২৩* বাতিল করা;
- *জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন-২০১০* কে আধুনিকায়ন এবং হালনাগাদ করা;
- *জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন বিধিমালা-২০১৪* এবং *জাতীয় পরিচয়পত্র ও সংরক্ষিত তথ্য উপাত্ত (সংশোধন, যাচাই এবং সরবরাহ) প্রবিধানমালা, ২০১৪* হালনাগাদ করা;
- নতুন ব্যক্তিগত ডাটা প্রোটেকশন এবং প্রাইভেসি আইন প্রণয়ন করা।

সুপারিশসমূহ

এই সেকশনে আমরা আমাদের সুপারিশগুলো নিচে পেশ করছি।

জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সুপারিশ

- *জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন আইন-২০২৩* – যার মাধ্যমে এনআইডি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর করা হয়েছে – জরুরি ভিত্তিতে বাতিল করা।

- জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন আইন, ২০১০ কে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে পুনর্বহাল করা, যাতে এটি প্রস্তাবিত আধুনিক আইডেন্টিটি সিস্টেমেকে আইনি ভিত্তি দিতে পারে এবং যার মাধ্যমে প্রতিটি নাগরিক তার আইডেন্টিটি তথ্যের মালিকানা এবং তার সকল আইডেন্টিটি তথ্যের উপরে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পেতে পারেন।

- জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত সকল অব্যবস্থাপনা, হয়রানি ও অনিয়মের অবসান ঘটিয়ে এ কার্যক্রমকে জনবান্ধব করা।
- ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সকল নাগরিককে অবিলম্বে হালনাগাদ ছবিযুক্ত এনআইডি স্মার্টকার্ড প্রদান করা, যাতে ভোটার শনাক্তকরণে এটি ব্যবহার করা যায়।
- বাড়ি বাড়ি গিয়ে সামগ্রিক ভোটার তালিকা যাচাই ও হালনাগাদের মাধ্যমে 'জেন্ডার গ্যাপে'র অবসান করা।
- ভোটার তালিকা আইন সংশোধনের মাধ্যমে নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার দিনে যাদের ১৮ বছর পূর্ণ হবে তাদেরকেও ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা।
- বাংলাদেশের প্রায় সকল গণমাধ্যমে লাখ লাখ বাংলাদেশি নাগরিকের এনআইডি তথ্য ফাঁস হওয়া এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইট ও মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম থেকে নামমাত্র মূল্যে বা এমনকি বিনামূল্যে এই তথ্যগুলো ফাসের অভিযোগের প্রেক্ষিতে, এই দাবিগুলোর সত্যতা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এবং এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ফাঁসের অন্তর্নিহিত কারণ, প্রভাব এবং পরিণতি নির্ধারণ করতে স্বাধীন তদন্তের ব্যবস্থা করা এবং দোষী ব্যক্তিদের প্রচলিত আইনে শাস্তির ব্যবস্থা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূণ। এই দাবিগুলোর সত্যতা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ছাড়া ভবিষ্যতে এরকম কোনো দুর্ঘটনা এবং অপব্যবহার এড়াতে এনআইডি তথ্য সুরক্ষার জন্য কোনো সুপারিশ প্রদান করা চ্যালেঞ্জিং হবে।
- একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কাছে জাতীয় পরিচয়পত্রের ডাটাবেজ থাকার যে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে তদন্তসাপেক্ষে জরুরি ভিত্তিতে এব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- বর্তমানের ১৬ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী বাংলাদেশি নাগরিকের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের পাশাপাশি ভবিষ্যতে ১০ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী শিশুদের জন্য পরিচয় নিবন্ধন কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- তবে জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান একটি বিরাট ও স্পর্শকাতর কর্মযজ্ঞ এবং নির্বাচন কমিশনকে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের কাজেই নিবিষ্ট থাকা ও সর্বশক্তি নিয়োগ করা আবশ্যক। এছাড়াও এনআইডি ব্যবস্থাপনা একটি জটিল বিষয় যার জন্য বিশেষ কারিগরি দক্ষতা আবশ্যক। এছাড়াও ভবিষ্যতে এর ব্যবস্থাপনার কাজটি ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হবে। তাই সারাদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এনআইডি সংক্রান্ত সকল সেবা সুচারুরূপে সম্পন্নের নিমিত্তে দেশের বৃহত্তম জাতীয় তথ্য ভাণ্ডারের নিরবচ্ছিন্ন অপারেশন, আপগ্রেডেশন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের পরিবর্তে আগামী সাত বছরের মধ্যে জাতীয় নাগরিক ডাটা কমিশন (National Citizen Data Commission) নামে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন সংবিধিবদ্ধ কমিশন গঠন করা উচিত, যার দায়িত্ব হবে জাতীয় পরিচয়পত্র এবং পরিচয়পত্র সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা। এই সংস্থার অর্গানোগ্রাম ও জনবল কাঠামো নির্ণয়ে একটি আন্তর্জাতিক অডিট ফার্মের মাধ্যমে নিরীক্ষণ ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। বর্তমানে প্রচলিত এনআইডি সংক্রান্ত সেবা কোনো প্রকার সমস্যা ব্যতিরেকে চালু রাখার সুবিধার্থে প্রস্তাবিত কমিশন পূর্ণাঙ্গভাবে গঠিত না হওয়া পর্যন্ত এনআইডি সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম নির্বাচন কমিশনের অধীনে থাকবে।
- ভবিষ্যতে প্রস্তাবিত জাতীয় নাগরিক ডাটা কমিশনের কার্যক্রমের পরিধি আরও বিস্তৃত করে বর্তমানে প্রচলিত কিছু সার্ভিস, যেমন Birth and Death Registration Information system (BDRIS) এবং Civil registration and Vital Statistics (CRVS) যাদের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ এরকম কাযক্রমের নিবন্ধন সম্পন্ন করা হয়, তাদেরকে জাতীয় নাগরিক ডাটা কমিশনের অধীনে নিয়ে আসা যেতে পারে। এর ফলে কোনো নাগরিকের আইডেন্টিটি-সহ তার জীবনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির সকল তথ্য প্রস্তাবিত কমিশনের অধীনে একীভূত করে Citizen Data Ocean তৈরি করা সম্ভব হবে। একই কর্তৃপক্ষের অধীনে নাগরিকদের এসব তথ্য থাকলে কোনো নাগরিক একটি সার্ভিস ব্যবহার করেই এসকল তথ্য এক্সেস করতে পারবেন। এছাড়াও তথ্যের মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি কমানো সম্ভব হবে এবং একই সিকিউরিটি এবং প্রাইভেসি স্ট্যান্ডার্ড বজায় রেখে তথ্য সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। অন্যান্য সকল সেবা কিংবা প্রতিষ্ঠান একটি সিঙ্গেল ইন্টারফেস ব্যবহার করে এই তথ্যগুলো সহজেই সংগ্রহ কিংবা যাচাই করতে পারবে। এছাড়াও এই সার্ভিসগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জনবল এবং রিসোর্স প্রস্তাবিত কমিশনের সঙ্গে একীভূত করে আরও দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং রাষ্ট্রের খরচ কমানো যেতে পারে।
- বর্তমানে পরিচালিত সম্পূর্ণ এনআইডি সিস্টেমকে তথা সংশ্লিষ্ট ডাটা সেন্টার, হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার/ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন, ডাটাবেজ, ক্রেডেনশিয়ালস্ (credentials) ইত্যাদি ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান থেকে প্রস্তাবিত জাতীয় নাগরিক ডাটা কমিশনের নিকট হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা। প্রস্তাবিত আধুনিক আইডেন্টিটি সিস্টেমের জন্য একই ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

আইডেন্টিটি এবং আইডেন্টিটি সিস্টেম সংক্রান্ত সুপারিশ

- জাতীয় পরিচয়পত্রকে এর ডিজিটাল (ভার্চুয়াল) ভার্সনে রূপান্তরের ব্যবস্থা করা। প্রস্তাবিত সিস্টেমের মাধ্যমে আমাদের বিদ্যমান এনআইডি কার্ডকে একটি স্ট্যান্ডার্ডাইজড্ ডিজিটাল ফরম্যাটে কার্যকরভাবে রূপান্তর করা সম্ভব। এজন্য আমরা দৃঢ়ভাবে সুপারিশ করছি আমাদের এনআইডি সিস্টেমকে একটি পূর্ণাঙ্গ SSI-ভিত্তিক আইডেন্টিটি সিস্টেমে রূপান্তর করার

জন্য যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা তাদের আইডেন্টিটির তথ্যের ওপরে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে পারবেন। এই লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে কোনো স্ট্যান্ডার্ডাইজ্‌ড SSI প্রযুক্তি স্ট্যাক ব্যবহার করে একটি SSI-ভিত্তিক আইডেন্টিটি সিস্টেম ডিজাইন এবং ডেভেলপ করা। একইসঙ্গে প্রয়োজনীয় ট্রাস্ট ফ্রেমওয়ার্ক, Governance ফ্রেমওয়ার্ক এবং আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা এবং অ্যাপ্লিকেশন ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা অপরিহার্য হবে। পুরো সিস্টেম ডিজাইন করার সময় পূর্বে উল্লেখিত যে অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোকে অবশ্যই সিস্টেমে একীভূত করার ব্যবস্থা করতে হবে। তদুপরি বিদ্যমান এনআইডি অনলাইন সেবাকে তদানুসারে পুনর্গঠন করতে হবে, যাতে এই ফিচারগুলো সকল নাগরিকের জন্য এক্সেসিবল হয়।

- আমাদের এনআইডি সিস্টেমকে একটি SSI-ভিত্তিক সিস্টেমে রূপান্তর করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার পরে, বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের স্মার্টফোনের জন্য একটি SSI ওয়ালেট ডেভেলপ করতে হবে। এই ওয়ালেটটি অবশ্যই সিকিউরিটি এবং প্রাইভেসিকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিখুঁতভাবে ডিজাইন করতে হবে। এছাড়াও, পাবলিক/প্রাইভেট কী এবং অন্যান্য SSI-সম্পর্কিত মেটাডেটার জন্য একটি নিরাপদ ব্যাকআপ এবং পুনরুদ্ধার (recovery) পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- প্রস্তাবিত সিস্টেম এবং এর বিভিন্ন সাব-কম্পোনেন্ট ও SSI ওয়ালেটের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত নিরাপত্তা নিরীক্ষা (সিকিউরিটি অডিট) প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে একটি সিকিউরিটি অডিট পরিচালনা করতে হবে।
- SSI-ভিত্তিক এই সমাধান প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার পরে বিদ্যমান সরকারি এবং বেসরকারি অনলাইন পরিষেবাগুলো রূপান্তর করার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে এই সিস্টেমের সিকিউরিটি এবং প্রাইভেসি ফিচারগুলোর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয়। এর জন্য আন্তর্জাতিক বেস্ট প্রাক্টিসগুলো অনুসরণ করে একটি পরিচয় প্রমিতকরণ (identity standardization) ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ যাতে শুধু দেশের মধ্যেই না, বরং বিশ্বব্যাপী অন্যান্য দেশের সঙ্গে এনআইডি সিস্টেমের আন্তঃপরিচালনযোগ্যতা (interoperability) নিশ্চিত করা যেতে পারে।
- সিস্টেমটি ডেভেলপ করার পরে ব্যাপকভাবে ব্যবহারের আগেই এটিকে rigorously টেস্ট করতে হবে। বিশেষ করে প্রস্তাবিত সিস্টেমটিতে অনেক জটিল এবং পরস্পর সংযুক্ত সাব-কম্পোনেন্ট রয়েছে যেগুলোকেও পৃথকভাবে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।
- এরকম একটি কমপ্রিহেনসিভ জাতীয় পরিচয় ব্যবস্থার সঙ্গে উপযুক্ত ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা এবং গোপনীয়তা (personal data protection and privacy) আইন থাকা আবশ্যক। এই ধরনের আইন না থাকলে একটি শক্তিশালী আইডেন্টিটি সিস্টেমও ভালোমত কাজ নাও করতে পারে। এই আইন দেশের মধ্যে পরিচয় এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য সম্পর্কিত যেকোনো ভবিষ্যৎ অপব্যবহারের বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করবে।
- আমরা আগেই আলোকপাত করেছি যে স্মার্টফোন একটি SSI সিস্টেমের একটি কেন্দ্রীয় অনুষঙ্গ। তাই যেসকল ব্যক্তিদের স্মার্টফোন নেই তাদের জন্য এরকম কোনো SSI সিস্টেম ব্যবহার করা দুরূহ হতে পারে। এই সমস্যা দূর করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই একটি বিকল্প সমাধান বের করতে হবে। এই লক্ষ্যে পূর্বে আলোচিত ফিচার ফোন ব্যবহার করে প্রান্তিক জনগণের জন্য এনআইডি সিস্টেম অ্যাক্সেস করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৮. জাতীয় সংসদ নির্বাচন

নির্বাচন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পূর্বশর্ত। নির্বাচনের মাধ্যমেই জনগণের সম্মতির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমেই আধুনিক রাষ্ট্রে জনগণ ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করে, যারা তাদের স্বার্থে ও কল্যাণে সরকার গঠন ও রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। বস্তুত নির্বাচনের মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক যাত্রাপথের সূচনা হয়। তবে সে নির্বাচন হতে হবে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য। সঠিকভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই মানবাধিকার সমুন্নত রাখে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে, স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার চর্চা করে, সমতা ও ন্যায়পরায়ণতা নিশ্চিত করে এবং শাসনব্যবস্থায় জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণে সহায়তা করে তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে। আর সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তার সর্বোচ্চ কার্যকারিতা অর্জন করে এবং রাষ্ট্রের কল্যাণমুখী চরিত্র প্রস্ফুটিত হয়।

সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমেই একটি রাষ্ট্রে দায়বদ্ধতামূলক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ সুগম হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দুই ধরনের দায়বদ্ধতা বিরাজমান – একটি নিম্নমুখী দায়বদ্ধতা, আরেকটি সমান্তরাল দায়বদ্ধতা। নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে যদি ভোটের জন্য জনগণের দোরগোড়ায় ধর্ণা দিতে হয়, তাহলেই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পক্ষে দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন ও অন্যান্য অপকর্মে লিপ্ত হওয়া দুরূহ হয়ে পড়ে এবং তাদেরকে জনগণের স্বার্থে ও কল্যাণে কাজ করতে হয়। কারণ অপকর্ম ও জনস্বার্থ বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে পড়লে জনগণের পক্ষে সেক্ষেত্রে তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব হবে। এভাবেই সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে নিম্নমুখী দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

সমান্তরাল দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হয় সংসদীয় কমিটি ও অন্যান্য সাংবিধানিক ও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার নির্বাচিত হলে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহের সক্রিয় হওয়া সম্ভব হয় এবং তারা নির্বাহী বিভাগকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে সক্ষম হয়। সরকারের পক্ষে তখন আর অন্যায় এবং অপকর্ম করে পার পেয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। একইভাবে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদ নির্বাচিত হলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো নগ্ন দলীয়করণের শিকার হয় না এবং তাদের পক্ষে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয়। এর মাধ্যমে সকল সরকারি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। তাই গণতান্ত্রিক ও কল্যাণমুখী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই।

সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা আমাদের জাতীয় অঙ্গীকারও বটে। যে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছিল তার মূল অঙ্গীকার ছিল সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার এবং জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এ লক্ষ্যে স্বাধীন বাংলাদেশে রচিত সংবিধানে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়, যার পূর্বশর্ত হলো সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন। সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমেও আমরা জাতি হিসেবে সুষ্ঠু ও প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সুস্পষ্টভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছি।

গণতান্ত্রিক এবং শোষণ-বৈষম্যহীন শাসন কায়েমের অঙ্গীকারের ভিত্তিতে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও মহান মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকারগুলো এখনও বহুলাংশে অধরাই রয়ে গেছে। স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরও সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য আমরা প্রয়োজনীয় ও কার্যকর কাঠামো, প্রতিষ্ঠান এবং বিধি-বিধান তৈরি করতে পারিনি। বরং যে সকল কাঠামো ও প্রতিষ্ঠান ছিল তাও আমরা একে একে অকার্যকর, এমনকি ধ্বংস করে ফেলেছি। নির্বাচনকে আমরা নির্বাসনে পাঠিয়ে দিয়েছি। সততা ও ন্যায়-নীতিবোধকে চরমভাবে বিসর্জন দিয়েছি। এই প্রক্রিয়ায় শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এক চরম কর্তৃত্ববাদী ফ্যাসিস্ট সরকার আমাদের ওপর সওয়ার হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। ওই ফ্যাসিস্ট সরকার আমাদের পুরো জাতির ওপর অত্যাচার ও নিপীড়নের স্টিমরোলার চালিয়েছে। মানবাধিকার ও আইনের শাসনকে চরমভাবে পদদলিত করেছে। গোষ্ঠীতন্ত্র, চোরতন্ত্র ও কোটারি স্বার্থ চরিতার্থ করার মাধ্যমে এক চরম বৈষম্যমূলক সমাজ সৃষ্টি করেছে, বাংলাদেশকে একটি দুর্নীতি দুর্বৃত্তায়নের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছে। এসকল অনাচার, অবিচার ও বৈষম্যের অবসানের লক্ষ্যেই ছাত্র-জনতার নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছে জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থান। চরম জালিয়াতির নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত দখলদার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পলায়ন আমাদের জন্য বিদ্যমান নির্বাচনী ব্যবস্থাকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর এবং কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েমের অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে।

৭.১ বিকল্প নির্বাচন পদ্ধতি

বাংলাদেশে বর্তমানে আসনভিত্তিক 'ফাস্ট পাস্ট দ্য পোস্ট' (এফপিটিপি) বা আসনভিত্তিক পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এটি একটি জনপ্রিয় এবং অপেক্ষাকৃত সহজ পদ্ধতি। আমাদের সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদে "একক আঞ্চলিক নির্বাচনি এলাকাসমুহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত তিনশত সদস্য" নিয়ে জাতীয় সংসদ গঠনের কথা উল্লেখ রয়েছে। পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ দেশের আইনসভার নির্বাচনে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত। এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক ভোটার অনেক প্রার্থীর মধ্যে একজনকে ভোট প্রদান করেন এবং যিনি বেশি ভোটে এগিয়ে থাকেন তিনিই বিজয়ী হন।

এফপিটিপি বা আসনভিত্তিক পদ্ধতির অনেক গুরুতর সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যার অন্যতম হলো এ পদ্ধতিতে অনেক সময় রাজনৈতিক দল তাদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতে আসন পায় না। অর্থাৎ রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত ভোটের হার কাছাকাছি হলেও তাদের প্রাপ্ত আসনের সংখ্যায় প্রায়শই ব্যাপক তারতম্য ঘটে। ফলে এ ব্যবস্থায় প্রাপ্ত আসনের সংখ্যায় দলের জনসমর্থনের যথার্থ প্রতিফলন ঘটে না। বাংলাদেশের অতীতের চারটি নির্বাচনের (পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম ও নবম) ফলাফল – যে নির্বাচনগুলো নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত এবং দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষকদের কাছে কম-বেশি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল – দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

নিম্নের টেবিল থেকে দেখা যায় যে, ১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রায় সম-সংখ্যক ও সম-হারের ভোট পেলেও তাদের প্রাপ্ত আসন সংখ্যায় ব্যাপক তারতম্য ঘটে। বিএনপি প্রায় এক কোটি পাঁচ লাখ বা ৩০.৮১ শতাংশ ভোট পেয়ে ১৪০ আসন পেলেও, আওয়ামী লীগ প্রায় এক কোটি দুই লাখ বা ৩০.০৮ শতাংশ ভোট পেয়ে মাত্র ৮৮টি আসন পায়। একই ধরনের ড্রামাটিক বা নাটকীয় বিভাজন – বরং আরও বেশি – পার্থক্য লক্ষ করা যায় ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে। ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত সপ্তম এবং ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও দুই প্রধান দলের মধ্যে প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা ও ভোটের হারের সঙ্গে ব্যাপক অসামঞ্জস্যতা দেখা যায়, যাতে তাদের জনপ্রিয়তার প্রতিফলন ঘটেনি। অর্থাৎ বিদ্যমান পদ্ধতিতে সংসদে রাজনৈতিক দলের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না।

জাতীয় সংসদ	অনুষ্ঠানের তারিখ	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	আনুপাতিক হার হলে আসন সংখ্যা হত
পঞ্চম	২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	১,০৫,০৭,৫৪৯	৩০.৮১	১৪০	৯৩
		বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১,০২,৫৯,৮৬৬	৩০.০৮	৮৮	৯০
সপ্তম	১২ জুন ১৯৯৬	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১,৫৮,৮২,৭৯২	৩৭.৪৪	১৪৬	১১১
		বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	১,৪২,৫৫,৯৮৬	৩৩.৬১	১১৬	১০২
অষ্টম	১ অক্টোবর ২০০১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	২,২৮,৩৩,৯৭৮	৪০.৯৭	১৯৩	১২৩
		বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২,২৩,৬৫,৫১৬	৪০.১৩	৬২	১২০
নবম	২৯ ডিসেম্বর ২০০৮	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩,৩৬,৩৪,৬২৯	৪৮.০৪	২৩০	১৪৪
		বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	২,২৭,৫৭,১০১	৩২.৫০	৩০	৯৯

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের নির্বাচনি প্রতিবেদন

এটি সুস্পষ্ট যে বিদ্যমান আসনভিত্তিক এফপিটিপি পদ্ধতির কারণে সামান্য ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েও সংসদে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা সম্ভব হয়। আর এ সংখ্যাগরিষ্ঠতা কাজে লাগিয়ে আমাদের সরকারগুলো ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার লক্ষ্যে অতীতে একাধিকবার সংবিধান সংশোধন করেছে, যা আমাদের দেশে 'টিরানি অব দ্য মেজরিটি' বা সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচার সৃষ্টি করেছে। নারী আসনে আমাদের বিদ্যমান সংরক্ষণ পদ্ধতিও – যে পদ্ধতিতে সংরক্ষিত আসন প্রত্যেক দলের ভোট প্রাপ্তির অনুপাতের পরিবর্তে, সংসদে তাদের সদস্য সংখ্যার অনুপাতে ভাগ করা হয় – সংখ্যাগরিষ্ঠের এমন স্বৈরাচার সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের চরম ফ্যাসিস্টে পরিণত হওয়ার এটিও একটি কারণ।

আসনভিত্তিক এফপিটিপি পদ্ধতির প্রতিনিধিত্বশীলতার সমস্যা এবং এর সম্ভাব্য ভয়াবহ পরিণতির পাশাপাশি আরও গুরুতর সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এর মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের তাদের নিজ সংসদীয় আসনে আধিপত্য সৃষ্টির আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। তাদের পক্ষে স্থানীয় সরকারসহ অন্যান্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ তৈরি হয়। বস্তুত আমাদের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বর্তমানে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের পাশাপাশি বহুলাংশে সংসদ সদস্যদের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, যদিও এটি সুস্পষ্টভাবে সংবিধানের লঙ্ঘন।[৫৫]

[৫৫] প্রসঙ্গত, *আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বনাম বাংলাদেশ* মামলার [১৬ বিএলটি (এইসসিডি) (২০০৮)] রায়ে আদালত সুস্পষ্টভাবে রায় দিয়েছেন যে, স্থানীয় উন্নয়ন নির্বাহী বিভাগের কাজ এবং আইনসভার সদস্য হিসেবে সংসদ সদস্যদের স্থানীয় উন্নয়নে যুক্ত হওয়া সংবিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। দুর্ভাগ্যবশত সংসদ সদস্যদের স্থানীয় উন্নয়নে যুক্ত সংবিধানের লঙ্ঘন হলেও তাদেরকে উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা করা হয়েছে এবং তাদেরকে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে।

এছাড়াও অন্যসব প্রতিষ্ঠানের ওপর অযাচিতভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং বিভিন্ন বিশেষত স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তাদের পদায়ন ও বদলি নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়াও পুলিশ এসকর্টসহ তারা বিভিন্ন ধরনের অযাচিত সুযোগসুবিধা ভোগ করে। এসকল অযাচিত সুযোগসুবিধা এবং একচ্ছত্র আধিপত্যের কারণে আমাদের সংসদ সদস্যদের অনেককেই স্থানীয় পর্যায়ে জমিদারে পরিণত হয়েছেন। এ ধরনের জমিদারিত্ব সৃষ্টির প্রধান কারণ আসনভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থা। এছাড়াও এ ব্যবস্থায় মনোনয়ন বাণিজ্যের মতো অপকর্ম এবং রাজনীতির ব্যবসায়ীকরণ এবং ব্যবসায়ের রাজনীতিকরণ সম্ভব, যা আমাদের ক্ষেত্রে ঘটেছে।[৫৬]

আসনভিত্তিক এফপিটিপি ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক দেশেই সংক্ষানুপাতিক নির্বাচনব্যবস্থা ব্যবহার করা হয়। সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে সংসদের আসন সংখ্যা ভাগ হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভোটপ্রাপ্তির অনুপাতের হারে। এ ব্যবস্থায় ভোটারগণ ভোট প্রদান করেন রাজনৈতিক দলকে, কোনো নির্দিষ্ট প্রার্থীকে নয় এবং রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা নির্ভর করে দলের প্রাপ্ত ভোটের হারের ওপর। তবে কোনো আসন পেতে হলে দলকে ন্যূনতম হারের ভোট পেতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো দল যদি সারা দেশে মোট প্রদত্ত ভোটের পাঁচ শতাংশ ভোট পায়, তাহলে সে দল সংসদের মোট আসনের পাঁচ শতাংশ আসন পাবে। প্রসঙ্গত, সংসদীয় আসনের ভাগ পাওয়ার মানদণ্ড যদি ন্যূনতম পাঁচ শতাংশ হয়, তাহলে আমাদের দেশের ছোট ছোট দলগুলোর, যাদের প্রায় সকলেরই ভোট প্রাপ্তির হার ৫ শতাংশের কম, তারা কোনো আসন পাবে না।

সংযুক্ত টেবিল থেকে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি কীভাবে কাজ করে তা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। আসনভিত্তিক এফপিটিপির পরিবর্তে আমাদের দেশে সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতি চালু থাকলে পঞ্চম ও অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের হারের প্রায় সমতার কারণে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের আসন প্রাপ্তির সংখ্যাও অনুরূপ প্রায় সমান সমান হতো। সে দুটি নির্বাচনে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ যথাক্রমে ৯৩ ও ৯০ এবং ১২৩ ও ১২০ আসন পেত। একইভাবে সপ্তম ও নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও ভোট প্রাপ্তির অনুপাতের হারে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের আসন সংখ্যা নির্ধারিত হতো। ফলে এ চারটি নির্বাচনে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের কারো পক্ষেই এককভাবে সরকার গঠন করা সম্ভব হত না। উভয় দলকেই অন্য কোনো দলের বা দলসমূহের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকার গঠন করতে হত। একইভাবে ২০০৮ সালে বিএনপির তুলনায় আওয়ামী লীগ প্রায় ১৫ শতাংশ ভোট বেশি পেলেও এবং আসনের দিক থেকে আওয়ামী লীগ ৪৫ আসনে এগিয়ে থাকলেও, দলটির পক্ষে এককভাবে সরকার গঠন করা সম্ভব হতো না – সরকার গঠনের জন্য আওয়ামী লীগকে অন্য কোনো দলের মুখাপেক্ষী হতে হতো। ফলে এ চারটি নির্বাচনে কোনো দলের পক্ষেই দুই-তৃতীয়াংশ এমনকি সংখ্যাগরিষ্ঠতাও অর্জন করা সম্ভব হতো না।

উপরিউক্ত বিশ্লেষণ থেকে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতির আকর্ষণীয়তা ও দুর্বলতা উভয়ই প্রতিভাত হয়। যেহেতু সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতি বিরাজ করার কারণে এ চারটি নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেয়ে কোনো দলেরই সরকার গঠন করা সম্ভব হতো না, তাই কোনো দলের পক্ষেই এককভাবে, নিজেদের দলীয় স্বার্থে, সংবিধান সংশোধন করা সম্ভব হতো না। অর্থাৎ সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতি বিরাজ করলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষে চরম কলঙ্কজনক সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাস করে ক্ষমতা চিরস্থায়ী করা সম্ভব হতো না, যা আওয়ামী লীগকে ফ্যাসিস্টে পরিণত করেছে এবং ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে। সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব থাকলে আরেকটি ইতিবাচক ঘটনা ঘটতে পারত, যা হলো সংসদ সদস্যদের যোগ্যতা ও মানে উন্নতি ঘটতে পারত, সংসদ গঠনে আরও বৈচিত্র্য অর্জন করা সম্ভব হতো, যা অবশ্য নির্ভর করে দলের কর্তাব্যক্তিদের মানসিকতার ওপর।

সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতির একটি বড় দুর্বলতা হলো সরকারের সম্ভাব্য অস্থিতিশীলতা। উল্লেখিত চারটি নির্বাচনে যেহেতু কোনো দলের পক্ষেই এককভাবে সরকার গঠন করা সম্ভব হতো না, তাই বড় দলগুলো ক্ষুদ্র দলগুলোর কাছে জিম্মি হয়ে যেতে পারত এবং 'টিরানি অব দ্য স্মল মাইনোরিটি' বা ছোটদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতে পারত।[৫৭] এছাড়াও সরকার গঠনে ভাঙ্গাগড়ার খেলা প্রকট হয়ে উঠতে পারত। এমনকি সরকার গঠনে লেনদেনের প্রভাবও ঘটতে পারত। এছাড়াও সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে দলের আধিপত্য বেসামাল পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে। সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতির আরও অনেক দুর্বলতা রয়েছে যা অংশীজনের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময়ে উঠে এসেছে। মতবিনিময়ের সময়ে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ করা গেছে যে, অনেক ব্যক্তি ও দল যারা নীতিগতভাবে সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতির পক্ষে, তাদের অনেকেও বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটির প্রবর্তনের বিপক্ষে। তাদের আশঙ্কা যে, বর্তমান সময়ে সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতি গৃহীত হলে বিতাড়িত স্বৈরাচারের পুনর্বাসনের আশঙ্কা দেখা দিবে।

এটি সুস্পষ্ট যে, বর্তমান আসনভিত্তিক এফপিটিপি এবং সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতির ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকই রয়েছে।[৫৮] দুটি পদ্ধতিই বলতে গেলে 'মিক্সড ব্লেসিং' বা মিশ্র আশীর্বাদ। এ বিবেচনায় অনেক দেশেই এখন মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে। মিশ্র পদ্ধতিতে সংসদের একাংশ এফপিটিপি পদ্ধতিতে আরেকাংশ সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়ে থাকে। সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিও বহু রকমের হয়ে থাকে। এছাড়া সংসদের দুই কক্ষে দুই ধরনের পদ্ধতিও থাকতে পারে।

---

[৫৬] কামরান রেজা চৌধুরী, 'সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনি ব্যবস্থা: আরও স্বৈরাচারী হবে দল ও দলপ্রধান,' *প্রথম আলো*, ৭ নভেম্বর ২০২৪।

[৫৭] এ প্রসঙ্গে গাজায় ফিলিস্তিন ও ইসরাইলের মধ্যকার চলমান যুদ্ধের উদাহরণ টানা যেতে পারে। অনেক বিশ্লেষকের মতে, গাজায় যুদ্ধ এত প্রলম্বিত হওয়ার একটি বড় কারণ হলো আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের কারণে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু কিছু অতি ক্ষুদ্র উগ্র ধর্মান্ধ দলের কাছে জিম্মি হয়ে পড়ে ছিলেন।

[৫৮]সংখ্যানুপাতিক বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন, নজরুল ইসলাম, *রাষ্ট্র সংস্কার ও সংবিধান সংশোধন*, (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০২৪)

এমনি প্রেক্ষাপটে অংশীজনের পক্ষ থেকে সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতি প্রচলনের পক্ষে-বিপক্ষে দাবি উঠেছে। তবে সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় অনেক অংশীজন একটি মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহারের সুপারিশ করেছে। অনেকে আবার সংসদে উচ্চকক্ষ স্থাপিত হলে সেখানে সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতি প্রচলনের দাবি তুলেছে। তবে সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতির বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে চরম মতবিরোধ রয়েছে।

সুপারিশ

১. রাজনৈতিক ঐকমত্যের অভাবের কারণে নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তনের বিষয়ে কোনোরূপ সুপারিশ করা থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বিষয়টি সম্পর্কে রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব সম্মানিত রাজনীতিবিদদের ওপর ছেড়ে দেওয়াই যৌক্তিক বলে আমরা মনে করি।

৭.২ রান-অফ নির্বাচন

অনেক দেশেই নাগরিকদের জন্য ভোট প্রদান বাধ্যতামূলক এবং সেই সব দেশে ভোট প্রদানের হার বেশি হয়ে থাকে। আর যেসব দেশে ভোট প্রদানে বাধ্যবাধকতা নেই, সেসব দেশে নানা কারণে ভোট প্রদানের হার কম হতে পারে। নির্বাচন পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ ও বিতর্কিত হলে এবং এর প্রতি জনগণের আস্থাহীনতা সৃষ্টি হলে, নাগরিকদের মধ্যে ভোট প্রদানে অনীহা সৃষ্টি হতে পারে এবং তারা ভোট প্রদান থেকে বিরত থাকতে পারে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলো তার উদাহরণ। এরকম পরিস্থিতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সম্মতির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় না, যা দুর্বল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থারই পরিচায়ক। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের পন্থা হিসেবে অনেক দেশেই রান-অফ পদ্ধতির প্রচলন আছে।

রান-অফ পদ্ধতি দুই ধরনের হতে পারে। এক ধরনের রান-অফ পদ্ধতি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ওপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে বিজয়ী প্রার্থীকে ভোট পড়ার হারের ৫০ শতাংশের বেশি পেতে হয়। যদি কোনো প্রার্থীই ৫০ শতাংশের বেশি ভোট না পায়, তাহলে পরবর্তীতে ভোট হয় সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত দুই প্রার্থীর মধ্যে। এভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে থাকে যতক্ষণ না কোনো এক প্রার্থী ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পায়। এর বিপরীতে আরেকটি 'সিম্পল' বা সহজ রান-অফ পদ্ধতি আছে যেখানে সব প্রার্থী মিলে একটা নির্দিষ্ট শতাংশের ভোট না পেলে আবার নির্বাচন হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি আমরা ৪৫ শতাংশকে ভোট পড়ার ন্যূনতম মানদণ্ড হিসেবে ধরি, তাহলে সে এলাকার কোনো প্রার্থীকে কোনো নির্বাচনি এলাকা থেকে বিজয়ী হতে হলে, সে এলাকার সবপ্রার্থী মিলে ভোট পড়ার হার হতে হবে ন্যূনতম ৪৫ শতাংশ। অন্যথায় পুনর্নির্বাচন।

আমরা নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) মাধ্যমে নির্বাচনি সংস্কার বিষয়ে একটি জাতীয় জরিপের আয়োজন করেছি, যে জরিপে সারা দেশ থেকে ৪৬ হাজারের বেশি মানুষ অংশ নেয়। উক্ত জরিপে সংসদের কোনো আসনে মোট প্রদত্ত ভোটের ৫০ শতাংশের কম ভোট পড়লে সে আসনে পুনর্নির্বাচনের পক্ষে ৭৭.৭৯ শতাংশ মানুষ মতামত জানায়। অংশীজনের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময়েও বিষয়টি বারবার আলোচনায় আসে এবং অনেক অংশীজনই আমাদের দেশে রান-অফ পদ্ধতি প্রবর্তনের পক্ষে মত দিয়েছেন।

সুপারিশঃ

১. গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ধারা ৩৭ এর পর ধারা ৩৭ক যুক্ত করার মাধ্যমে জাতীয় নির্বাচনে কোনো আসনে মোট ভোটের চল্লিশ শতাংশের কম ভোট পড়লে (casting), ঐ আসনের নির্বাচন বাতিল করে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।

২. উপ-নির্বাচনের ক্ষেত্রে এ বিধানটি প্রযোজ্য না করা।

৭.৩ নির্বাচনি তফসিল

নির্বাচনি তফসিল ঘোষণা একটি নির্বাচনের নির্বাচনি কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করার প্রথম ধাপ। তফসিল ঘোষণার পরপরই নির্বাচনের ক্ষণ গণনা শুরু হয়ে যায়। *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২-এর ধারা ১১(১) অনুসারে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের তফসিল বা সময়সূচি ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন গেজেট আকারে প্রকাশ করে। তফসিলে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ, মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ এবং ভোটগ্রহণের তারিখ উল্লেখ থাকে। সংসদ নির্বাচনে *রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা ২০০৮* অনুযায়ী ভোটগ্রহণের তারিখের তিন সপ্তাহ পূর্বে কোনো নির্বাচনি প্রচারণা শুরু করা যায় না। তাই ঘোষিত তফসিলগুলোতে সাধারণত নির্বাচনি প্রচারণার জন্য তিন সপ্তাহ বা ২১ দিন সময় রেখে অবশিষ্ট সময় প্রার্থিতা চূড়ান্ত করার কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দ করা হয়। যদিও এই বিধি ভঙ্গ করে তফসিল ঘোষণার রেকর্ডও রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ৮ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ ঘোষিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিলে প্রচারণার সময় ২৩ দিন রাখা হয়েছিল।[৫৯] তবে এ নিয়ে সমালোচনা হলে কমিশন ৪ দিন পর আবার সংশোধিত তফসিল ঘোষণা করে।

[৫৯] হারুন আল রশিদ, 'তফসিলেই আইন লঙ্ঘন করেছে ইসি?' *প্রথম আলো*, ১০ নভেম্বর ২০১৮

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মোট ১২টি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ নির্বাচনগুলোর তফসিল পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তফসিল ঘোষণার দিন থেকে ভোটের দিন পর্যন্ত গড়ে ৪৯ দিন সময় ছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৬৮ দিন সময় ছিল চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এবং সবচেয়ে কম ৪৭ দিন ছিল নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে। তফসিলের সময়সূচি প্রার্থী চূড়ান্তকরণ এবং প্রচার-প্রচারণার মধ্যে ভাগ করলে সাধারণত প্রার্থী চূড়ান্তকরণের জন্য ৩০ দিন সময় থাকে। এ সময়ের মধ্যে মনোনয়নপত্র দাখিল ও যাছাই-বাছাই, মনোনয়নপত্র নিয়ে আপিলের শুনানি, প্রার্থিতা প্রত্যাহার ও প্রতীক বরাদ্দের কাজ সম্পন্ন করা হয়। নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্নের জন্য প্রার্থী চূড়ান্তের এ ধাপটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কারা শেষ পর্যন্ত প্রার্থী হবেন সেটি এ ধাপেই নির্ধারিত হয়। তাই এক্ষেত্রে তাড়াহুড়া কাম্য নয়। বস্তুত মনোয়নপত্র যাচাই-বাছাই যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য প্রার্থী চূড়ান্তকরণের সময়সীমা বৃদ্ধি করার যৌক্তিকতা রয়েছে।

ক্রমিক নং	জাতীয় সংসদ নির্বাচন	তফসিল ঘোষণার তারিখ	ভোটগ্রহণের তারিখ	পার্থক্য (দিন)
১	প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-১৯৭৩	০৭-০১-১৯৭৩	০৭-০৩-১৯৭৩	৬০
২	দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন-১৯৭৯	প্রথমবার: ০১-১২-১৯৭৮ পরিবর্তিত তারিখ: ২৭-১২-১৯৭৮	১৮-০২-১৯৭৯	৫৪
৩	তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন-১৯৮৬	প্রথমবার: ০২-০৩-১৯৮৬ পরিবর্তিত তারিখ: ২২-০৩-১৯৮৬	০৭-০৫-১৯৮৬	৪৭
৪	চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-১৯৮৮	২৬-১২-১৯৮৭	০৩-০৩-১৯৮৮	৬৮
৫	পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-১৯৯১	প্রথমবার: ১৫-১২-১৯৯০ পরিবর্তিত তারিখ: ০৭-০১-১৯৯১	২৭-০২-১৯৯১	৫২
৬	ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-১৯৯৬	প্রথমবার: ০৩-১২-১৯৯৫ দ্বিতীয়বার: ১৫-১২-১৯৯৫ তৃতীয়বার: ০২-০১-১৯৯৬ সর্বশেষ: ০৮-০১-১৯৯৬	১৫-০২-১৯৯৬	৩৯
৭	সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-১৯৯৬	২৭-০৪-১৯৯৬	১২-০৬-১৯৯৬	৪৭
৮	অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০০১	১৯-০৮-২০০১	০১-১০-২০০১	৪২
৯	নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০০৮	প্রথমবার: ০২-১১-২০০৮ দ্বিতীয়বার: ২০-১১-২০০৮ সর্বশেষ: ২৩-১১-২০০৮	২৯-১২-২০০৮	৩৭
১০	দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০১৪	২৫-১১-২০১৩	০৫-০১-২০১৪	৪২
১১	একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০১৮	১২-১১-২০১৮	৩০-১২-২০১৮	৪৯
১২	দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০২৪	১৫-১১-২০২৩	০৭-০১-২০২৪	৫২

সুপারিশ

সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনা ও প্রার্থীর দাখিলকৃত কাগজপত্র সঠিকভাবে যাচাই-বাছাইসহ অন্যান্য কার্যাদির জন্য *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২-এর অনুচ্ছেদ ১১(১) এ নির্বাচনি তফসিলের সময়সীমা নিম্নরূপ হতে পারে:

১. নির্বাচনি তফসিলের প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ থেকে মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখের সময়সীমা বৃদ্ধি করে ১০ (দশ) কার্যদিবস করা।

২. মনোনয়নপত্র দাখিল হতে বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্নের সময়সীমা বৃদ্ধি করে ০৭ (সাত) কার্যদিবস করা।

৩. বাছাইয়ের পর থেকে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সময়সীমা বৃদ্ধি করে ১০ (দশ) কার্যদিবস করা।

৪. প্রার্থিতা প্রত্যাহার তারিখ থেকে ভোটগ্রহণের তারিখের সময়সীমা বৃদ্ধি করে কমপক্ষে ২১ (একুশ) কার্যদিবস করা।

৫. প্রার্থীর প্রচার-প্রচারণার সময়সীমা সর্বোচ্চ পনেরো (১৫) দিন করা।

৭.৪ প্রার্থীর যোগ্যতা-অযোগ্যতা

নির্বাচনে গুণগতমান অনেকাংশেই নির্ভর করে নির্বাচনে কোন ধরনের প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তার ওপর। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা সৎ ও যোগ্য হলে ভোটারা তাদের পছন্দমতো প্রার্থী সহজেই বেছে নিতে পারেন। অনেক দেশে ভোটাররা ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্ন প্রার্থীকে (clean candidate) বেছে নেন। ফলে নির্বাচনে বিশৃঙ্খলা, হানাহানি, জালভোট, কেন্দ্র দখল ইত্যাদি বহুলাংশে হ্রাস পায়। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে সৎ ও যোগ্য প্রার্থী মনোনয়ন দিয়ে নির্বাচনকে পরিচ্ছন্ন ও গ্রহণযোগ্য করার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রাখতে পারে। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে এ ব্যাপারে খোলামেলা মতবিনিময় করেছে।

বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৬ এবং *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২-এর ১২ ধারায় প্রার্থীর যোগ্যতা ও অযোগ্যতার মাপকাঠি নির্ধারিত করা হয়েছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য একজন প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক এবং তার বয়স কমপক্ষে পঁচিশ বছর পূর্ণ হতে হবে। এগুলো যোগ্যতার প্রাথমিক শর্ত হিসেবে বিবেচিত। তবে অযোগ্যতার ক্ষেত্রে আরও কঠোর ও বিস্তারিত বিধান রয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তি মানসিক ভারসাম্যহীন হন, দেউলিয়া বা ঋণখেলাপি হিসেবে চিহ্নিত হন, কিংবা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত হয়ে লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, তবে তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। তাছাড়া, যারা ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নন কিংবা দ্বৈত নাগরিকত্ব বহন করেন অথবা বিদেশি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন, তারাও নির্বাচনের জন্য অযোগ্য বলে গণ্য হবেন।

প্রার্থীর নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোনো ব্যক্তি যদি ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে দুই বছরের কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন এবং তার মুক্তিলাভের পর পাঁচ বছর অতিবাহিত না হয়, তবে তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না। তদুপরি, ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী আদেশ বা ১৯৭৩ সালের বিশেষ অপরাধ আইনের অধীনে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অযোগ্য। দলীয় প্রার্থীর বাইরে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার বিধানও আমাদের আইনে আছে।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এ আরও কিছু অতিরিক্ত যোগ্যতা-অযোগ্যতার মানদণ্ড আরোপ করা হয়েছে। উপরিউক্ত আদেশের ১২ ধারা অনুযায়ী, সরকারকে কোনো মালামাল সরবরাহ করতে চুক্তিবদ্ধ; সরকারের জন্য কোনো কাজ বা দায়িত্ব পালনে চুক্তিবদ্ধ; সরকারের সঙ্গে চুক্তি বা মালামাল সরবরাহের কারণে কোনো প্রতিষ্ঠানের অর্জিত মুনাফার অংশ পান এমন ব্যক্তি; ব্যক্তি বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মালিক/পরিচালক হিসেবে ঋণখেলাপি; এবং দুর্নীতির কারণে সরকারি কিংবা সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের চাকরি থেকে বরখাস্তকৃত, অপসারিত বা বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা বরখাস্ত, অপসারণ ও বাধ্যতামূলক অবসরের পর পাঁচ বছর অতিবাহিত না হলে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। এ ছাড়া ধারা ৭৩, ৭৪, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪ ও ৮৬-এর অধীনে 'দুর্নীতিমূলক আচরণ' বা 'করাপ্ট প্র্যাক্টিসেস' ও বেআইনি আচরণ বা 'ইল্লিগ্যাল প্র্যাক্টিসেস'-এর জন্য অন্যূন দুই বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিরা মুক্তিলাভের পর পাঁচ বছর অতিবাহিত না হলে সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অযোগ্য হবেন।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ সংশোধনের লক্ষ্যে ২০০৭ সালে নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন অংশীজনদের সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনা করে। এসব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২-এর ধারা ১২-তে কয়েকটি নতুন সংযোজনী অধ্যাদেশের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এসব সংযোজনীর ফলে কোনো ব্যক্তি সংসদ নির্বাচনে অযোগ্য হবেন, যদিঃ কোনো বেসরকারি সংস্থার বা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী থাকা অবস্থায় অথবা পদ থেকে পদত্যাগ, অবসর কিংবা পদচ্যুত হওয়ার পর তাঁর তিন বছর অতিবাহিত না হয়; সরকারি চাকরি হতে পদত্যাগ বা বরখাস্ত, অপসারিত, বাধ্যতামূলকভাবে অবসরপ্রাপ্ত কিংবা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল হওয়ার পর তিন বছর অতিবাহিত না হয়; ব্যক্তিগতভাবে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার ১৫ দিন আগ থেকে যেকোনো সেবা প্রদানকারী সংস্থার বিলখেলাপি হিসেবে চিহ্নিত হন; কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে গৃহীত কৃষিঋণ ব্যতীত অন্য সব ব্যক্তিগত ও ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির অংশীদার বা পরিচালক হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার তারিখের পূর্ববর্তী ১৫ দিনের মধ্যে ঋণগ্রহীতা হিসেবে কিস্তি পরিশোধে তিনি খেলাপি হন; এবং জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আদালত/ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক যুদ্ধাপরাধী হিসেবে দণ্ডিত হন।

অতীতে দেখা গেছে যে, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত অনেক ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের বিল পরিশোধ করেন না। এসব 'ফ্রি লোডাদের' (ফ্রি পেতে অভ্যস্থদের) নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া থেকে অযোগ্য করা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা তাদের দায় এড়াতে না পারে। এমনিভাবে ঋণখেলাপিদের ব্যাপারেও, বিশেষত যারা ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়া আবশ্যক। অতীতে দেখা গেছে যে, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার ১৫ দিন আগে তামাদি ঋণের কিছু পরিমাণ অর্থ কিস্তি হিসেবে পরিশোধ করে একজন অভ্যাসগত ঋণখেলাপি ব্যক্তি নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে যান, গত নির্বাচন কমিশনের সময়ে এটিকে আরও শিথিল করা হয়। এসব শিথিলতার অবসান হওয়া আবশ্যক, যাতে ব্যাংক লুটেরারা আমাদের আইন প্রণয়নকারী না হতে পারেন।

ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১-এর ধারা ৫(গগ) অনুযায়ী, 'খেলাপি ঋণগ্রহীতা' অর্থ কোনো দেনাদার ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি যাহার নিজের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদত্ত অগ্রীম, ঋণ বা অন্য কোনো আর্থিক সুবিধা বা উহার অংশ বা উহার উপর অর্জিত সুদ বা উহার মুনাফা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত সংজ্ঞা অনুযায়ী মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার ৬ (ছয়) মাস অতিবাহিত হইয়াছে।" অর্থাৎ কোনো ঋণগ্রহীতা তার খেলাপি ঋণ মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার ছয় মাস আগে পুনঃতফসিলিকরণ না করলে তাকে ঋণ খেলাপি হিসেবে নির্বাচনের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা যৌক্তিক হবে।

দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদের বিষয়ে আসা যাক। এ বিষয়টি নিয়ে আমাদের উচ্চ আদালতে একাধিক মামলা হয়েছে, যদিও বিচারের রায় অস্পষ্ট, এমনকি পরস্পরবিরোধী।[৬০] তবে সব ক্ষেত্রেই নির্বাচন কমিশন ও আদালত দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আপিল দায়ের করে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হতে কিংবা সংসদ সদস্য পদে বহাল থাকতে দিয়েছেন।

মাহমুদুল ইসলামের মতে, যদি দুই বছরের অধিক দণ্ডপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান, তাহলে তাকে সে লক্ষ্যে আদালতের কাছে আবেদন করতে এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৬১(ক) ও ৪২৬ ধারার আওতায় তার কনভিকশনের বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ পেতে হবে।[৬১] কারণ, আপিল হলেও কনভিকশন বহাল থেকে যায় এবং আপিলকারী দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী হিসেবে গণ্য হন। এ ছাড়াও মাহমুদুল ইসলামের মতে, কনভিকশন ও দণ্ড স্থগিত চাইলেই দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীর তা প্রাপ্য নয়। এ ক্ষেত্রে আদালতকে অপরাধের মাত্রা এবং বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিতে হবে।

সম্প্রতি *মো. মামুন ওয়ালিদ হাসান বনাম রাষ্ট্র* মামলায় (ক্রিমিনাল মিসলেনিয়াস কেস ১০০০৯/ ২০০৭) বিচারপতি মো. রেজাউল হক ও বিচারপতি মো. খোরশেদ আলম সরকার রায় দেন যে, হাইকোর্ট বিশেষ বিবেচনায় কনভিকশন স্থগিত করতে পারেন, যা নিম্ন আপিল আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত। এ ক্ষেত্রে দণ্ডপ্রাপ্তকে আবেদন করতে হবে এবং দেখাতে হবে যে কনভিকশন স্থগিত না হলে অবিচার হবে এবং তিনি অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হবেন।

তবে নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি কখন থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে অযোগ্য হবেন – বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রথম দণ্ডপ্রাপ্ত হওয়ার পর না আপিল – প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর তা এখনো অমীমাংসিতই রয়ে গেছে; যদিও সব ক্ষেত্রেই দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আপিল করে সাংসদ নির্বাচিত হতে বা দায়িত্ব পালন করতে বিরত করা হয়নি। অর্থাৎ বিদ্যমান আইনি কাঠামোতে আদালত কর্তৃক শাস্তিপ্রাপ্ত একজন ব্যক্তির প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা নির্ভর করবে: (১) তাঁর 'সেনটেন্স' বা দণ্ড স্থগিত হয়েছে কি না; (২) তাঁর 'কনভিকশন' বা দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ওপর স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে কি না, এবং (৩) সর্বোপরি নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের ওপর। এসব অস্পষ্টতার করণে বিষয়টি নিয়ে আইনি সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরি। দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীরা সংসদ সদস্য হয়ে যাতে বাংলাদেশের জনগণের ভাগ্যবিধাতা না হতে পারেন, তাই আমরা আরপিও'র ১২ ধারা সংশোধন করে দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদের বিচারিক আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হওয়ার দিন দণ্ডপ্রাপ্তির শুরু থেকেই সংসদ নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণার পক্ষে। একইভাবে আমরা আইসিটি আইনে (আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে) দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির দোষী সাব্যস্ত হওয়ার শুরু থেকেই সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য করার পক্ষে।

গত ১৫ বছরের শেখ হাসিনার সরকারের আমলে বাংলাদেশে সংগঠিত মানবতা বিরোধী অপরাধের নৃশংস ইতিহাস আমাদের সামনে আরেকটি নতুন দ্বিধা-দ্বন্দ্বমূলক ইস্যু সৃষ্টি করেছে। এই সময়ে, বিশেষত গত ১০ বছরে বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুম, অমানবিক নির্যাতন, সাংবাদিকদের/মানবাধিকারকর্মী ওপর হামলা ইত্যাদির মতো গুরুতর মানবতা বিরোধী অপরাধী কর্মকাণ্ড ঘটেছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের মাধ্যমে এদেরকে বিচারের আওতায় আনার চেষ্টা হচ্ছে এবং এদের মধ্যে যারা আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হবেন তারা অব্যশ্যই সংসদ নির্বানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অযোগ্য হবেন। তবে আমরা মনে করি যে, গত দেড় দশকে আমাদের সমাজে যে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করতে হলে যারা এসব গুরুতর অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং এখনও এর দায় স্বীকার করেননি বা ক্ষমা চাননি, তাদেরকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখা আবশ্যক। কারণ 'হাউজ অব দ্য পিপল' বা মহান জাতীয় সংসদের সদস্য হওয়ার যোগ্যতার মাপকাঠি উচ্চতর হওয়া আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে অবশ্য বড় বিবেচ্য বিষয় হাজার বছরের পুরানো জুরিসপ্রুডেন্স (বিচারিক নীতি) যে একজন ঘৃণ্যতম ব্যক্তিও নিরাপরাধ যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি বিচারিক প্রক্রিয়ায় দোষী সাব্যস্ত না হন। এমনি দ্বিধা-দ্বন্দ্বাত্মক পরিস্থিতিতে আমরা বিশেষজ্ঞদের স্মরণাপন্ন হয়েছি। এ প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ হলো সংবিধানের ৪৭(৩) ও ৪৭ক-এর আলোকে এবং ৬৬(২)(ছ) অনুচ্ছেদের অধীনে একটি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এসব অপরাধীদেরকে, যাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল মানবতা বিরোধী অপরাধের অভিযোগপত্র গ্রহণ করেছে, আইনানুগভাবে সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে তাদেরকে বিরত রাখা। এর অনেক নজির অনেক আছে। এ পরামর্শ যৌক্তিক বলে আমাদের কাছে মনে হয়েছে এবং আমরা তা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। প্রসঙ্গত, অনেক দেশেই, এমনকি আমাদের প্রতিবেশী ভারতেও আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত অপরাধীদের নির্বাচনি অঙ্গন থেকে দূরে রাখার চেষ্টা চলছে।[৬২]

---

[৬০] দেখুন, *এ কে এম মাইদুল ইসলাম বনাম বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন*, [৪৮ ডিএলআর (এডি) ১৯৯৬]; *হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বনাম আবদুল মুক্তাদির চৌধুরী*, [৫৩ ডিএলআর (২০০১)]; *মহিউদ্দিন খান আলমগীর বনাম বাংলাদেশ* [৬২ ডিএলআর (এডি) ২০১০]।

[৬১] মাহমুদুল ইসলাম, *কনস্টিটিউশনাল ল অব বাংলাদেশ* (ঢাকা: মল্লিক ব্রাদার্স, ২০১২), পৃ. ৪৬১।

[62] ভারতের নির্বাচন কমিশন ২০০৪ সালে প্রস্তাব করে: 'The Commission is of the view that keeping a person, who is accused of serious criminal charges and where the Court is prima facie satisfied about his involvement in the crime and

উল্লেখ্য, সংসদ সদস্যগণ 'হাউজ অব দ্য পিপল' বা মহান জাতীয় সংসদের সদস্য, তাই তাদের জন্য যোগ্যতা মাপকাঠি উচ্চতর হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। এছাড়াও ভয়াবহ মানবতা বিরোধী অপরাধের দায়ে যাদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযোগপত্র গৃহীত হয়েছে, একটি দুর্বৃত্তমুক্ত বাংলাদেশ সৃষ্টির স্বার্থে তাদেরকে নির্বাচনি অঙ্গন থেকে দূরে রাখার কোনো বিকল্প নেই। বস্তুত এসব ভয়াবহ অপরাধীদের, সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হলে পুরো জাতির, বিশেষত যারা জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানে চরম আত্মত্যাগ করেছেন তাদের রক্তের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সমতুল্য হবে বলে আমরা মনে করি।

অংশীজনের সঙ্গে মতবিনিময়কালে বার বার করে প্রস্তাব এসেছে আদালত কর্তৃক ঘোষিত ফেরারী আসামীদেরকে নির্বাচনি অঙ্গন থেকে দূরে রাখার। এছাড়াও প্রস্তাব এসেছে বাংলাদেশের কারাগারে অন্তরিন রয়েছে এমন ব্যক্তিদের ছাড়া অন্য সব প্রার্থীর সশরীরে নির্বাচন কমিশনে এসে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার। নির্বাচনি ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে আমরা মনে করি যে এসব প্রস্তাব যৌক্তিক এবং এগুলো দুর্বৃত্তদেরকে দূরে রেখে আমাদের নির্বাচনি অঙ্গনকে কলুষমুক্ত করতে সহায়তা করবে। এ লক্ষ্যে আরপিও'র ১৩ ধারা সংশোধন করা আবশ্যক।

নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিতে হয়। মনোনয়নপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হয় একটি হলফনামা, যাতে প্রার্থীদের তাদের নিজেদের এবং নির্ভরশীলদের সম্পর্কে আট ধরনের তথ্য দিতে হয়। এই হলফনামার ছকটি এখন অসম্পূর্ণ। যেমন, এটিতে বিদেশে থাকা সম্পদের তথ্য দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

তৃণমূলের শিক্ষকদের মধ্যে দলীয় রাজনীতির ব্যাপক বিস্তার আমাদের সমাজে চরমভাবে বিভক্তি সৃষ্টি করেছে। এছাড়াও শিক্ষকদের রাজনীতি আমাদের গ্রামীণ শিক্ষার মানে ধস নামার অন্যতম কারণ। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকদেরকে শ্রেণিকক্ষে পাঠ দেওয়ার পরিবর্তে দলীয় রাজনীতি নিয়েই ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। তাই আমরা স্কুল এবং কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে দলীয় রাজনীতির অবসানের পক্ষে। তাই আমরা এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে হলে শিক্ষকতার চাকরি থেকে পদত্যাগের পক্ষে।

সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা এক ব্যক্তির একাধিক আসন থেকে প্রার্থী হওয়ার বিপক্ষে। কারণ এ ধরনের প্রার্থিতা এবং পরবর্তীতে উপ-নির্বাচন নির্বাচনি ব্যয় বৃদ্ধি করে। একইসঙ্গে এ সংস্কৃতি প্রার্থিতার মানেও সাধারণত অবনতি ঘটায়। এছাড়াও আমরা স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের প্রার্থী হওয়ার শর্তে শিথিলতা আনার পক্ষে।

পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে ১২৫(গ) অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হয়, যার মাধ্যমে নির্বাচনের সময়ে প্রার্থীর বাছাই প্রক্রিয়ায় যোগ্যতা-অযোগ্যতা নিরূপণে আদালতের অযাচিত হস্তক্ষেপ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। সম্প্রতি হাইকোর্ট কর্তৃক পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিলের ফলে এ বিধানটি সংবিধান থেকে বিলুপ্ত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। তাই আপিল প্রক্রিয়ায় এবং পরবর্তীতে সংবিধান সংশোধনের সময়ে এ বিধানটি যেন রক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলকে এদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

সুপারিশ

১. অভ্যাসগত ঋণখেলাপি ও বিল খেলাপিদের প্রার্থী হওয়া থেকে বিরত রাখা। বিশেষত ঋণখেলাপিদের ক্ষেত্রে তাদের তামাদি ঋণ মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার ছয় মাস আগে পরিপূর্ণভাবে শোধ করার বিধান করা। নির্বাচনের পরে আবার ঋণখেলাপি হওয়াকে সংসদ সদস্য পদে থাকার অযোগ্য ঘোষণার বিধান করা। বিলখেলাপিদের নির্বাচনের একমাস পূর্বে এক হাজার টাকার অধিক পরিমাণের সব তামাদি বিল শোধ করার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা।

২. আরপিও'র ১২ ধারায় কোনো আদালত কর্তৃক ফেরারি আসামি হিসেবে ঘোষিত ব্যক্তিদের সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া থেকে বিরত রাখা।

৩. ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে জামিনে মুক্তদেরকে উপযুক্ত আদালত কর্তৃক জামিন লাভের সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করার বিধান করা। কারা অন্তরিনদের ক্ষেত্রে আরপিও অনুযায়ী মনোনয়নপত্রের সঙ্গে যে সকল দলিলাদি ও কাগজপত্র জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক তা জেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত করার বিধান করা।

৪. বেসরকারি সংস্থার কার্যনির্বাহী পদে আসীন ব্যক্তিদের প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে ওই পদ থেকে তিন বছর আগে অবসর গ্রহণ সংক্রান্ত আরপিও'র ধারা বাতিল করা।

৫. সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৬(২)(ঘ) এর অধীনে নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে বিচারিক আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির দোষী সাব্যস্ত হওয়ার শুরু থেকেই সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য করা।

---

consequently framed charges, out of electoral arena would be a reasonable restriction in greater public interests. There cannot be any grievance on this.' (নির্বাচন কমিশন মনে করে যে, ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে, যার বিরুদ্ধে আদালত দৃশ্যত অপরাধের প্রমাণ পেয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র গ্রহণ করেছে, জনস্বার্থে তাকে নির্বাচনি অঙ্গন থেকে দূরে রাখা যৌক্তিক। এব্যাপারে অভিযোগ করার কোনো সুযোগ নেই।)

৬. সম্প্রতি সংশোধিত আইসিটি আইনে (আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে) দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির দোষী সাব্যস্ত হওয়ার শুরু থেকেই সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য করা।

৭. আইসিটি আইনের ৯(১) ধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে আদালতে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগপত্র গৃহীত হলে এবং তিনি এ অভিযোগে নির্দোষ প্রমাণিত না হলে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য করা।

৮. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পদত্যাগ না করে সংসদ সদস্য পদে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য করা।

৯. তরুণ, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু, শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য শতকরা ১০ ভাগ মনোনয়নের সুযোগ তৈরির বিধান করা।

১০. স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১ শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষর জমা দেওয়ার বিধানের পরিবর্তে ৫০০ ভোটারের সম্মতির বিধান করা এবং এ ক্ষেত্রে একক কিংবা যৌথ হলফনামার মাধ্যমে ভোটারদের সম্মতি জ্ঞাপনের বিধান করা।

১১. একাধিক আসনে কোনো ব্যক্তির প্রার্থী হওয়ার বিধান বাতিল করা।

১২. নির্বাচনের পরে নির্বাচন কমিশনের জন্য হলফনামার তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা এবং হলফনামায় মিথ্যা তথ্য দেওয়ার বা তথ্য গোপনের দায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নির্বাচন বাতিল করার বিধান করা।

১৩. হলফনামায় মিথ্যা তথ্য দেওয়ার কিংবা তথ্য গোপনের কারণে আদালত কর্তৃক কোনো নির্বাচিত ব্যক্তির নির্বাচন বাতিল করা হলে ভবিষ্যতে তাকে নির্বাচনে অযোগ্য করার বিধান করা।

১৪. সরকারের কোনোরূপ শেয়ার আছে এরূপ প্রতিষ্ঠানে কেউ কর্মরত থাকলে তিনি যদি পদত্যাগ না করে থাকেন, তাহলে তাকে নির্বাচনে অংশগ্রহণে অযোগ্য করা।

৭.৫ ভোটকেন্দ্র ও ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা

ভোটকেন্দ্রঃ সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য ভোটকেন্দ্র একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমানে নির্বাচন কমিশন গড়ে ৩,০০০ (তিন হাজার) ভোটারের জন্য একটি করে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করে, যেখানে সাধারণত ৫০০ (পাঁচশত) পুরুষ ভোটারের জন্য একটি এবং ৪০০ (চারশত) নারী ভোটারের জন্য একটি কক্ষ নির্ধারণ করা হয়। তবে পাবর্ত্য এলাকা এবং দুর্গম চরাঞ্চলের ক্ষেত্রে ভোটার সংখ্যা এবং কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা ভৌগোলিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা হয়।

বর্তমান বিধান অনুযায়ী ভোটকেন্দ্র স্থাপনের ক্ষেত্রে কতগুলো নীতি অনুসরণ করার কথা উল্লেখ রয়েছে। ভোটকেন্দ্র স্থাপনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা, ভোটারদের সুবিধা এবং ভোটার এলাকাগুলোর সঙ্গে কেন্দ্রের সংলগ্নতা বজায় রাখার বিষয়টি সর্বাগ্রে বিবেচনা করা হয়। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নামে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলা হয় এবং কোনো রাজনৈতিক নেতার বাড়ির সংলগ্নে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হয় না। বিশেষত, প্রতিবন্ধী, বয়স্ক ও নারী ভোটারদের জন্য কেন্দ্রে প্রবেশ এবং ভোট প্রদান সহজ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিধান রয়েছে। তদুপরি, সাধারণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত নয় এমন স্থানে ভোটকেন্দ্র স্থাপন পরিহার করার নির্দেশনা রয়েছে।

গত কয়েকটি নির্বাচনের অভিজ্ঞতা বলছে যে, ভোটকেন্দ্র এবং এর চৌহদ্দির ভেতরে কিছু বিশেষ প্রার্থী বা দলের কর্মীদের অহেতুক ঘুরাঘুরি, জটলা সৃষ্টি এবং ভোটারদের প্রবেশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ঘটনা ঘটেছে। এ ধরনের অনিয়ম নির্বাচনি প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। তাই, ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা জোরদার করা এবং নির্বাচন কমিশনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রগুলো সুরক্ষিত রাখা অত্যন্ত জরুরি।

ভোটকেন্দ্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে এসব নীতিমালা কঠোরভাবে মেনে চলা ও সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হলে, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের সম্ভাবনা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে। তদুপরি, ভোটকেন্দ্রের নীতিমালায় প্রয়োজনীয় সংস্কার আনয়ন এবং স্থানীয় বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন নির্দেশনা প্রণয়ন করা সময়োপযোগী পদক্ষেপ হতে পারে।

সুপারিশ

১. সরাসরি জেলা নির্বাচন অফিসারের তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত রাখা।

২. প্রতিটি নির্বাচনে পূর্বে ভোটকেন্দ্রের তালিকা হালনাগাদ করার জন্য সরেজমিন তদন্ত করা।

৩. ভোটকেন্দ্রের তালিকা ভোটারের জ্ঞাতার্থে বহুল জনসমাগম হয় এমন স্থানে এলাকাভিত্তিক ভোটকেন্দ্রের তালিকা টাঙ্গিয়ে দেওয়া।

৪. ভোটকেন্দ্রের বিষয়ে কোনো লিখিত আপত্তি/আবেদন/সুপারিশ থাকলে, তাও সরেজমিন যাচাই করে নিষ্পত্তি করা।

৫. নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো অবস্থাতেই সংরক্ষিত ভোটকেন্দ্রের তালিকায় তফসিল ঘোষণার পূর্বে বা পরে কোনোরূপ পরিবর্তন/পরিবর্ধন না করার বিধান করা।

৬. ভোটকেন্দ্র বা ভোটকেন্দ্রের জন্য নির্ধারিত চৌহদ্দির ভিতরে অনুমোদিত কোনো ব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্য কোনো ব্যক্তি/কোনো প্রার্থী/প্রার্থীর কর্মী/কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী বা কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি অহেতুক ঘুরাফেরা করতে পারবে না এমন বিধান করা।

৭. ভোটকেন্দ্র বা ভোটকেন্দ্রের জন্য নির্ধারিত চৌহদ্দির ভিতরে অননুমোদিত কোনো ব্যক্তি ঘুরাফেরা/জটলা করা/ভোটারের যাতায়াতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হলে প্রিজাইডিং অফিসার ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যগণ অনতিবিলম্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে উক্ত এলাকা হতে অপসারণ করবেন এবং প্রয়োজনে গ্রেফতার করবেন এমন বিধান করা।

৮. ভোটকেন্দ্রে অনিয়ম ও বেআইনি কার্যক্রম ঘটলে প্রিজাইডিং অফিসার অনতিবিলম্বে ভোট গ্রহণ বন্ধ করে দিবেন এবং রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করবেন এমন বিধান করা।

রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার: একটি নির্বাচনি এলাকার নির্বাচন পরিচালনার পুরো দায়িত্বে থাকেন একজন রিটার্নিং অফিসার এবং একটি ভোটকেন্দ্রের ভোটগ্রহণের সার্বিক দায়িত্বে থাকেন একজন প্রিজাইডিং অফিসার এবং প্রতি কক্ষের জন্য থাকেন একজন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও দুইজন পোলিং অফিসার। এছাড়াও প্রার্থীর পক্ষে প্রতি কক্ষের জন্য থাকেন একজন পোলিং এজেন্ট। নির্বাচনি এলাকা আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে থাকেন আইনশৃঙ্খলা প্রয়োগকারী সংস্থা এবং প্রতি ভোটকেন্দ্রের জন্য থাকে নির্ধারিত সংখ্যক আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য।

নির্বাচন সংস্কার কমিশন দেশের বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধি, নির্বাচনের বিভিন্ন অংশীজন ও বিগত নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করে। রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকেও লিখিতভাবে মতামত আহ্বান করা হয়। এছাড়াও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাধ্যমে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার বিষয়ে জাতীয় জরিপ করানো হয়। অংশীজন/মিডিয়ার প্রতিনিধি/রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তাকে রিটার্নিং অফিসার করার পক্ষে গুরুত্বারোপ করেন। জরিপে নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তাদের রিটার্নিং অফিসার নিয়োগের পক্ষে ৪৬.৭৬ ভাগ এবং জেলা প্রশাসক নিয়োগের পক্ষে ৪৪.০৪ ভাগ মানুষ মতামত প্রদান করেছে।

সুপারিশ

১. কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তা বা অন্য কোনো সার্ভিসের কর্মকর্তা বা প্রশাসনের কোনো কর্মকর্তার মধ্য হতে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করা;

২. সর্বোচ্চ তিনটি নির্বাচনি এলাকার জন্য একজন রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করা;

৩. সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগের জন্য নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তা, মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তা ও অন্য যে কোনো সার্ভিসের কর্মকর্তাদের মধ্য হতে নিয়োগ করা।

ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা, নির্বাচনি এজেন্ট, পোলিং এজেন্ট: ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের সার্বিক দায়িত্বে থাকেন একজন প্রিজাইডিং অফিসার। সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে ভোটকেন্দ্রের যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদনের দায়িত্ব এবং ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার প্রিজাইডিং অফিসারকে দেওয়া হয়েছে।

আইনানুযায়ী ভোটকেন্দ্রের কেন্দ্রবিন্দু ব্যক্তি হিসেবে যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদনের দায়িত্ব এবং ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার প্রিজাইডিং অফিসারকে দেওয়া হয়েছে। মূলত প্রিজাইডিং অফিসারের সততা, নিরপেক্ষতা, দক্ষতা ও সাহসের ওপর একটি কেন্দ্রের ভোটগ্রহণের সুষ্ঠুতা নির্ভর করে। আইন ও বিধি প্রয়োগে কিংবা পরিকল্পনার সামান্যতম ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সিদ্ধান্তহীনতা নির্বাচনি পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং নির্বাচনি ফলাফলের বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এ লক্ষ্যে প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে:

সুপারিশ

১. প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা।

২. প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের স্বল্পতা দেখা দিলে দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়োগ করা।

৩. প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার যদি ইতঃপূর্বে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রার্থীর অধীনে চাকরিতে নিয়োজিত থাকেন বা অতীতে নিয়োজিত ছিলেন সেক্ষেত্রে উক্ত কর্মকর্তাকে কোনো অবস্থাতেই কোনো ভোটকেন্দ্রের ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ না করা। কোনো প্রার্থীর নিকটাত্মীয়কেও ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ না করা।

৪. সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগের ক্ষেত্রে কমিশনের নিজস্ব নীতিমালা অনুসরণ করা।

৫. কোনো গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের নামের তালিকা যাচাই-বাছাই করা বা সংস্থাকে তালিকা সরবরাহ থেকে বিরত রাখা।

৬. প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী পোলিং এজেন্টের নামের তালিকা (কেন্দ্রের নাম ব্যতীত) রিটার্নিং অফিসারের কাছে জমা প্রদান করা এবং রিটার্নিং অফিসার আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সভা করে সকল পোলিং এজেন্টের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন এমন বিধান করা।

৭. পোলিং এজেন্টকে কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি/প্রার্থী/আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য দ্বারা ভয়ভীতি/কেন্দ্রে প্রবেশে প্রতিবন্ধকতা/জরবদস্তি/হয়রানি করা হলে, রিটার্নিং অফিসার সরেজমিন তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এমন বিধান করা।

৭.৬ প্রার্থী মনোনয়ন

নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য একজন ব্যক্তি দুইভাবে প্রার্থী হতে পারেন, রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে অথবা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে। রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হতে হলে দলীয় মনোনয়ন পেতে হয়, যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত প্রতিযোগিতাপূর্ণ এবং কখনো কখনো বিতর্কিত একটি প্রক্রিয়া। রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন পাওয়ার জন্য দলের বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মী থেকে শুরু করে দলের বাইরের ব্যক্তিরাও ব্যাপক তৎপরতা চালান। তবে দলীয় মনোনয়ন লাভে ব্যর্থ অনেকেই স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। সৎ, যোগ্য এবং জনকল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তিদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হলে দলীয় মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় এসব গুণের প্রতিফলন ঘটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাস্তবতা হলো, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দলগুলোর মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় যোগ্যতার চেয়ে মনোনয়ন বাণিজ্য প্রাধান্য পায়, যা সৎ ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে বড় একটি বাধা তৈরি করে।

২০০৮ সালে *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ-৯০খ এ প্রত্যেকটি নির্বাচনি এলাকার ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, থানা, উপজেলা বা, ক্ষেত্রমত, জেলা কমিটির দলীয় সদস্যগণ কর্তৃক প্রস্তুত প্যানেল হতে দলের কেন্দ্রীয় সংসদীয় বোর্ড কর্তৃক প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত করার বিধান আরপিও সংশোধন করে সংযোজন করা হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রাজনৈতিক দলগুলো আরপিও'র এ বিধানের প্রতি তেমন ভ্রুক্ষেপ করেনি। এছাড়াও অনুচ্ছেদ ১২(৩ক)-তে রাজনৈতিক দলগুলো প্রাথমিকভাবে একাধিক প্রার্থী মনোনয়ন প্রদান করার বিধান রয়েছে। রাজনৈতিক দলের মনোনয়নের ক্ষেত্রে মনোনয়ন বাণিজ্যের ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি থেকে উত্তরণের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

সুপারিশ

১. আইনি হেফাজতে থাকা ব্যতীত সকল প্রার্থীর সশরীরে মনোয়নপত্র জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা করা।

২. কোনো নির্বাচনি এলাকার দলীয় মনোনয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার দলের সদস্যদের গোপন ভোটের মাধ্যমে তিন সদস্যের একটি প্যানেল তৈরি করা এবং সে প্যানেল থেকে কেন্দ্রীয় মনোনয়ন বোর্ড দলের মনোনয়ন চূড়ান্ত করার বাধ্যবাধকতা করা।

৩. মনোনয়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের তিন বছরের সদস্য থাকা বাধ্যতামূলক করার বিধানটি পুনরায় সংযোজন করা।

৪. রাজনৈতিক দলের মনোনয়নের ক্ষেত্রে মনোনয়ন বাণিজ্যের প্রভাব দূর করার লক্ষ্যে দলের পক্ষ থেকে প্রতি আসনে শুধু একজনের মনোনয়ন দেওয়া।

৫. নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে তারা কোনোরূপ মনোনয়ন বাণিজ্যে নিয়োজিত হননি এই মর্মে একটি হলফনামা নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়ার বিধান আরপিওতে অন্তর্ভুক্ত করা।

৭.৭ (ক) বিদ্যমান আসনভিত্তিক পদ্ধতিতে প্রার্থী বাছাই/বাতিল/আদালতের ভূমিকা

বিদ্যমান আইনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যে কোনো প্রার্থীর মনোনয়নপত্র চূড়ান্ত করার এখতিয়ার নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচন কমিশনের প্রার্থিতা বাতিল ও বৈধ করার সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের প্রতিকারের একমাত্র পথ হলো নির্বাচনি বিরোধ হিসেবে নির্বাচনের পরে তা নির্বাচনি ট্রাইব্যুনালের দ্বারস্থ হওয়া। শুধু ম্যালিস ইন ল (অবৈধ/অপপ্রয়োগ) ও কোরাম নন জুডিসের (এখতিয়ার বহির্ভূত) আদালতের হস্তক্ষেপ এখতিয়ার থাকবে। কিন্তু ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়ে আদালত প্রার্থীর মনোনয়ন চূড়ান্ত করার ব্যাপারে অযাচিতভাবে ব্যাপক হস্তক্ষেপ করে। ফলে নির্বাচন ব্যবস্থাপনায় জটিলতা এবং অব্যবস্থাপনার সৃষ্টি হয়। তাই আমরা বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের *একেএম মাইদুল ইসলাম বনাম বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন* মামলার রায়ের প্রেক্ষিতে প্রার্থী মনোনয়নের বৈধতা চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে আদালতের হস্তক্ষেপের সুযোগ সীমিত করার লক্ষ্যে বিধানটি আরপিওতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

সুপারিশ

১. আপিল নিষ্পত্তির পর কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে এমন বিধান করা।

২. যদি কোনো সংক্ষুব্ধ প্রার্থী কমিশনের আপিলের আদেশের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করে, তাহলে উক্ত মামলাটি প্রতীক বরাদ্দের পূর্বে নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা গ্রহণ করা।

৩. নতুবা এই ধরনের মামলা নির্বাচনের ফলাফল গেজেটে প্রকাশিত হবার পর নির্বাচনি বিরোধ হিসেবে বিবেচনা করা।

৪. হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিলের প্রেক্ষাপটে আপিল প্রক্রিয়ায় অনুচ্ছেদ **১২৫(গ)** বহাল রাখার প্রচেষ্টা করা ["**১২৫(গ)**। কোনো আদালত, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হইয়াছে এরূপ কোনো নির্বাচনের বিষয়ে, নির্বাচন কমিশনকে যুক্তিসঙ্গত নোটিশ ও শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া, অন্তর্বর্তী বা অন্য কোনোরূপে কোনো আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করিবেন না।"]

৫. হলফনামায় মিথ্যা তথ্য দিলে বা তথ্য গোপন করলে প্রার্থীর মনোনয়নপত্র/প্রার্থিতা/নির্বাচন বাতিল করা।

(খ) হলফনামা

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, **১৯৭২** অনুযায়ী, নির্বাচনে আগ্রহী প্রার্থীদের মনোনয়পত্রের সঙ্গে হলফনামা আকারে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের খতিয়ান, আয়ের উৎস, নিজেদের এবং নির্ভরশীলদের সম্পদ ও দায়-দেনার তথ্য জমা দিতে হয়। এসব তথ্য প্রকাশের উদ্দেশ্য হলো, ভোটারদের ক্ষমতায়িত করা, যাতে তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং জেনে-শুনে-বুঝে ভোট দিতে পারেন। ভোটারদের এ ধরনের তথ্যভিত্তিক ক্ষমতায়নের গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতের সুপ্রিম কোর্টের মতে: 'নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হবে যদি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে ভোটাররা না জানে। তাদের 'এ' কিংবা 'বি'-এর পক্ষে ভোট দেওয়ার কোনো ভিত্তি থাকবে না। এ ধরনের নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না, নিরপেক্ষও হবে না।' আদালত আরও বলেন, 'গণতন্ত্র যাতে গুন্ডাতন্ত্র এবং উপহাসে পরিণত না হয়, তা নিশ্চিত করতে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য ভোটারদের তথ্য পাওয়া জরুরি।' [পিইউসিএল বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া (২০০৩) ৪এসসিসি]।

ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির এ অধিকার সহজে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, এর জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। ২০০৫ সালে বিচারপতি আবদুল মতিনের নেতৃত্বে বাংলাদেশ হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ *আবদুল মোমেন চৌধুরী ও অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ* মামলার (রিট পিটিশন নম্বর ২৫৬১/২০০৫) রায়ে সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের হলফনামার মাধ্যমে আট ধরনের ব্যক্তিগত ও আর্থিক তথ্য দেওয়ার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করেন। আদালত এসব তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারকে নাগরিকদের বাক্স্বাধীনতার অংশ হিসেবে রায় দেন।

কিন্তু উপরিউক্ত রায়কে ভণ্ডুল করার লক্ষ্যে আবু সাফা নামে এক দুর্বৃত্তের মাধ্যমে জালিয়াতি করে সম্পূর্ণ গোপনে আপিল করা হয়। মামলার মূল বাদীদের আপিলের ব্যাপারে নোটিশ দেওয়া হয়নি; নির্বাচন কমিশনকেও জানানো হয়নি। আপিলকারী ছিলেন একজন তৃতীয় পক্ষ; তৃতীয় পক্ষকে সাধারণত আপিল করতে দেওয়া হয় না। তৎসত্ত্বেও শুনানিতে মূল মামলার বাদীদের অনপুস্থিতিতেই লিভ টু আপিল একতরফাভাবে গৃহীত হয়। এ খবর শোনার পর মূল বাদীদের পক্ষ থেকে 'কেভিয়েট' দেওয়া হয়, যাতে পরবর্তী শুনানি তাদের অনপুস্থিতিতে না হয়। কিন্তু ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠেয় নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার মাত্র দু'দিন আগে, আপিল বিভাগের চেম্বার জজ বিচারপতি জয়নুল আবেদীন আবারও একতরফা শুনানির ভিত্তিতে হলফনামা প্রদানের ওপর স্থগিতাদেশ প্রদান করেন। ফলে ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা হলফনামা ছাড়াই মনোনয়নপত্র জমা দেন। এর পর ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ তারিখে ড. কামাল হোসেন 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক'-এর পক্ষে আপিলের গ্রহণযোগ্যতা চ্যালেঞ্জ করে আবু সাফার জালিয়াতির বিষয়টি উত্থাপন করতে গেলে আপিল বিভাগের পূর্ণ বেঞ্চ তাতে বাঁধ সাধেন এবং হাইকোর্টের রায় খারিজ করে দেন। এতে ড. কামাল হোসেন ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি রায়টি প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত আদালত কক্ষ ত্যাগ না করার ঘোষণা দেন। তাঁর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে একই দিনে আদালত রায়টি প্রত্যাহার করে এই নাটকীয়তার অবসান ঘটান।

এর পর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন হলে প্রধান বিচারপতি এম রুহুল আমিনের নেতৃত্বে আপিল বিভাগ আবু সাফাকে আদালতে হাজির করার নির্দেশ দেন, যা তাঁর আইনজীবীরা পালন করতে ব্যর্থ হন। এমনি প্রেক্ষাপটে আদালত ২০০৭ সালের **১১** ডিসেম্বর আপিলটি খারিজ করে দেন এই যুক্তিতে, যেহেতু আপিল আবেদনে একজন কাল্পনিক ব্যক্তির নাম এবং ভুয়া কাগজপত্র ব্যবহার করা হয়েছে, তাই এটি আপিলই হয়নি। এভাবে আদালতের নির্দেশে প্রার্থী সম্পর্কে ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত হয়।

হলফনামা প্রকৃতপক্ষে প্রার্থীদের আমলনামা হওয়ার কথা, কিন্তু দুঃখজনকভাবে সেটি হয়ে ওঠেনি। হলফনামা প্রদান নিছকই আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়েছে। হলফনামায় মিথ্যা তথ্য দিলে প্রার্থিতা বাতিলের বিধান থাকা সত্ত্বেও প্রার্থীদের এটিকে কখনো গুরুত্বের সঙ্গে দেখা যায়নি। অধিকাংশ প্রার্থীই হলফনামা সম্পূর্ণরূপে ও সঠিকভাবে পূরণ করেন না। নির্বাচন কমিশনও হলফনামার তথ্য যাচাই-বাছাই করা এবং তথ্যগুলো জনগণের কাছে পৌঁছানোর কাজকে গুরুত্বের সঙ্গে নেয়নি। হলফনামার তথ্যসমূহ কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রদানের ক্ষেত্রেও গড়িমসি লক্ষ করা গেছে।

হলফনামার বর্তমান ছকেও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন, স্থাবর সম্পদের ক্ষেত্রে অর্জনকালীন মূল্য দেখানো হয়, বর্তমান আনুমানিক মূল্য উল্লেখ করা হয় না। প্রার্থীদের নির্ভরশীল, স্ত্রী বা স্বামীর সম্পদের তথ্য যথাযথভাবে দেওয়ার ঘর নেই। কারো বিদেশে সম্পদ থাকলে সেটি উল্লেখ করারও কোনো ঘর নেই। তাই, হলফনামার ছক পরিমার্জন করে যুগোপযোগী করা জরুরি।

সুপারিশ

১. হলফনামার ছকে দেশি-বিদেশি সম্পত্তিসহ, আয়কর রিটার্নের কপি সংযোজনের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা।

২. হলফনামা প্রদত্ত তথ্য জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে ওয়েবসাইট, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা।

৩. দাখিলকৃত হলফনামা ও আয়ের উৎসসমূহ সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, সিআইবি-এর সহায়তা নেওয়া।

৪. ঋণ বা ঋণের কিস্তি খেলাপি সংক্রান্ত তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংক/সিআইবি/আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সেবাকারী প্রতিষ্ঠান হতে যাচাই করা।

৫. বাছাইকালে কোনো প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত হলফনামায় বা সংশ্লিষ্ট দলিলাদি ও কাগজপত্রে কোনো প্রকার তথ্য গোপন করা বা বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রদান করা হয়ে থাকলে উক্ত মনোনয়নপত্র বাতিল করা।

৬. *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৯১ঙ-তে যদি কোনো উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য বা লিখিত প্রতিবেদন হতে কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর হলফনামায় প্রদত্ত কোনো তথ্য বা আয়-ব্যয়ের রিটার্নে কোনো প্রকার গরমিল বা মিথ্যা তথ্য প্রদান করা হয়, সেক্ষেত্রে প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করা।

৭. প্রার্থী কর্তৃক মনোনয়নপত্রের সঙ্গে প্রত্যেক দল তার প্রার্থীদের জন্য প্রত্যয়নপত্রের সঙ্গে দলের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক বা অনুরূপ পদধারী ব্যক্তি কর্তৃক হলফনামা জমা দেবেন, যাতে মনোনীত প্রার্থীর নামের পাশাপাশি মনোনয়ন বাণিজ্য না হওয়া ও দলীয় প্যানেল থেকে প্রার্থী মনোনয়ন প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ করা।

৮. পরবর্তী নির্বাচনের আগে যে কোনো সময় নির্বাচন কমিশন নির্বাচিত ব্যক্তির হলফনামা যাচাই-বাছাই করার পর মিথ্যা তথ্য দিলে বা তথ্য গোপন করলে তার নির্বাচন বাতিল করা।

৭.৮ নির্বাচনি আচরণবিধি

আচরণবিধি নির্বাচনকালীন সময়ে প্রার্থীদের, রাজনৈতিক দলগুলোর এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের জন্য একটি নৈতিক ও আইনি কাঠামো প্রদান করে। আচরণবিধির প্রতিপালন নির্বাচনি পরিবেশকে শান্তিপূর্ণ রাখার পাশাপাশি ভোটারদের জন্য একটি নিরাপদ ও নিরপেক্ষ পরিবেশ নিশ্চিত করে। এর অনুপস্থিতি নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলা, পক্ষপাত এবং অনিয়মের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ৯১খ ধারার ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন সংসদ নির্বাচনে 'রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮' প্রণয়ন করেছে। এ বিধিমালায় দল ও প্রার্থীদের জন্য নির্ধারিত আচরণবিধি এবং তা ভঙ্গের ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আচরণবিধি লঙ্ঘনের ঘটনা নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম হিসেবে গণ্য হয়, যদিও আচরণবিধিতে ভোটের দিনের পালনীয় আচরণের জন্য একটি ধারা (১৬) রয়েছে।

সুপারিশ

১. নির্বাচনি ব্যপস্থাপনা ও আচরণবিধি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুবিধার জন্য নির্বাচনের সময়সীমা তিন ভাগে বিভক্ত করা। যথা: নির্বাচন-পূর্ব সময়: জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত হওয়ার সময় হতে বা কোনো সদস্য আসন খালি হওয়া থেকে সাধারণ নির্বাচন কিংবা শূন্য আসনে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার দিন পর্যন্ত সময়কাল। নির্বাচনকালীন সময়: নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার দিন হইতে নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত সময়কাল। নির্বাচন-পরবর্তী সময়: সরকারি গেজেটে ফলাফল প্রকাশের তারিখ হতে পরবর্তী ৪৫ দিন পর্যন্ত।

২. ব্যানার, তোরণ ও পোস্টারের পরিবর্তে লিফলেট, ভোটার-প্রার্থী মুখোমুখি অনুষ্ঠান, পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ও সরকারি গণমাধ্যমে প্রচারের সম-সুযোগ প্রদানের বিধান করা।

৩. কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা এর মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি নির্বাচনি এলাকায় সর্বোচ্চ দুটি জনসভা করতে পারবে এমন বিধান যুক্ত করা।

৪. নির্বাচনি প্রচারণার সময়সীমা ৩ সপ্তাহ থেকে কমিয়ে ২ সপ্তাহ করা।

৫. কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি প্রচারণার সময়কালে কোনো নির্বাচনি এলাকায় মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।

৬. রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর জন্য এই আচরণবিধির অংশ হিসেবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের আচরণবিধি সংযুক্ত করা।

৭. বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন করলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ অনধিক ছয় মাসের কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১ লক্ষ টাকা (বিদ্যমান পঞ্চাশ হাজার) অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন এবং কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল নির্বাচনের সময়সীমার মধ্যে এই বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করলে অনধিক ১ লাখ (বিদ্যমান পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হবে এমন বিধান করা।

৮. ১৯৯০ সালের তিনজোটের রূপরেখার মতো রাজনৈতিক দলের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন করা। আমরা নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে মনে করি, আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো এমন আচরণবিধি অনুসরণ করলে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পথ প্রশস্ত হবে। নিম্নে তিনজোটের রূপরেখায় অন্তর্ভুক্ত আচরণবিধিটি তুলে ধরা হলো:

'...আমরা তিনটি জোটের নেতৃবৃন্দ সুষ্ঠুভাবে অবাধ ও নিরক্ষেপ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আমাদের নিম্নবর্ণিত অভিন্ন অঙ্গীকার পালনের জন্য আমাদের সকল কর্মী ও দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

১. আমাদের তিনটি জোটভুক্ত রাজনৈতিক দলসমূহ নির্বাচনি বক্তব্য ও কার্যক্রমে পারস্পরিক মতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও পরমতসহিষ্ণুতার সাধারণ গণতান্ত্রিক নীতিমালা অনুসরণ করবে। দলীয় কর্মীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ জাগ্রত করার জন্য জোটভুক্ত রাজনৈতিক দলসমূহ সর্বদা সচেষ্ট থাকবে।

২. আমাদের তিনটি জোটভুক্ত রাজনৈতিক দলসমূহ প্রত্যেকের নিজেদের মত ও বৈশিষ্ট্য যাতে স্বাধীন ও আইনানুগ পদ্ধতিতে প্রচার করতে সমর্থ হয় সেজন্য সকলেই সচেষ্ট থাকবে। এজন্য রাজনৈতিক দলের কার্যালয়, জনসভা, সমাবেশ, মিছিল যাতে আক্রান্ত না হয় সে বিষয়ে সমবেতভাবে প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে।

৩. আমাদের তিনটি জোটভুক্ত দলসমূহ ব্যক্তিগত কুৎসা রটনা এবং অপর দলের দেশপ্রেম ও ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে কটাক্ষ করা থেকে বিরত থাকবে। আমাদের জোটভুক্ত রাজনৈতিক দলসমূহ সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় প্রদান করবে না এবং সাম্প্রদায়িক প্রচারণা সমবেতভাবে প্রতিরোধ করবে।

৪. নির্বাচনি কার্যক্রমে সর্বতোভাবে সংঘাত পরিহার করার জন্য তিনটি রাজনৈতিক জোটভুক্ত দলসমূহ অঙ্গীকার করছে। সেজন্য এরশাদের স্বৈরাচারী সরকারের চিহ্নিত সহযোগী ও অবৈধ অস্ত্রধারীদের আমাদের জোটভুক্ত রাজনৈতিক দলসমূহে স্থান না দেওয়ার জন্য আমাদের ইতঃপূর্বে প্রদত্ত ঘোষণা কঠোরভাবে কার্যকর করা হবে। ভোটাররা যাতে স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে এবং ভোটকেন্দ্রে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে সে বিষয়ে আমাদের তিনটি জোটভুক্ত দলসমূহ সতর্ক দৃষ্টি রাখবে।

৫. আমাদের তিনটি জোটভুক্ত দলসমূহ নিজস্ব নির্বাচনি স্বার্থে প্রশাসন কিংবা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাকে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে না এবং প্রশাসনের নিরপেক্ষতা রক্ষার্থে সচেষ্ট থাকবে।

৬. আমাদের তিনটি জোটভুক্ত রাজনৈতিক দলসমূহ গণপ্রচার মাধ্যমসমূহের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা রক্ষার্থে সচেষ্ট থাকবে। কোনো মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর সংবাদ প্রকাশিত হলে সমবেতভাবে প্রতিবাদ জানাবে।

৭. উপরোক্ত বিষয়াদি তথা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনো অগণতান্ত্রিক উস্কানিমূলক ঘটনা সংঘটিত হলে তৎক্ষণাৎ আলোচনার মাধ্যমে তা নিরসন করার প্রয়াস গ্রহণ করা হবে। সর্বপর্যায়ে এই নীতিমালা পালিত হওয়ার স্বার্থে জাতীয় ও এলাকাভিত্তিক লিয়াজোঁর স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৮. নির্বাচনের তারিখে সুষ্ঠু ও অবাধ ভোটাধিকার নিশ্চিত করার স্বার্থে আমরা নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সমবেতভাবে প্রস্তাব রাখছি: (ক) সকল নির্বাচনি এলাকায় ব্যালট পেপার ঠিকমত বিলি-বন্টনের তদারকের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। (খ) ভোট গণনা শেষে ভোটকেন্দ্রেই চূড়ান্ত ফলাফল লিপিবদ্ধ করা, প্রার্থীদের পোলিং এজেন্টদের নিকট কেন্দ্রের ফলাফলের সত্যায়িত কপি প্রদানের ব্যবস্থা করা। (গ) ভোটের ফলাফল একত্রিত করা, তা প্রকাশ ও প্রচার করার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার অসাধুতা ও 'মিডিয়া ক্যু'র যে কোনো আশঙ্কা রোধ করা। (ঘ) প্রশাসনের নিরপেক্ষতা বজায় রাখা এবং ভোটকেন্দ্রে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। (ঙ) ভোট কারচুপি ও দুর্নীতি প্রতিরোধকল্পে কঠোর নিবৃত্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। (চ) প্রার্থীদের নির্বাচনি ব্যয়ের নির্ধারিত সীমা সংক্রান্ত বিধান কার্যকরভাবে অনুসরণ নিশ্চিত করা।

৯. আমাদের জোটভুক্ত দলসমূহ নির্বাচনের প্রদত্ত গণরায় মেনে নিয়ে দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অগ্রসর করে নিয়ে যাবে।'

৭.৯ ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া: ইভিএমে নয়

ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) বাংলাদেশের নির্বাচনের অন্যতম আলোচিত বিষয়। ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ছয়টি আসনে ইভিএম ব্যবহার করা হয়েছিল। তবে ওই নির্বাচনে ইভিএম-ব্যবহৃত আসনগুলোর ভোটার উপস্থিতির হার এবং ব্যালট পেপার ব্যবহার করা আসনগুলোর ভোটার উপস্থিতির হারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায়। এ পার্থক্য নির্বাচনের স্বচ্ছতা ও ভোটের হার নিয়ে সন্দেহ এবং বিতর্কের জন্ম দেয়।

ইভিএমের কার্যকারিতা নিয়ে রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় বহু অভিযোগ ও আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। বাংলাদেশে ব্যবহৃত ইভিএমের অন্যতম বড় দুর্বলতা হলো এতে 'পেপার অডিট ট্রেইল' বা ভোট প্রদানের কাগজে রেকর্ড রাখার কোনো ব্যবস্থা নেই। এর ফলে, নির্বাচনি ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন ওঠলে তা নিরীক্ষা বা যাচাই করার সুযোগ থাকে না। নির্বাচনে প্রযুক্তির দায়বদ্ধ ও স্বচ্ছ ব্যবহার নিশ্চিতে কাজ করা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান *ভেরিফায়েড ভোটিং ফাউন্ডেশন* ইভিএমের এসব সীমাবদ্ধতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাদের মতে, প্রোগ্রামিং ত্রুটি, যান্ত্রিক সমস্যার আশঙ্কা এবং কারসাজি বা টেম্পারিংয়ের মতো ঝুঁকি ইভিএমের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা। ভোটার প্রদত্ত ভোট যাচাই করার কোনো নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি না থাকায় ইভিএমকে একটি ঝুঁকিপূর্ণ প্রযুক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ভোটার যাচাইযোগ্য নিরীক্ষণ পদ্ধতি যুক্ত করা ইভিএম ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। এই কারণেই ২০১১ সালে দিল্লি হাইকোর্টের একটি রায় অনুসরণে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ইভিএমে 'ভেরিফায়েড পেপার অডিট ট্রেইল' (VVPAT) সংযুক্ত করার নির্দেশ দেয়। এই উদ্যোগ ইভিএম ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তবে বাংলাদেশে এখনো এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, যা ইভিএম ব্যবহারে জনমনে অবিশ্বাস ও অনাস্থা বৃদ্ধি করেছে। এছাড়া, ইভিএম ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে আর্থিক অনিয়ম এবং বিপুল অর্থ অপচয়ের অভিযোগও ওঠেছে।

বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে মাত্র অল্প কয়েকটি দেশ বর্তমানে ইভিএম ব্যবহার করে। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, বর্তমানে বিশ্বের ১৯৫টি দেশের মধ্যে মাত্র ৩১টি দেশ আংশিক বা পুরোপুরিভাবে ইভিএম ব্যবহার করছে। যেসব দেশে ইভিএম চালু রয়েছে, সেখানেও এটি নির্বাচনকে বিতর্কিত করেছে এবং ব্যয়বহুল ব্যবস্থাপনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইভিএমের এই সীমাবদ্ধতাগুলো বিবেচনায় নিয়ে এবং বিভিন্ন অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে বলা যায়, ইভিএম অনিরাপদ এবং স্বচ্ছ ভোটগ্রহণ পদ্ধতি নয়। এটি নির্বাচন ব্যবস্থাপনাকে জটিল ও ব্যয়বহুল করে তোলে। এই বাস্তবতায়, আপাতত ইভিএম ব্যবহার পরিহার করার জন্য নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে সুপারিশ করা হচ্ছে।

সুপারিশ

- নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের বিধান বাতিল করা।

৭.১০ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন, 'না-ভোট'

বাংলাদেশের নির্বাচনগুলোতে কোনো ক্ষেত্রে যদি একজন মাত্র প্রার্থী থাকেন, তাহলে তাকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হয়। সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে আরপিও'র ১৯ ধারায় এই সংক্রান্ত বিধান আছে, যদিও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন আমাদের সংবিধানের ৬৫(২) অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সর্বোপরি এটা আমাদের সংবিধান এবং গণতন্ত্রের অত্যাবশ্যকীয় চেতনার পরিপন্থি। নির্বাচন হচ্ছে একাধিক বিকল্পের মধ্য থেকে পছন্দসই কাউকে খুঁজে নেওয়া। বস্তুত নির্বাচনের সঙ্গে 'চয়েস' বা বিকল্প অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সুতরাং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কাউকে নির্বাচিত ঘোষণা করা কোনোভাবেই 'নির্বাচন' নয়।

বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন কিংবা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচনের ইতিহাস আছে। তবে সেটা ছিল পুরো নির্বাচনের ছোট একটা অংশ। কিন্তু বিগত সরকারের সময়ে এটা এমন পরিস্থিতিতে চলে গেছে যা আগে আর কখনো কল্পনা করা যায়নি। ২০১৪ সালের সংসদ নির্বাচনে একটি ভোট দেওয়ার আগেই ১৫৩টি আসনে প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছিল, অর্থাৎ সরকার গঠিত হয়ে গিয়েছিল। অবিশ্বাস্যভাবে সেই সরকারটি তার ক্ষমতার পূর্ণ মেয়াদ পরিপূর্ণ করে, অর্থাৎ বাংলাদেশ পাঁচ বছর শাসিত হয়েছে এমন একটি সরকারের হাতে, যেটিতে নাগরিকরা কাগজে-কলমেও তাদের শাসক হিসেবে নির্বাচিত করতে পারেনি।

পরবর্তীতে এই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রবণতা হয়ে ওঠেছিল। ২০১৪ সালের পরে উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনেক ক্ষেত্রেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে প্রভাবশালীরা আর্থিক সুবিধা প্রদান করে এবং বল প্রয়োগের মাধ্যমে অন্যান্য প্রার্থীকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখতেন।

দীর্ঘ সময় ভুক্তভোগী হবার কারণে এই দেশের জনগণ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচনের প্রতি কঠোর নেতিবাচক মানসিকতা পোষণ করেন। এই ক্ষেত্রে সমাধান হিসেবে 'না ভোটে'র কথা আলোচনায় এসেছে।

'না ভোট' কী?

কোনো একটি নির্বাচনে ভোটারদের জন্য এটি একটি অপশন, যেখানে ভোটার সকল প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করার একটি সুযোগ পান। বিশ্বের কিছু দেশে এটা ব্যালটের একটা অপশন, যেখানে সকল প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যানের কথা থাকে (যেমন, ভারত)। আবার কোনো কোনো দেশে এই বার্তা দেওয়ার জন্য কোনো প্রার্থী পছন্দ করার চিহ্ন না দিয়ে খালি ব্যালট পেপার জমা দেওয়ার বিধান আছে (যেমন, ফ্রান্স)। বাংলাদেশে এটিই 'না' ভোট হিসেবে পরিচিত।

বর্তমানে বিশ্বের ২০টি এই ভোটের বিধান প্রচলিত আছে। অন্যদিকে তিনটি দেশ – বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং রাশিয়া এই পদ্ধতিটি প্রচলন করেও আবার বাতিল করে।

'না ভোটে'র ধরন

যেসব দেশে 'না ভোট' প্রচলিত সেসব দেশের এই ভোটের ধরন এবং প্রভাব নিয়ে ভিন্নতা আছে।

- সকল ক্ষেত্রে 'না ভোট' একটি অপশন থাকা, যেখানে ভোটাররা কোনো প্রার্থীকে পছন্দ না করলে 'না ভোট' দিতে পারেন। এক এগারো সরকারের সময় (২০০৭-০৮) বাংলাদেশে প্রচলন করা 'না ভোট'টি ছিল এই ধরনের। ভারতেও একই রকম ব্যবস্থা বিদ্যমান।
- কখনো এমন একটা ব্যবস্থা থাকতে পারে যখন কোনো নির্বাচনে শুধু একজন প্রার্থী যদি থাকে এবং তার যদি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে যাবার পরিস্থিতি তৈরি হয় তখন সেখানে 'না ভোট' অপশন থাকে। ইন্দোনেশিয়ায় এমন চর্চা আছে। এই ক্ষেত্রে 'না ভোট' একটি কার্যকর প্রার্থীর মত থাকেন।
- 'না ভোটে'র প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে_দুই রকমের করণীয় আছে। 'না ভোট' হতে পারে প্রতিকী, অর্থাৎ যত মানুষই না ভোট দিক না কেন, সেটা কোনো ব্যক্তির নির্বাচিত হবার পথে প্রতিবন্ধক হবে না। সেই নির্বাচনে 'না ভোট' সর্বোচ্চ হলেও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যক্তিকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশে প্রবর্তিত 'না ভোট' এবং ভারতের বর্তমান 'না ভোট' ব্যবস্থাটি এরকম।

কিছু দেশে (যেমন, পোল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া) নির্বাচনে 'না ভোটে'র সংখ্যা যদি অন্য যে কোনো প্রার্থীর চাইতে বেশি হয়, তাহলে সেই নির্বাচন বাতিল করে নতুন নির্বাচন করার বিধান আছে।

বাংলাদেশে 'না ভোট'

বাংলাদেশের ভোটারদের কাছে 'না' ভোটের বিধান অপরিচিত নয়। ২০০৮ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে এটা গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশে যুক্ত করা হয়েছিল এবং নবম সংসদ নির্বাচনে এটি ভোটারদের সামনে একটি অপশন হিসেবে ছিল।

তখন সারা দেশে মোট প্রদত্ত ৬ কোটি ৯৭ লাখ ৫৯ হাজার ২১০ ভোটের মধ্যে 'না ভোট' ছিল ৩ লাখ ৮২ হাজার ৪৩৭টি। ওই নির্বাচনে ৩৮টি দল অংশগ্রহণ করলেও মাত্র ৬টি দল 'না' ভোটের চাইতে বেশি ভোট পেয়েছিল। অর্থাৎ 'না ভোট' সপ্তম অবস্থানে ছিল।

এরপর ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে সংশোধিত আরপিও থেকে 'না ভোটে'র বিধান বাতিল করার প্রস্তাব করে, যার প্রতিবাদ করেনি তৎকালীন বিরোধী দলগুলোও। এ সিদ্ধান্তে নির্বাচন কমিশন ও আদালতেরও ভূমিকা ছিল। একতরফা দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর রাজনীতিবিদ খন্দকার আবদুস সালাম নির্বাচনটি বাতিলের লক্ষ্যে হাইকোর্টের শরণাপন্ন হন, যে মামলায় নির্বাচন সংস্কার কমিশনের বর্তমান প্রধানকে একজন 'অ্যামিকাস কিউরি' বা আদালতের বন্ধু হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। সেই মামলায় কাজী রকিবউদ্দীনের নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশন 'না ভোটে'র বিপক্ষে অবস্থান নেয়। নির্বাচন সংস্কার কমিশনের বর্তমান প্রধানের নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা এবং 'না ভোটে'র পক্ষে জোর অবস্থান নেওয়া সত্ত্বেও আদালত বিপক্ষে রায় দেয়।

'না ভোটে'র ইতিবাচক দিক

- এই ভোট নির্বাচনে জনগণের জন্য অপশন বৃদ্ধি করার মাধ্যমে জনগণকে আরও ক্ষমতায়িত করে।
- এটা নির্বাচনে ভোটারের উপস্থিতি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতারত মূল প্রার্থীদের পছন্দ না করলে মানুষের ভোটকেন্দ্রে যাবার প্রবণতা কম হয়। কিন্তু 'না' ভোটের বিধান তাদের কেন্দ্রে যেতে উৎসাহিত করবে।
- 'না ভোট' থাকলে বিতর্কিত প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়া থেকে দলগুলোকে বিরত করার বড় সম্ভাবনা তৈরি হবে। সৎ, যোগ্য এবং জনসম্পৃক্ত প্রার্থীরাই নির্বাচনে আসবেন – জনগণের এই প্রত্যাশা যদি পূরণ না হয়, তাহলে না ভোটের মাধ্যমে তারা তার প্রতিবাদ জানাতে পারেন, যা পরবর্তীতে দলগুলোর উপরে এমন প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার চাপ তৈরি করবে।
- সর্বোপরি এটা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন প্রতিরোধ করবে।

'না ভোটে'র নেতিবাচক দিক

- কোনো ভোটার এক বা দুইজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অপছন্দ করে 'না ভোট' দিতে পারেন। কিন্তু এতে অন্য সকল প্রার্থীর প্রতি সাধারণ অনাস্থা প্রকাশিত হয়ে যায়, যা সত্যিকার চিত্র নাও হতে পারে।
- এক বা একাধিক প্রার্থীকে অপছন্দ করা ভোটার 'না ভোটে'র পক্ষেই সম্ভবত যাবেন। এতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী অন্য কোনো প্রার্থীকে তুলনামূলক বিচার করে ভোট দেওয়ার প্রবণতা কমবে।
- প্রতিকী 'না ভোট' নির্বাচনি ব্যবস্থা, যোগ্য এবং সঠিক প্রার্থী মনোনয়ন নিশ্চিতে খুব বেশি প্রভাব রাখতে পারে না।

‘না ভোট’ প্রসঙ্গে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন

- নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে আলোচনায় ‘না ভোটে’র প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে প্রাথমিকভাবে মতৈক্যে পৌঁছেছেন।
- ঢাকা এবং বিভাগীয় শহরগুলোতে সমাজের নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে মতবিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রায় সর্বসম্মতভাবে ‘না ভোটে’র বিধান পুনরায় চালু করার পরামর্শ এসেছে।
- ‘না ভোটে’র বিধানের ক্ষেত্রে দুটি অপশনের কথাই এসেছে। এটাকে শুধু প্রতিকীভাবে রাখার কথা, অর্থাৎ না ভোটের সংখ্যা যতই হোক না কেন, সেটা অন্য কোনো প্রার্থীর নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা তৈরি করবে না। আর এই প্রস্তাবও এসেছে – ‘না ভোটে’র সংখ্যা যদি সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীর ভোটের চাইতে বেশি হয়, তাহলে সে আসনে পুনর্নির্বাচন হবে।

সুপারিশ

১. জাতীয় নির্বাচনে ‘না ভোট’ প্রচলন করা।

২. ‘না ভোট’ নির্বাচনে যদি সর্বোচ্চ ভোট পায়, তাহলে সেই নির্বাচন বাতিল করে পুনরায় নির্বাচন করার বিধান করা। সেই ক্ষেত্রে বাতিলকৃত নির্বাচনের কোনো প্রার্থী নতুন নির্বাচনে আর প্রার্থী হতে পারবেন না এমন বিধান করা।

৭.১১ জোটবদ্ধভাবে নির্বাচন

অংশীজনের সঙ্গে আলোচনাকালে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলো জোটবদ্ধভাবে নির্বাচন করার ক্ষেত্রে প্রার্থীগণ তাদের স্ব স্ব দলের জন্য নির্ধারিত প্রতীক নিয়েই নির্বাচন করার বিষয়ে অনেকে মতামত প্রদান করে। সংস্কার কমিশন মনে করে, জোটবদ্ধ হওয়ার ফলে বেশিভাগ ক্ষেত্রেই ছোট দলগুলো বড় দলের প্রতীক ব্যবহার করে থাকে। ফলে ছোট দলগুলোর কোনো রাজনৈতিক দর্শন, আদর্শ, নীতি বা স্বাতন্ত্রসূচক কোনো কার্য ভোটারের কাছে প্রতিফলিত হয় না। অন্য দলের প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করার ফলে ভোটার দল বা প্রার্থী বিবেচনা না করে প্রতীক দেখেই ভোট দিয়ে থাকেন। মূলত ভোটার এ ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হয়ে থাকেন। ছোট ছোট দলগুলো যেন তাদের রাজনৈতিক দর্শন, নীতি বা নিজস্ব স্বাতন্ত্রসূচক কার্য পরিচালনা করে দলকে শক্তিশালী করতে পারে, এ লক্ষ্যে আরপিও’র অনুচ্ছেদ ২০ এর দফা (১) উপদফা (ক) এর শতাংশে সংশোধনের প্রস্তাব করা হচ্ছে।

সুপারিশ

- দুই বা ততোধিক নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল জোটবদ্ধভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার লক্ষ্যে যৌথভাবে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে প্রার্থীগণ তাদের স্ব স্ব দলের জন্য নির্ধারিত প্রতীকই বরাদ্দ পাবেন এমন বিধান যুক্ত করা।

৭.১২ স্বতন্ত্র প্রার্থীদের প্রার্থিতার ক্ষেত্রে শর্তের শিথিলতা

নির্বাচন সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন ও বিধিমালাগুলো সংস্কার কমিশন গভীরভাবে পর্যালোচনা করা-সহ বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে মতবিনিময় করে। আলোচনাকালে অধিকাংশ অংশীজন মনে করে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার বিষয়টি উন্মুক্ত হলে সৎ ও যোগ্য প্রার্থী আসার সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে। নির্বাচনি এলাকার এক শতাংশ ভোটারের সমর্থন সম্বলিত স্বাক্ষর সংগ্রহ করা একটি দুরূহ ব্যাপার এবং অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তির হস্তক্ষেপের ফলে অনেক ভোটারই পরবর্তীতে তা অস্বীকার করেন। প্রার্থিতা বাছাইকালে তথ্যের গরমিল বা স্বাক্ষর প্রদানের বিষয়টি ভোটারের অস্বীকৃতির কারণে মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে যায়।

২০০৮ সালে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ সংশোধন করে স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে ইতঃপূর্বে জাতীয় সংসদের কোনো নির্বাচনে সদস্য নির্বাচিত না হয়ে থাকলে নির্বাচনি এলাকার এক শতাংশ ভোটারের সমর্থন সম্বলিত স্বাক্ষরযুক্ত তালিকা ধারা ১২(৩ক)(ক) অনুযায়ী মনোনয়নপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করার বিধান চালু করা হয়। কিন্তু এক শতাংশ ভোটারের সমর্থনযুক্ত স্বাক্ষর সংগ্রহের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ অনেক হয়রানির সম্মুখীন হন। বাছাইকালে দেখা যায় যে, অনেক ভোটারই অভিযোগ করেন তাদের স্বাক্ষর জোরপূর্বক করানো হয়েছে বা এ স্বাক্ষর তাঁর নয়। এছাড়াও আইনানুযায়ী প্রার্থিতার সমর্থনসূচক তালিকা সরেজমিন যাচাইকালে ভোটারকে খুঁজে পাওয়া যায় না বা তিনি স্বাক্ষর করেননি বলে জানান। এ ক্ষেত্রে অন্য প্রার্থী সহজেই ভোটারকে অর্থ প্রদান বা প্রভাবিত করে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানে বাধ্য করেন। বিদ্যমান আইনানুযায়ী, যাচাইকৃত তালিকায় তথ্যের গরমিলের কারণে মনোনয়ন বাতিল করা হয়। ফলে প্রার্থী নির্বাচন কমিশনে আপিল করে এবং আপিল আদেশে সংক্ষুব্ধ হলে আদালতের আশ্রয় নেন। নির্বাচনের জটিলতা পরিহারের লক্ষ্যে অনেকে মনে করেন, স্বতন্ত্র প্রার্থীদের জন্য এক শতাংশ ভোটারের সমর্থনযুক্ত স্বাক্ষরের তালিকা বিধানটি থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সংখ্যা অধিক হয়, যা নির্বাচনি ব্যবস্থাপনায় জটিলতা ও ব্যয় বৃদ্ধি করে। সংস্কার কমিশন মনে করে, এ বিধান সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত না করে ভোটারের সমর্থনসূচক সংখ্যা কমিয়ে আনা যায়।

সুপারিশ

১. স্বতন্ত্র প্রার্থীর মনোনয়ন দাখিলের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার ‘এক শতাংশ’ ভোটারের স্বাক্ষরের স্থলে ‘পাঁচশত’ (৫০০) করা।

৯. সংসদ নির্বাচনে নারীর প্রতিনিধিত্ব

রাষ্ট্রের সর্বস্তরে নারীদের ন্যায্য অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা দেশের গণতান্ত্রিক চর্চার জন্য অপরিহার্য। কারণ নারীরা দেশের জনগোষ্ঠীর অর্ধেক, তাই এটি তাদের ন্যায্য অধিকার। আমাদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিশেষ করে জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ কেমন তা দিয়ে দেশে নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের চিত্র বোঝা যায়। জাতীয় সংসদে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে ১৯৭২ সালের সংবিধানে সংসদে নারীদের জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষিত রাখার বিধান যুক্ত করা হয়। ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাসের মাধ্যমে সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ৫০-এ উন্নীত করা হয়, যা এখনো চলমান। এ ৫০টি আসন সংসদের ৩০০টি সাধারণ আসনের নির্বাচনে জয়ী দলসমূহের প্রতিনিধিত্বের হার অনুযায়ী বিতরণ করা হয়, যার ফলে এসব আসনে ভোট প্রদানের প্রয়োজন পড়ে না। অর্থাৎ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের ৫০ জন সদস্যকে সত্যিকারার্থে নির্বাচিত বলা যায় না।

টেবিল ১: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব

সাল	নারী প্রার্থীর হার	নারী প্রার্থীর সংখ্যা	সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভকারী নারীর সংখ্যা	উপনির্বাচনে জয়লাভকারী নারীর সংখ্যা	সাধারণ ও উপনির্বাচনসহ মোট নারী সংসদ সদস্যের সংখ্যা (হার)	সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন	সংসদে মোট নারী আসন সংখ্যা (হার)
১৯৭৩	০.৩	২	কেউ নির্বাচিত হননি	০	০	১৫	১৫ (৫.০)
১৯৭৯	০.৯	১২	কেউ নির্বাচিত হননি	২	২ (০.৭)	৩০	৩২ (১০.৭)
১৯৮৬	০.৩	১৩	৫	২	৭ (২.৩)	৩০	৩৭ (১২.৭)
১৯৮৮	০.৭	তথ্য পাওয়া যায়নি	৪	০	৪ (১.৩)	৩০	৩৪ (১১.৩)
১৯৯১	১.৫	৪০	৪	২	৬ (২.০)	৩০	৩৬ (১২.০)
১৯৯৬ (জুন)	১.৩	৩৬	৫	২	৭ (২.৩)	৩০	৩৭ (১২.৭)
২০০১	২.০	৩৮	৬	০	৬ (২.০)	৪৫	৫১ (১৭.০)
২০০৮	৩.৬	৫৯	১৯	০	১৯ (৬.৩)	৪৫	৬৪ (২১.৩)
২০১৪	৫.৩	২৯	১৮	২	২০ (৬.৭)	৫০	৭০ (২৩.৩)
২০১৮	৩.৮	৭০	২২	৩	২৫ (৮.৩)	৫০	৭৫ (২৫.০)
২০২৪	৫.১	১০১ (এছাড়া ২ জন তৃতীয় লিঙ্গের নারী)	২০		২০ (৬.৭)	৫০	৭০ (২৩.৩)

তথ্যসূত্র: নির্বাচন কমিশনের নির্বাচন প্রতিবেদন এবং জাতীয় দৈনিকের বিভিন্ন প্রতিবেদন

নারীদের জন্য আসন সংরক্ষিত রাখার মূল উদ্দেশ্য ছিল অসম রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে নারীদের জন্য রাজনীতিতে এগিয়ে আসার পথ তৈরি করা। প্রত্যাশা ছিল যে, এ ব্যবস্থার ফলে সংরক্ষিত আসনসমূহ ব্যতীত সাধারণ আসনগুলোতেও নারীদের প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে এবং একসময় আর সংরক্ষিত আসনের প্রয়োজন হবে না। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাস্তবে নারীদের সংরক্ষিত আসনগুলো কেবল আলংকারিকই হয়ে রয়েছে। এ আসনগুলোতে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা না থাকায় রাজনৈতিক নেতাদের স্ত্রী, কন্যা বা আশির্বাদপুষ্টরা সাধারণত এগুলোতে মনোনীত হন। অনেকক্ষেত্রে লেনদেনের ভিত্তিতে এসব মনোনয়ন দেওয়া হয়। সংরক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্বাচিত নারীদের পরবর্তীতে সরাসরি আসনে নির্বাচিত হয়ে আসার যোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হওয়ার কথা। কিন্তু বাংলাদেশের নির্বাচনের পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে দেখা যায়, বাংলাদেশে এ যাবৎ অনুষ্ঠিত ১২টি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাধারণ আসনে অংশগ্রহণকারী নারী প্রার্থীর সংখ্যা এখনো অত্যন্ত অপ্রতুল। ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদে সর্বোচ্চ ৮ শতাংশ (টেবিল ১) নারী সাধারণ আসনে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

নারীদের জন্য জাতীয় সংসদের বিদ্যমান সংরক্ষণ পদ্ধতি চরম বৈষম্যমূলক। দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী হলেও, সর্বমোট ৩৫০টি সংসদীয় আসনের মধ্যে মাত্র ৫০টি বা ১৪ শতাংশ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা নিঃসন্দেহে তাদেরকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চনারই প্রতিফলন। এছাড়াও বিরাজমান পদ্ধতিতে জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনে নারী প্রতিনিধি নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনগণের কোনোরূপ সংশ্লিষ্টতা থাকে না। ফলে এর মাধ্যমে নারীর সত্যিকারের ক্ষমতায়ন হয় না। বরং আনুকুল্যের ভিত্তিতে নির্বাচিত সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যদের দল ও দলীয় প্রধানের প্রতি আনুগত্যের কারণে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা সত্যিকার অর্থে কার্যকর কি না তা নির্ভর করে কয়েকটি শর্ত পূরণের ওপর। প্রথমত, এ ব্যবস্থার ফলে নারীদের এসব আসন কেবল আলংকারিক পদ হিসেবে বিবেচিত না হয়ে সত্যিকার অর্থেই নারীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করবে। এর মাধ্যমে নির্বাচিত নারীরা সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত পুরুষ প্রতিনিধিদের মতো একই ক্ষমতা প্রয়োগ, একই দায়দায়িত্ব পালন এবং একই সুযোগসুবিধা ভোগ করবেন, ফলে এটি হবে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থা। দ্বিতীয়ত, এর মাধ্যমে নারীদের পুরুষদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসার সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে সংসদের সাধারণ আসনে নারীদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি পাবে। বর্তমান পদ্ধতিতে যে সত্যিকার অর্থেই নারীর সত্যিকারের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হয়নি তা টেবিল ১-এ প্রদত্ত নির্বাচনি পরিসংখ্যান থেকেই সুস্পষ্ট। তৃতীয়ত, নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনেও সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকবে। কারণ সরাসরি নির্বাচন পদ্ধতি হলো গণতান্ত্রিক নীতির প্রাথমিক শর্ত। চতুর্থত, এর মাধ্যমে সংরক্ষিত আসনের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সদস্যদের জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু সরাসরি নির্বাচন না করে সাধারণ আসনের সংসদ সদস্যদের অনুপাতে দলগুলোর মধ্যে সংরক্ষিত আসনগুলো বিতরণ করলে সংরক্ষিত আসনে বিজয়ীদের জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা নিশ্চিত হয় না। বরং দলীয় প্রধান ও প্রভাবশালী নেতাদের কাছেই তারা দায়বদ্ধ থাকেন। পঞ্চমত, সংরক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে দ্বৈত প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টি হবে না। বর্তমানে সংরক্ষিত নারী সদস্যদের জন্য কোনো নির্দিষ্ট আসন না থাকায় সংশ্লিষ্ট সাধারণ আসনের নির্বাচিত সদস্যদের সঙ্গে তাদের দ্বৈত প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টি হয়। ফলে, সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যরা সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত সদস্য কর্তৃক দায়িত্ব পালনে অসহযোগিতা ও বাধার সম্মুখীন হন। ষষ্ঠত, সংরক্ষণ পদ্ধতি নারীদের যোগ্যতার স্বীকৃতি দিতে হবে। সংরক্ষিত ব্যবস্থার মনোনয়নের ক্ষেত্রে সম্পর্ক, অনুগ্রহ ও লেনদেনের পরিবর্তে যোগ্যতার ওপর গুরুত্ব দিলে সত্যিকারার্থেই নারীদের ক্ষমতায়িত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাই সংরক্ষিত আসনের নারীদের জন্য নিজস্ব আসন থাকা অপরিহার্য। কারণ নিজস্ব আসন না থাকলে যোগ্যতা ও জনগণের কাছে জবাবদিহিতা চর্চার কোনো জায়গা থাকে না।

টেবিল ২: নারী প্রতিনিধিত্বের বিভিন্ন পদ্ধতির বিশ্লেষণ

	প্রতিনিধিত্ব	দ্বৈত প্রতিনিধিত্ব	সরাসরি নির্বাচন	জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা	অন্তর্ভুক্তিমূলক না আলংকারিক	নতুন নেতৃত্বের ক্ষমতায়ন	যোগ্যতা বা সম্পর্ক	ফায়দা প্রদানের হাতিয়ার
বর্তমান ব্যবস্থা	৩৫০ জনের মধ্যে ৫০ (১৪% নারী)	হ্যাঁ	না	না	আলংকারিক	হয় না	সম্পর্ক	হ্যাঁ
স্থানীয় সরকারের বিদ্যমান ব্যবস্থা (ইউনিয়ন পরিষদ)	১২ জনের মধ্যে ৩ জন (২৫% নারী)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	বহুলাংশে আলংকারিক	কিছুটা	যোগ্যতা	স্পষ্ট নয়
আনুপাতিক ব্যবস্থা	৩৫০ জনের মধ্যে ৫০ (১৪% নারী)	না	না	না	স্পষ্ট নয়	স্পষ্ট নয়	স্পষ্ট নয়	স্পষ্ট নয়
প্রস্তাবিত ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি	৪০০ জনের মধ্যে ১০০ জন (২৫%)	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	অন্তর্ভুক্তিমূলক	হ্যাঁ	যোগ্যতা	না

বিরাজমান সংরক্ষণ পদ্ধতিতে লেনদেন তথা মনোনয়ন বাণিজ্যের ভয়াবহতার একটি চিত্র পাওয়া যায় সাংবাদিক কামরান রেজা চৌধুরীর একটি সাম্প্রতিক কলাম থেকে। তাঁর সামনে স্পিকার শারমিন চৌধুরীর সঙ্গে একাদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের এক সদস্যের কথোপকথন ছিল এমন:[৬৩]

> "আপা, আপনার কাছে এসেছি, আমার জন্য কিছু করা যায় কি না?' স্পিকার মহোদয় বললেন, 'আপনি তো জাতীয় পার্টির এমপি হতে চান। সেখানে যান।' তিনি বললেন, 'সব কেনাবেচা শেষ। একজন তো ২৫ কোটি টাকা দিয়ে একটি আসন কিনে নিয়েছে। আমার তো অত টাকা নাই। আমি আট কোটি টাকা পর্যন্ত দিতে পারব। আপনি একটু দেখেন না, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি আমার ব্যাপারে বলতেন, তাহলে সুবিধা হতো।' তিনি (স্পিকার) কিছুটা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'দেখুন, এখানে আমারও কিছু করার নেই। সবকিছুই আপনার দলের ওপর নির্ভর করছে। আপনি কত খরচ করতে পারবেন, সেটি সেখানে বলুন।' হতাশ হয়ে সেই নারী চলে গেলেন। কিন্তু জানিয়ে গেলেন একটি সত্য কথা।'

এমন পরিস্থিতিতে আমাদের সংসদে বিদ্যমান সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে, যা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে, নতুন করে ভাববার সময় এসেছে। বস্তুত ২০২৪-এর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পেক্ষাপটে তা করা জরুরি হয়ে পড়েছে – কারণ এটি আমাদের জন্য এক ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি করেছে। জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে আমরা দেখেছি নারীদের সম্মুখ সারিতে দাঁড়িয়ে

[৬৩]কামরান রেজা চৌধুরী, 'আনুপাতিক নির্বাচনি ব্যবস্থা: আরও স্বৈরাচারী হবে দল ও দলপ্রধান,' *প্রথম আলো*, ৭ নভেম্বর ২০২৪।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়তে। সারাদেশের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে কীভাবে নারীরা দলীয় গুণ্ডাবাহিনী ও পুলিশের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে রাজপথ দাপিয়ে বেড়িয়েছে। আন্দোলনে বিপুলভাবে অংশগ্রহণকারী নারীদের এই বলিষ্ঠ ভূমিকাকে হারিয়ে যেতে দেওয়া যাবে না। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে একসঙ্গে কাজ করার এ চেতনা আমাদের ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখতে হবে। তাই সময় এসেছে, আন্দোলনের অগ্রভাগের এ যোদ্ধাদের নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পদ্ধতির পরিবর্তনের অগ্রসৈনিকে পরিণত করার। জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন নিয়ে নতুন করে ভাবা হতে পারে তার প্রাথমিক পদক্ষেপ।

সংযুক্ত টেবিল ২-এ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনের চারটি বিকল্পের একটি বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। আটটি মানদণ্ড ব্যবহার করে তা করা হয়েছে। চারটি বিকল্প হলো: বর্তমান সংরক্ষণ পদ্ধতি, স্থানীয় সরকারে বিদ্যমান তিনটি সাধারণ আসন থেকে একজন নারী সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পদ্ধতি, ভোট প্রাপ্তির হারের ভিত্তিতে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা প্রাপ্তির আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বশীল পদ্ধতি এবং প্রস্তাবিত ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি।

আমাদের প্রস্তাবিত ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে সংরক্ষিত নারী আসন ৫০ থেকে ১০০-তে উন্নীত করে সংসদের মোট আসন সংখ্যা ৪০০ করার প্রস্তাব আমরা করছি। দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় থেকে বর্তমানে দেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হলেও সংসদের সরাসরি নির্বাচনের আসন এখনো ৩০০-ই রয়ে গিয়েছে। তাই দেশের জনসংখ্যার বিবেচনায় সরাসরি নির্বাচনের জন্য আসনসংখ্যা আরও ১০০ বাড়িয়ে ৪০০ করার যৌক্তিকতা রয়েছে। প্রস্তাবিত ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে প্রথমবার ৪০০ আসনের এক-চতুর্থাংশ বা ১০০ আসন লটারি বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে চিহ্নিত করে নারীদের জন্য সংরক্ষণ করা হবে (চিত্র ১)। এ আসনগুলোতে কেবল নারীরাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, অন্য ৩০০ আসনে নারী-পুরুষ উভয়েরই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ থাকবে। দ্বিতীয়বার, অর্থাৎ পরের নির্বাচনে অবশিষ্ট ৩০০ আসন থেকে লটারির মাধ্যমে বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে অন্য ১০০টি আসন চিহ্নিত করে সেগুলো নারীদের জন্য সংরক্ষণ করা হবে। এভাবে তৃতীয়বার অন্য ১০০টি আসনে শুধু নারীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। চতুর্থবার অবশিষ্ট ১০০ সংরক্ষিত আসনে শুধু নারীরাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, অর্থাৎ এগুলো নারীদের জন্য সংরক্ষিত হবে। এভাবে চারটি নির্বাচনি চক্র বা মেয়াদে প্রতিটি আসন থেকে একজন নারী যোগ্যতার ভিত্তিতে অন্য নারীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়ে আসার সুযোগ পাবেন। প্রসঙ্গত, আসন সংরক্ষণের জন্য লটারি অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে জেলার মোট আসনসংখ্যা বিচেনায় নেওয়া প্রয়োজন হবে।

ঘূর্ণায়মান পদ্ধতির অনেক আকর্ষণীয় দিক রয়েছে। প্রথমত, সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত নারীদের নিজস্ব নির্বাচনি এলাকা থাকবে এবং এসব নির্বাচনি এলাকা যথাযথ পরিচর্যার মাধ্যমে তারা পরবর্তী সময়ে পুরুষদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবেন। দ্বিতীয়ত, এ প্রক্রিয়ায় সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যপদ আর 'ফায়দা' হিসেবে ব্যবহৃত হবে না। নারীদের নিজস্ব যোগ্যতা ও দক্ষতাই হবে নির্বাচিত হওয়ার মূল মাপকাঠি। তৃতীয়ত, ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব সংসদ সদস্য একই দায়দায়িত্ব, ক্ষমতা ও সুযোগসুবিধা ভোগ করবেন। ফলে নারী সদস্যরা আর আলংকারিক হিসেবে গণ্য হবেন না এবং তাদেরকে হীনমন্যতায় ভুগতে হবে না। অর্থাৎ এ পদ্ধতিতে সংসদ হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক। চতুর্থত, ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে সংরক্ষিত আসনের নারীরা ভোটারদের কাছে দায়বদ্ধ হবেন, দলীয় নেতা-নেত্রীদের কাছে নয়। কারণ এ ব্যবস্থায় তারা নেতা-নেত্রীদের অনুকম্পার কারণে সংসদ সদস্য হন না। প্রসঙ্গত, দায়বদ্ধতাহীন ক্ষমতা গণতান্ত্রিক চেতনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। পঞ্চমত, চারটি নির্বাচনি চক্রে বা চার টার্মে প্রত্যেক আসন থেকে অন্তত একবার একজন নারী সরাসরিভাবে, যোগ্যতার ভিত্তিতে, সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ পাবেন। এতে দেশে একঝাঁক নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি হওয়ার দ্বার উন্মোচিত হবে। ষষ্ঠত, ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি ব্যবহার করলে সংসদে নারী আসনের সংখ্যা বাস্তবে এক-চতুর্থাংশের বেশি হবে। কারণ সংরক্ষিত আসনের বাইরেও সাধারণ আসন থেকে নারীরা নির্বাচিত হয়ে আসার সুযোগ পাবেন। তাই এটি হবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নারী নেতৃত্ব সৃষ্টির একটি যুৎসই পদ্ধতি।

ভারতের পঞ্চায়েত বা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে এ ধরনের ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি বহুদিন থেকেই চালু আছে। তাই সংরক্ষিত আসন যে নারী নেতৃত্ব বিকাশের উৎকৃষ্টতম পদ্ধতি তা বাংলাদেশ ও ভারতের তুলনামূলক অভিজ্ঞতা থেকে সুস্পষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের তুলনায় ২০০৩ সালের নির্বাচনে সংরক্ষিত নারী আসনে প্রার্থীর সংখ্যা ৪৩ হাজার ৯৬৯ জন থেকে কমে ৪৩ হাজার ৭৬৪-তে এসে দাঁড়িয়েছিল, যদিও সময়ের সাথে সাথে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে প্রার্থীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি হওয়া উচিত ছিল। পক্ষান্তরে, ভারতের পঞ্চায়েতে নারী প্রতিনিধির সংখ্যা বেড়েছে। যেমন, ভারতীয় পঞ্চায়েতের তিন স্তরে – গ্রাম, মধ্য (পঞ্চায়েত সমিতি) এবং জেলায় – মোট নারী সদস্যের সংখ্যা ২০০২ সালে প্রায় ৫ লাখ ৮৬ হাজার থেকে ২০০৮ সালে প্রায় ১০ লাখ ৪০ হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতে নারী প্রতিনিধির সংখ্যা বেড়েছে ১৩ হাজার ৩০০ থেকে ২১ হাজার ৩৫১-তে।

ভারত থেকে আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ভারতীয় পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০ হাজার জনের ওপর পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, এই সংরক্ষণ পদ্ধতি অনেক নারীকে (৪৩%) প্রথমবারের মতো নির্বাচনে অংশগ্রহণে উদ্দীপ্ত করেছে।[৬৪] বেশিরভাগ নারী প্রতিনিধির ক্ষেত্রে দেখা যায়, পূর্বে তাদের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততা অত্যন্ত সীমিত ছিল এবং প্রথম নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মধ্য দিয়েই তাদের সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশের সূচনা ঘটে।[৬৫]

---

[৬৪] Nupur Tiwari, ''Rethinking the Rotation Term of Reserved Seats for Women in Panchayati Raj,'' *Commonwealth Journal of Local Government,* May 2009.

[৬৫] বদিউল আলম মজুমদার, 'সংবিধান সংশোধন ও নারী আসন,' *প্রথম আলো*, *১২ অক্টোবর, ২০১০।*

জাতীয় সংসদের ১০০ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত করার এ প্রস্তাব অনেকের কাছে অবাস্তব ও অকল্পনীয় মনে হতে পারে। বিশেষ করে পুরুষ রাজনীতিবিদরা এর বিরোধিতা করতে পারেন। কিন্তু অবাস্তব, অকল্পনীয় মনে হবে কিংবা পুরুষদের বিরোধিতার মুখে পড়বে বলে এ প্রস্তাব থেকে সরে আসা যুক্তিযুক্ত হবে না। শেখ হাসিনার অপশাসনের পতন ঘটবে এটিও একসময় অবাস্তব ও অকল্পনীয় বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু আমাদের ছাত্র এবং ছাত্রীরা সে অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখিয়েছে। সঠিক ও উপযুক্ত কাজের জন্য প্রয়োজন সকলের সংঘবদ্ধ শক্তি ও প্রয়াস - এটাই জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানের মূল চেতনা। এ চেতনাকে ধারণ করে দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীদের ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিতে হবে, তা যতই অকল্পনীয় বা দুরূহ মনে হোক।

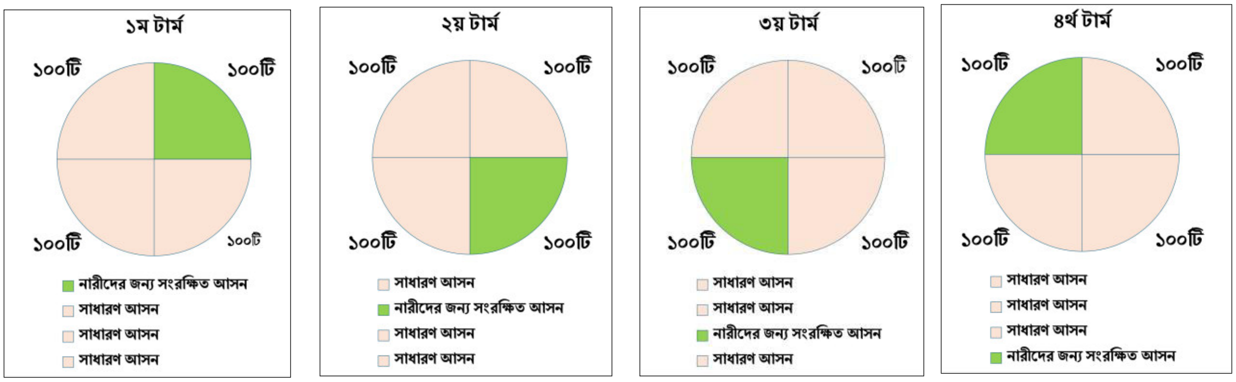

চিত্র ১: ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে সংসদ নির্বাচনের বিভিন্ন টার্মে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের বিভাজন

স্থানীয় সরকারে সংরক্ষিত নারী আসন

আমাদের স্থানীয় সরকারেও নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদে মোট ১২টি আসনের মধ্যে তিনটি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে এবং প্রতি তিনটি সাধারণ আসন থেকে একজন নারী জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সরাসরি নির্বাচিত হয়ে আসেন। একই ধরনের নির্বাচন পদ্ধতি পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনে বিরাজমান। বর্তমানে উপজেলা পরিষদে একজন মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান সরাসরি নির্বাচিত হয়ে আসার বিধান রয়েছে। পক্ষান্তরে নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পরোক্ষ ভোটে এক-তৃতীয়াংশ – ২১ জনের মধ্যে সাতজন – নারী জেলা পরিষদে নির্বাচিত হয়ে আসেন। আইয়ুব খানের প্রচলিত মৌলিক গণতন্ত্রের আদলে জেলা পরিষদে বিদ্যমান পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে বিশেষজ্ঞদের কঠোর সমালোচনা রয়েছে। সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত তাঁর *জেলায় জেলায় সরকার* গ্রন্থে পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত জেলা পরিষদকে একটি অথর্ব প্রতিষ্ঠান বলে আখ্যায়িত করেছেন (ইউপিএল ২০০২)।[৬৬] এছাড়াও স্বল্প সংখ্যক নির্বাচকমণ্ডলী হওয়ার কারণে গত দুটি জেলা পরিষদ নির্বাচন ভোট কেনাবেচার মহোৎসবে পরিণত হয়েছে, যা এ প্রতিষ্ঠানকে চরমভাবে কলুষিত করেছে।

স্থানীয় সরকারে বিরাজমান তিনটি সাধারণ আসন থেকে একজন নারী প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার পদ্ধতি জাতীয় সংসদে বিদ্যমান সংরক্ষণ পদ্ধতি থেকে কিছুটা উন্নত হলেও, এটির অনেক গুরুতর সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রথমত, এটি চরম বৈষম্যমূলক। পুরুষ প্রতিনিধিদের একক সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ থাকলেও সংরক্ষিত আসনের নারীদের তিনটি আসন থেকে নির্বাচিত হতে হয়, যা নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণেরই প্রতিফলন। দ্বিতীয়ত, এতে দ্বৈত প্রতিনিধিত্ব থাকে, যার ফলে সংরক্ষিত আসনের নারীদের একক নির্বাচনি এলাকা থাকে না এবং তাঁদের পক্ষে সেই নির্বাচনি এলাকায় নিবেদিত জনকল্যাণমুখী প্রচেষ্টার মাধ্যমে জনপ্রিয়তা অর্জন করে পরবর্তীতে পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়ে আসার সুযোগ থাকে না। তৃতীয়ত, সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা অনেক ক্ষেত্রে একস্ট্রা বা অতিরিক্ত হিসেবেই বিবেচিত হয়। তাঁরা অনেকটা দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিনিধিতে পরিণত হন। চতুর্থত, ১৯৭৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদে এ ধরনের সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রচলিত হওয়ার পর অনেক নারী সাধারণ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও বর্তমানে এ সংখ্যা প্রায় শূন্যে নেমে এসেছে। কারণ দলগুলো নারীদেরকে সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেছে। এ ক্ষেত্রে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, নারীদের জন্য আসন সংরক্ষিত করা আছে, তাই তাঁদের সাধারণ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অযৌক্তিক। উপজেলা পরিষদে নির্বাচিত মাত্র একজন ভাইস-চেয়ারম্যানও উপজেলা পর্যায়ে একঝাঁক নারী নেতৃত্ব সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রসঙ্গত, উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত নারী ভাইস-চেয়ারম্যানদের কোনো ক্ষমতা নেই বললেই চলে।

স্থানীয় সরকারে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ক্ষেত্রে অতি সহজেই ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি ব্যবহার করা যাবে। ইউনিয়ন পরিষদের কথাই ধরা যাক। ইউনিয়ন পরিষদে বর্তমানে চেয়ারম্যান ছাড়াও ১২ জন সদস্য রয়েছেন, যার মধ্যে ৯ জন সাধারণ আসন থেকে এবং বাকী তিনজন সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত। মোট সদস্য সংখ্যা ১২ জন রেখেই এক-তৃতীয়াংশ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষণ করা যেতে পারে। এজন্য ইউনিয়ন পরিষদকে বিদ্যমান ৯টির পরিবর্তে ১২টি ওয়ার্ডে ভাগ করতে হবে এবং লটারির মাধ্যমে প্রথম টার্মে ৪টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে এবং অন্য ৮টি আসন সাধারণ আসন হিসেবে থাকবে (চিত্র ২), যেখানে নারী-পুরুষ উভয়েই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে। দ্বিতীয় টার্মে আবারও লটারির মাধ্যমে অন্য ৪টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং অন্য

[৬৬] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *জেলায় জেলায় সরকার* (ঢাকা: ইউনিভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০২)

৮টি আসন উন্মুক্ত সাধারণ আসনে পরিণত হবে (চিত্র ২)। তৃতীয় টার্মে অবশিষ্ট ৪টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত হবে এবং অন্য ৮টি সাধারণ আসন হিসেবে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য উন্মুক্ত থাকবে (চিত্র ২)। এভাবে তিন টার্ম বা ১৫ বছরের মধ্যে ইউনিয়নের প্রত্যেকটি আসন থেকে একজন নারী যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রত্যেকটি আসন থেকে সরাসরিভাবে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ পাবেন। এ পদ্ধতিতে যোগ্য নারীরা জনকল্যাণমূলক কাজ, সৎ আচরণ এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে জনগণের হৃদয় মন জয় করে পরবর্তীতে পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জিতে আসতে পারবে। এর ফলে ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের সত্যিকারের আসন সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশের বেশি হবে। আর এর মাধ্যমে তৃণমূল থেকে এক ঝাঁক নারী নেতৃত্ব তৈরি হবে এবং নারীর সত্যিকারের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথ প্রশস্ত হবে।

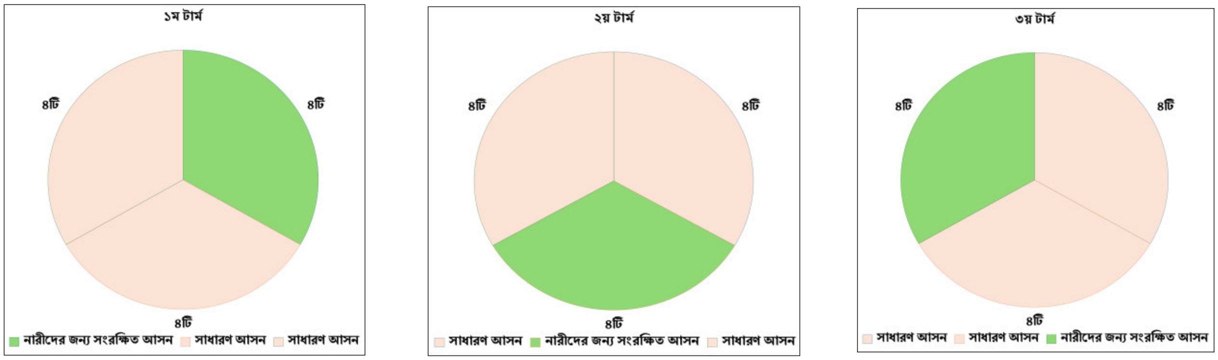

চিত্র ২: ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের বিভিন্ন টার্মে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের বিভাজন

উপরিউক্ত বিশ্লেষণ থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, বর্তমানে বিরাজমান পদ্ধতির তুলনায় ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নারী নেতৃত্ব সৃষ্টির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আমরা মনে করি যে, এর মাধ্যমে স্বংয়ক্রিয়ভাবে তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত একঝাঁক নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে, যেমনি ঘটেছে ভারতের পঞ্চায়েত প্রথার মাধ্যমে। পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের অনেক রাজ্যেই আগে ৩৩ শতাংশ আসন নারীদের জন্য ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে সংরক্ষিত ছিল, বর্তমানে যা ৫০ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে। ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকা স্বত্বেও ঘূর্ণায়মান পদ্ধতির কারণে সে সব রাজ্যে নারীর প্রতিনিধিত্বও অনেক ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ পেরিয়ে গেছে। এটি ঘটেছে সাধারণ আসন থেকে পুরুষের সঙ্গে নারীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জিতে আসার মাধ্যমে। তাই আমরা – নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সদস্যরা – মনে করি যে, ছাত্র-জনতার নেতৃত্বে পরিচালিত গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে নারীর প্রতি বৈষম্য অবসানের এবং নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য আমাদের জন্য একটি ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

সুপারিশ

১. জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংরক্ষিত আসনের ক্ষেত্রে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতির প্রচলন করা। সংরক্ষিত আসনে নারী প্রতিনিধিত্ব ১০০-তে বা ২৫ শতাংশে উন্নীত করে মোট ৪০০ আসনের মধ্যে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি কার্যকর করা।

২. একইভাবে স্থানীয় সরকারের সকল স্তরে সংরক্ষিত নারী প্রতিনিধিত্ব ৩৩ শতাংশ উন্নীত করে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতির প্রচলন করা।

উল্লেখ্য, সুনির্দিষ্ট নির্বাচনি এলাকা থেকে যোগ্যতার ভিত্তিতে নারীদের সরাসরিভাবে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করার পক্ষে ব্যাপক জনমত রয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) কর্তৃক সম্প্রতি ৪৬ হাজারের অধিক ব্যক্তির মধ্যে পরিচালিত এক জরিপ থেকে দেখা যায় যে, জরিপে অংশগ্রহণকারী ৭৩.৮৮ শতাংশ মানুষ নির্দিষ্ট নির্বাচনি এলাকা থেকে নারীদের সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে মতামত দিয়েছেন (চিত্র ৩)।

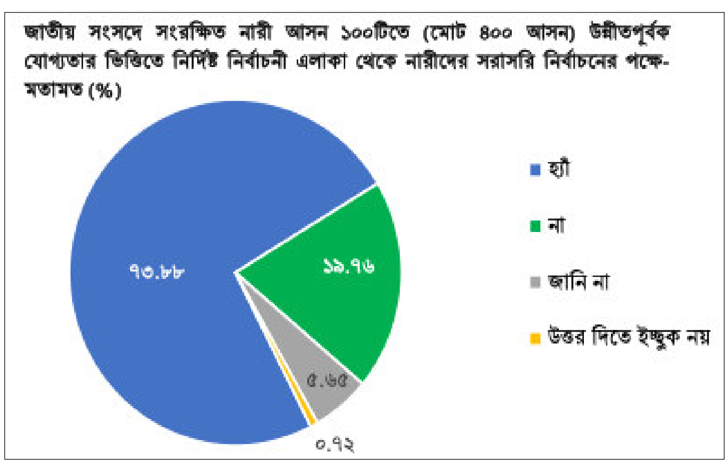

চিত্র ৩: বিবিএস কর্তৃক পরিচালিত জরিপে নারীদের সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে মতামত

১০. প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থা

আমাদের দেশে বিগত দিনগুলোতে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ তফসিলে ঘোষিত নির্বাচনের দিন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভোটকেন্দ্রে সশরীরে উপস্থিত হয়ে ভোট প্রদানের কাজ সম্পন্ন করে এসেছেন। বর্তমান সময়ে বিশ্বব্যাপী ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত না হয়েও ভোটারগণ নানা পন্থায় ভোট প্রদান করছেন। বাংলাদেশের এক দশমাংশের বেশি নিবন্ধিত ভোটার বা ভোটার হওয়ার উপযুক্ত নারী-পুরুষ পেশাগত কারণে ভিন্ন বাসস্থানে অবস্থান, বার্ধক্য, অসুস্থতা, কেন্দ্রে গোলযোগের আশঙ্কা-সহ নানা কারণে ভোটকেন্দ্রে সশরীরে উপস্থিত হয়ে ভোট দেন না বা দিতে পারেন না। অনুপস্থিত ভোটারদের একটি বড় অংশ আবার প্রবাসী। তারা ভোটের সময় বিদেশে অবস্থান করেন।

যদিও পোস্টাল ব্যালট ব্যবহার করে দেশে অবস্থানকারী বিশেষ শ্রেণির কিছু জনগণের জন্য পোস্টাল ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত না থেকেই ভোট প্রদানের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু বিদেশের বিপুল সংখ্যক ভোটারের জন্য এরকম কোনো ব্যবস্থা নেই। তার উপরে বর্তমান পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থায় পদ্ধতিগত সমস্যা এবং ব্যবস্থাপনাগত অপ্রতুলতা বিদ্যমান, যার কারণে দেশের মধ্যেও বিপুল সংখ্যক ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকার হতে বঞ্চিত থেকেছে। এখন দেশের ভোট ব্যবস্থাকে অধিকতর অংশগ্রহণমূলক করার স্বার্থে এবং সবার ভোটাধিকার নিশ্চিত করার জন্য দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি নাগরিকদের ভোটদান নির্বিঘ্ন করার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে ভাবা দরকার। তাছাড়া ব্যবস্থাপনাগত জটিলতা এড়ানোর জন্য কাউকে ভোট প্রদানের সুযোগ বঞ্চিত করা ব্যক্তি নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার ক্ষুণ্ন করার শামিল। এসব কারণে বর্তমান পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থার পদ্ধতিগত সমস্যা এবং ব্যবস্থাপনাগত অপ্রতুলতা দূর করার জন্য তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় পুরো ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর দরকার এবং সুযোগ রয়েছে।

অনুপস্থিত ভোটারদের শ্রেণি বিভাগ

অনুপস্থিত ভোটারগণ যারা পোস্টাল ভোটিংয়ের জন্য উপযুক্ত তাদেরকে মোটা দাগে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে। নিচে আমরা এই দুই শ্রেণির ব্যাপারে আলোকপাত করছি।

বিদেশে অবস্থানকারী বা প্রবাসী

ক. বাংলাদেশি নাগরিক, তিনি দেশে ভোটার তালিকাভুক্ত আছেন এবং তার জাতীয় পরিচয়পত্র রয়েছে। তিনি প্রবাসে আছেন এবং প্রবাসী হিসেবে বাংলাদেশ দূতাবাসে নিবন্ধিত আছেন।

খ. বিদেশে আছেন, বয়স আঠার বছর উত্তীর্ণ, কিন্তু ভোটার তালিকাভুক্ত হননি।

গ. জন্মসূত্রে বাংলাদেশি, কিন্তু অন্য দ্বিতীয় কোনো দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশে তিনি দ্বৈত নাগরিক হিসেবে নিবন্ধিত বা অনিবন্ধিত।

ঘ. বাংলাদেশি নাগরিক এবং ভোটার তালিকাভুক্ত। নির্বাচনকালীন কোনো জরুরি প্রয়োজনে নির্বাচনকালীন বিদেশে থাকতে হচ্ছে।

ঙ. দূতাবাসে বা কোনো সরকারি কাজে বিদেশে অবস্থান করছেন এমন ব্যক্তিবর্গ ও তাদের পরিবার।

দেশে অবস্থান করেও ভোটের দিন কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে অপারগ

ক. কর্ম উপলক্ষে নিজ জেলার বাইরে অবস্থান করেন।

খ. বার্ধক্য, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে ভোট কেন্দ্র পর্যন্ত যেতে অক্ষম।

গ. সরকারি কাজে ভোটের দিন অনত্র অবস্থান করতে হবে।

ঘ. বিচারে শাস্তিপ্রাপ্ত, বিচারাধীন, নিরাপত্তা হেফাজতসহ যে কোনো কারণে কারাগারে অন্তরিন ব্যক্তি।

উল্লেখ্য, এই অধ্যায়ে আলোচনা প্রাসঙ্গিক রাখার সুবিধার্থে আমদের সকল আলোচনা প্রবাসী ভোটিংয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখব।

প্রবাসী ভোটারদের জন্য বিদ্যমান ভোটিং ব্যবস্থা এবং তাদের পর্যালোচনা

অনুপস্থিত ভোটারদের ভোটদানের সহজ ব্যবস্থাপনার জন্য তাদেরকে প্রথমে একটি পৃথক ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হয়। সেই অনুপস্থিত ভোটার তালিকা তৈরি হয়ে গেলে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মোটাদাগে চারটি উপায়ে অনুপস্থিত ভোটাররা ভোট দিতে পারেন[৬৭]। আমরা এখন এই চারটি ভোটদান প্রক্রিয়া এবং প্রতিটি প্রক্রিয়ার সুবিধা এবং অসুবিধা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করব।

---

[১] "The ACE Electoral Knowledge Network writing on External Voting," Accessed: 20-10-2024. [Online]. Available: https://aceproject.org/ace-ar/topics/va/201de-voting201d-and-external-voting

ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থেকে ভোট (In-person voting)

এই প্রক্রিয়াতে একজন ভোটারকে ভোট দেওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট দিনে একটি নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত থাকতে হয়। এটি প্রবাসীদের ভোট দেওয়ার অন্যতম জনপ্রিয় পদ্ধতি যা অনেক দেশে প্রচলিত আছে। ভোট নেওয়ার স্থানের আবার বেশ কিছু প্রকারভেদ আছে যেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

- **ভিন্ন দেশে অবস্থিত কনস্যুলেটে:** এই প্রক্রিয়াতে একটি দেশের সংশ্লিষ্ট কনস্যুলেট ভোট কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে এবং প্রবাসীরা তাদের ভোট দেওয়ার জন্য নির্বাচনের দিন সেই ভোটকেন্দ্রে যান। যেসব দেশে প্রবাসী ভোটারদের ভোটদানের অনুমতি আছে তাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ, যেমন, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফ্রান্স, ফিনল্যান্ড, মেক্সিকো এবং জাপান এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। কোন দেশে প্রবাসী ভোটারের সংখ্যা যখন তুলনামূলকভাবে কম তখন এই পদ্ধতিটি সুবিধাজনক। তবে প্রবাসী জনসংখ্যা বেশি হলে নির্বাচনের দিনে বিপুল সংখ্যক ভোটার পরিচালনা করা চ্যালেঞ্জিং হয়ে ওঠতে পারে।
- **বৈদেশিক নির্ধারিত কোনো ভোটকেন্দ্রে:** যদি একটি দেশের প্রবাসী ভোটার অনেক বেশি হয় তখন সেই দেশের কনস্যুলেট প্রাঙ্গণের বাইরে পৃথক ভোটকেন্দ্রের মাধ্যমে ভোটদানের ব্যবস্থা করা হয়। প্রবাসী ভোটার সংখ্যার ভিত্তিতে বিদেশের কোনো দেশে একাধিক ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে। তুরস্ক এবং তিউনিসিয়ার মতো বেশ কয়েকটি দেশ ইউরোপের বেশ কিছু দেশে বসবাসকারী তাদের বৃহৎ প্রবাসী সম্প্রদায়ের জন্য এই পদ্ধতির প্রয়োগ করেছে।
- **নিজ দেশের নির্ধারিত কোন ভোটকেন্দ্রে:** কানাডা, ভারত এবং ইসরায়েল-সহ কয়েকটি দেশ আবার এরকম ব্যবস্থা নিয়েছে যে তাদের প্রবাসীদেরকে ভোটের দিনে নিজ দেশে তাদের নির্বাচনি এলাকার নির্ধারিত ভোটকেন্দ্রে ভোট দেওয়ার জন্য শারীরিকভাবে উপস্থিত হতে হয়।

সুষ্ঠু, পক্ষপাতহীন এবং স্বচ্ছ উপায়ে ভোটদান পরিচালিত হলে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থেকে ভোটদানের এই পদ্ধতি ভোটের অখণ্ডতা (integrity) সহজে নিশ্চিত করতে পারে। ভোটারদের জন্যও এই পদ্ধতি বেশ সুবিধাজনক কারণ এটি বিদ্যমান ভোটদান ব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ। সেজন্য অনেক দেশ এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। তবে এই পদ্ধতির বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সমস্যা রয়েছে:

- ভোটকেন্দ্র থেকে যেসকল ভোটাররা অনেক দূরে বসবাস করেন তাদের পক্ষে একই দিনে ভ্রমণ করে ভোটকেন্দ্রে যাওয়া, ভোট প্রদান করা এবং আবার বাড়ি ফেরা খুবই চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায়। পুরো প্রক্রিয়াতে যে আর্থিক খরচ সেটাও অনেকের জন্য বহন করা কঠিন হতে পারে।
- অন্যদেশে ভোটকেন্দ্র স্থাপন এবং পরিচালনার জন্য সেই দেশের বিশেষ অনুমতি লাগতে পারে। ভোটের সময় সম্ভাব্য বিশৃঙ্খলতার চিন্তা করে অনেক সময় এই অনুমতি পাওয়া কঠিন হতে পারে।
- যদি কোনো দেশের প্রবাসীদের সংখ্যা অনেক বেশি হয় যেখানে কিছু দেশে অনেক বেশি সংখ্যক প্রবাসী বসবাস করেন তবে সেই দেশে এই ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা লজিস্টিক্যাল খুবই চ্যালেঞ্জিং এবং সর্বোপরি অত্যধিক ব্যয়বহুল হতে পারে।
- অনেক সময় কোনো দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের অতি শত্রুভাবাপন্ন এবং হিংসাত্মক মনোভাব এবং বিশৃঙ্খলতার ইতিহাসের কারণে, নির্বাচনের দিনে বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে মুখোমুখি সংঘর্ষের, এমনকি সহিংসতার বেশ ঝুঁকি রয়েছে। কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও চ্যালেঞ্জিং হতে পারে।

পোস্টাল ভোট (Postal voting)

এই পদ্ধতিতে ভোটাররা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে তাদের বাড়ি থেকে রিমোটলি ভোট দিতে পারেন। বিভিন্ন দেশ পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থা সহজতর করতে বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। তবে সাধারণত এই পদ্ধতিতে ভোটদানের স্টেপগুলো এরকম: প্রথমেই যোগ্য ভোটারদের একটি পৃথক পোস্টাল ভোটিংয়ের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরপরে ভোটাররা তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় একটি পোস্টাল ভোট প্যাকেজ পান, যার মধ্যে একটি পোস্টাল ব্যালট এবং ব্যালট ফেরত পাঠানোর জন্য একটি ব্যালট খাম থাকে। ভোটাররা এরপরে ব্যালটে তাদের ভোট দেন এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ ব্যালট খামের মাধ্যমে তা তাদের নিজ দেশে বা যেই দেশে বসবাস করছেন সেই দেশের নির্দিষ্ট কনস্যুলেটে ফেরত পাঠান। এর ফলে ভোটারদের আর কষ্ট করে নির্দিষ্ট ভোট কেন্দ্রে যেতে হয় না, যার ফলে সময় ও খরচের সাশ্রয় হয়। কোনো কোনো দেশের জন্য এইভাবে পোস্টাল ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটের ব্যবস্থা করার খরচ সশরীরে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত থেকে ভোটদানের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম। তদুপরি পোস্টাল ভোটিংয়ে ভোটদানের ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভোটার ও সমর্থকদের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঝুঁকি থাকে না। তবে পোস্টাল ভোটিংয়ের বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেমন ভোটারদের আইডেন্টিটির প্রামাণ্যতা (authenticity) নিশ্চিত করা এবং ভোট যে স্বাধীনভাবে এবং গোপনে কোনো প্রকার ভয়-ভীতি ছাড়া দেওয়া হয়েছে তা নিশ্চিত করা। এছাড়াও সমগ্র প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করাও চ্যালেঞ্জিং হতে পারে।

প্রক্সি ভোট (Proxy voting)

এই পদ্ধতিতে একজন ভোটার অন্য আরেকজন ভোটারকে তাদের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য মনোনীত করতে পারেন। মনোনীত প্রক্সি ভোটার তারপর নিজ দেশে বা সশরীরে ভোটদানের মাধ্যমে মূল ভোটারের পক্ষে ভোট দিতে পারেন। এই পদ্ধতির একটি প্রধান সমস্যা হচ্ছে ভোট জালিয়াতি, কারণ মূল ভোটারকে অন্ধভাবে মনোনীত ভোটারকে বিশ্বাস করতে হয় যে তিনি যেই প্রার্থীকে চান প্রক্সি ভোটার সেই প্রার্থীকেই তাদের হয়ে ভোট দিয়েছেন। এই কারণে খুব অল্প কয়েকটি দেশ, যেমন ফ্রান্স এবং যুক্তরাজ্য, তাদের প্রবাসীদের জন্য এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

ইলেক্ট্রনিক ভোট (Electronic voting)

এই পদ্ধতিতে একজন ভোটার ইলেক্ট্রনিক উপায়ে তাদের ভোট প্রদান করেন। দুইভাবে ইলেক্ট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়া সম্ভব, যা নিচে আলোচনা করা হলো:

- ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (Electronic Voting Machine, EVM) হলো ইলেক্ট্রনিক ভোটদানের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা একটি হার্ডওয়্যার। ভোটাররা ইভিএম ব্যবহার করে ভোট দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কোনো স্থানে, যেমন, বিদেশি কনস্যুলেটে যান। ব্রাজিল এবং এল সালভাডরের মতো দেশগুলো এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। তবে ইভিএম ডিভাইসের নিরাপত্তা, গোপনীয়তা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে বিশ্বব্যাপী বিতর্ক রয়েছে। বাংলাদেশে ইভিএমভিত্তিক ভোটদানের সন্দেহজনক বাস্তবায়নের কারণে আমরা এ বিষয়ে আমরা আর বিস্তারিত আলোচনা করব না।
- আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে ইন্টারনেট (অনলাইন) ভোটিং, যা I-ভোটিং নামেও পরিচিত। এই পদ্ধতিতে ভোটাররা তাদের পছন্দের ডিভাইস, যেমন, ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, বা স্মার্টফোন ব্যবহার করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যেকোনো জায়গা থেকে ভোট দিতে পারেন। এল সালভাডর, মেক্সিকো, এবং সুইজারল্যান্ডের মতো দেশগুলো তাদের প্রবাসী ভোটারদের জন্য এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এই পদ্ধতির অনেক সুবিধা রয়েছে, তবে এই পদ্ধতির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ভোটারদের আইডেন্টিটির প্রামাণ্যতা নিশ্চিত করা এবং ভোটের নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশ এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থার পর্যালোচনা

বিভিন্ন অনুপস্থিত ভোটদান পদ্ধতির শক্তি ও দুর্বলতা বিশ্লেষণের পর আমরা মনে করি যে পোস্টাল ভোটিং একটি বাস্তবসম্মত সমাধান হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে, বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো দেশের জন্য যাদের অনেক বেশি প্রবাসী রয়েছে।

এই সেকশনে আমরা বাংলাদেশ সহ পাঁচটি দেশের পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করেছি। দেশগুলো হলো মালয়েশিয়া, মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং বাংলাদেশ। এদের মধ্যে মালয়েশিয়া, মেক্সিকো এবং যুক্তরাষ্ট্র তাদের প্রবাসী নাগরিকদের পোস্টাল ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটদানের সুযোগ দেয়। যদিও যুক্তরাজ্যে প্রবাসী ভোটারদের জন্য পোস্টাল ভোটিংয়ের কোনো সুযোগ নেই, তবে পোস্টাল ভোটিং বাস্তবায়নকারী দেশগুলোর মধ্যে প্রথম দিককার দেশ হিসেবে যুক্তরাজ্যের ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা চিন্তা করে যুক্তরাজ্য পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থাও এখানে বিশ্লেষণ করেছি। সর্বশেষে বাংলাদেশে নির্দিষ্ট কিছু গোষ্ঠীর মানুষের জন্য পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থা আছে, সেটিও এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিটি দেশের পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থা বিশ্লেষণের সময় আমরা পোস্টাল ভোটিংয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রধান চ্যালেঞ্জ ও সমস্যাগুলোও চিহ্নিত করেছি।

মালয়েশিয়া

একজন প্রবাসী মালয়েশিয়ান ভোটারকে প্রথমে MySPR নামক একটি বিশেষ ওয়েবসাইটে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করেন[৬৮]। অ্যাকাউন্ট তৈরি করার সময় তাদের MyKAD (মালয়েশিয়ান পরিচয়পত্র) নম্বর সহ অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য যেমন তাদের বিদেশের ফোন নম্বর, ইমেইল ঠিকানা এবং একটি পাসওয়ার্ড দিতে হয়। অ্যাকাউন্ট তৈরির পর তাদের পোস্টাল ভোটিংয়ের জন্য আবেদন করতে হয় এবং অনুমোদন পেলে তাদেরকে পোস্টাল ভোটিংয়ের জন্য নিবন্ধিত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নির্বাচনের কয়েকদিন আগে নিবন্ধিত ভোটাররা ডাকযোগে একটি পোস্টাল ভোট প্যাকেজ পান। প্যাকেজের মধ্যে দুটি খাম (Envelope A এবং Envelope B) এবং একটি ঘোষণাপত্র থাকে। ভোটার কিছু তথ্য, যেমন তাদের MyKAD নম্বর দিয়েফর্মটি পূরণ করে স্বাক্ষর করেন। একজন সাক্ষী (অন্য একজন মালয়েশিয়ান নাগরিক) তারপর তার MyKAD নম্বর ঘোষণাপত্রে দিয়ে তার স্বাক্ষর প্রদান করেন। ভোটার সরবরাহকৃত ব্যালট পেপার ব্যবহার করে তার ভোট দেন এবং ব্যালটটি Envelope B-এর মধ্যে রাখেন। তারপর তিনি ঘোষণাপত্রটি Envelope A-এর মধ্যে রাখেন এবং Envelope A এবং Envelope B উভয়ই অন্য একটি পোস্টাল খামের মধ্যে ঢুকিয়ে মালয়েশিয়ায় ডাকযোগে ফেরত পাঠান। উল্লেখ্য যে, ডাকযোগে ফেরত পাঠানোর খরচ ভোটার নিজে বহন করেন।

---

[৬৮] "MySPR ONLINE APPLICATION GUIDE", Accessed: 20-10-2024. [Online]. Available: https://www.kln.gov.my/documents/33488/0/POSTAL+VOTE+ONLINE+APPLICATION+GUIDE+%28CATEGORY+1B%29+%28ENGLISH%29.pdf/bb7870e1-c9d3-4de3-9c94-afe734bc9430

সমস্যাসমূহ

- এই প্রক্রিয়াতে স্কেলেবিলিটির সমস্যা রয়েছে। কারণ প্রতিটি পোস্টাল ব্যালট গ্রহণ করার আগে ঘোষণাপত্রে প্রদত্ত স্বাক্ষর এবং পরিচয় নম্বরগুলো যাচাই করতে হয়। ডাকযোগে প্রাপ্ত ব্যালটের সংখ্যা অনেক বেশি হলে এই যাচাইকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে অনেক বেশি সময় লাগতে পারে।
- এই প্রক্রিয়াতে কোনো স্বচ্ছতা এবং নিরীক্ষণযোগ্যতা (transparency and auditability) নেই। যার কারণে প্রদত্ত ভোট কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছেছে কিনা, সঠিকভাবে ব্যালট বক্সে ঢোকানো হয়েছে কিনা এবং এমনকি গণনা করা হয়েছে কিনা তা ভোটারের পক্ষে নিশ্চিতভাবে জানার উপায় থাকেনা। এই দুটি শর্ত পূরণ না করে পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থায় ভোটারের আস্থা অর্জন করা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে।
- ভোটার নিজের খরচে পোস্টাল প্যাকেজটি মালয়েশিয়ায় ফেরত পাঠান, যা অনেকের জন্য বহন করা কঠিন হতে পারে।

মেক্সিকো

প্রথমে প্রবাসী ভোটারকে পোস্টাল ভোটিংয়ের জন্য নিবন্ধিত হন। নিবন্ধিত ভোটার ভোটের কয়েকদিন আগে ডাকযোগে একটি পোস্টাল ভোট প্যাকেজ পান। মেক্সিকান কর্তৃপক্ষ পোস্টাল ভোট প্যাকেজ বিতরণ সহজ করতে এবং এর সম্পর্কিত খরচ বহন করতে বেসরকারি কুরিয়ার কোম্পানিগুলোর সঙ্গে কাজ করে। প্যাকেজের মধ্যে দুটি খাম (একটি ব্যালট খাম এবং একটি ডাক খাম) এবং একটি ব্যালট পেপার থাকে। ডাক খামটির উপরে স্ট্যাম্প যুক্ত থাকে যাতে ভোটারের বিবরণ এবং প্রাপকের ঠিকানা রয়েছে। ভোটার ব্যালট পেপারে ভোট দেন এবং এটি ব্যালট খামে ঢোকান যাতে ভোটার সম্পর্কিত কোনো তথ্য থাকে না। সিলকৃত ব্যালট খামটি তারপর ডাকযোগে ফেরত পাঠানোর জন্য ডাক খামের মধ্যে ঢোকানো হয়[৬৯]।

সমস্যাসমূহ

- এই প্রক্রিয়াতে ভোট এবং ভোটারের সম্ভাব্য সংযোগযোগ্যতার (linkability) সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ পোস্টাল খামে ভোটারের ঠিকানা থাকে। ভোটারকে কর্তৃপক্ষকে বিশ্বাস করতে হবে যে তাদের ভোট তাদের সঙ্গে লিঙ্ক করা হবে না। এটি পুরোপুরি নির্ভর করে কর্তৃপক্ষ কীভাবে পোস্টাল ব্যালট হ্যান্ডেল করে তার উপরে।
- এই প্রক্রিয়াতে কোনো স্বচ্ছতা এবং নিরীক্ষণযোগ্যতা (transparency and auditability) নেই। যার কারণে প্রদত্ত ভোট কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছেছে কিনা, সঠিকভাবে ব্যালট বক্সে ঢোকানো হয়েছে কিনা এবং গণনা করা হয়েছে কিনা তা ভোটারের পক্ষে নিশ্চিতভাবে জানার উপায় থাকেনা। এই দুটি শর্ত পূরণ না করে পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থায় ভোটারের আস্থা অর্জন করা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র (ইউএসএ)

যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য ভিন্ন পোস্টাল ভোটিং প্রক্রিয়া ব্যবহার করে। এখানে আমরা মিনেসোটার পোস্টাল ভোটিং প্রক্রিয়াটি আলোচনা করছি[৭০]। প্রথমে ভোটারকে পোস্টাল ভোটিংয়ের জন্য নিবন্ধন করতে হয়। নির্বাচনের কয়েকদিন আগে নিবন্ধিত ভোটাররা ডাকযোগে একটি পোস্টাল ভোট প্যাকেজ পান। প্যাকেজের মধ্যে একটি নির্দেশনা পত্র, তিনটি খাম (একটি ব্যালটের জন্য, একটি স্বাক্ষরের জন্য এবং একটি পোস্টাল ব্যালট বহন করার জন্য) এবং একটি ব্যালট পেপার থাকে। ভোটার ব্যালট পেপারে তাদের ভোট দেন এবং এটি ব্যালট খামের মধ্যে ঢুকিয়ে সিল করেন। পরবর্তীতে স্বাক্ষর খামে তাদের নাম, ঠিকানা, আইডি নম্বর এবং স্বাক্ষর দিয়ে পূরণ করেন। একজন সাক্ষী (অন্য একজন মার্কিন নাগরিক) তারপর স্বাক্ষর খামে তাদের নাম, ঠিকানা এবং স্বাক্ষর দেন। ব্যালট খামটি স্বাক্ষর খামের মধ্যে ঢোকানো হয় এবং সিল করা হয়। অবশেষে স্বাক্ষর খামটি বড় পোস্টাল খামের মধ্যে ঢুকিয়ে ডাকযোগে ফেরত পাঠাতে হয় অথবা নিকটস্থ মার্কিন কনস্যুলেটে জমা দেওয়া যায়। পোস্টাল খামটি খোলার পরে স্বাক্ষর খামটি বের করা হয় এবং ভোটারের স্বাক্ষর পূর্ববর্তী ডাটাবেজে সংরক্ষিত স্বাক্ষরের সঙ্গে তুলনা করে যাচাই করা হয়। এই যাচাইকরণের ভিত্তিতে ভোটটি হয় গ্রহণ করা হয় অথবা প্রত্যাখ্যান করা হয়।

সমস্যাসমূহ

- এই প্রক্রিয়াতে স্কেলেবিলিটির সমস্যা রয়েছে। কারণ প্রতিটি পোস্টাল ব্যালট গ্রহণ করার আগে ঘোষণাপত্রে প্রদত্ত স্বাক্ষর এবং পরিচয় নম্বরগুলো যাচাই করতে হয়। ডাকযোগে প্রাপ্ত ব্যালটের সংখ্যা অনেক বেশি হলে এই যাচাইকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে অনেক বেশি সময় লাগতে পারে।
- এই প্রক্রিয়াতে কোনো স্বচ্ছতা এবং নিরীক্ষণযোগ্যতা (transparency and auditability) নেই। পোস্টাল ব্যালট সঠিকভাবে ব্যালট বক্সে ঢোকানো হয়েছে কিনা কিংবা গণনা করা হয়েছে কিনা তা ভোটারের পক্ষে নিশ্চিতভাবে জানার কোনো উপায় নেই। এই দুটি শর্ত পূরণ না করে পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থায় ভোটারের আস্থা অর্জন করা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে।

---

[৬৯]"Democratic Integrity: Mexico 2024", Accessed: 20-10-2024. [Online]. Available:https://usmex.ucsd.edu/_files/democratic-integrity/democratic-integrity_13_03312024.pdf

[৭০]"Instructions: How to vote by mail ballot", Accessed: 20-10-2024. [Online]. Available:https://www.sos.state.mn.us/media/2313/mail-ballot-instructions.pdf

যুক্তরাজ্য (ইউকে)

ভোটারকে প্রথমেই পোস্টাল ভোটিংয়ের জন্য নিবন্ধিত হতে হয়। নির্বাচনের এক সপ্তাহ আগে নিবন্ধিত ভোটার ডাকযোগে একটি পোস্টাল ভোট প্যাকেজ পান। প্যাকেজের মধ্যে একটি নির্দেশনা পত্র, দুটি খাম (Envelope A এবং Envelope B), একটি ব্যালট পেপার এবং Envelope A-এর সঙ্গে সংযুক্ত একটি পোস্টাল ভোট স্টেটমেন্ট পান[৯১]। এই স্টেটমেন্টে ব্যালট পেপারের নম্বরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি ইউনিক নম্বর থাকে। স্টেটমেন্টে মধ্যে ভোটার তার নাম এবং জন্ম তারিখ লিখেন এবং স্বাক্ষর করেন। তারপর ভোটার ব্যালট পেপারে তার ভোট দেন, একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এটিকে ভাঁজ করেন এবং Envelope A-তে ঢোকান। এরপরে Envelope A-এর মধ্যে স্টেটমেন্ট ঢুকিয়ে সিল করেন। অবশেষে, Envelope A-কে Envelope B-এর মধ্যে ঢুকিয়ে সিল করেন এবং সিলকৃত Envelope B ডাকযোগে ফেরত পাঠান।

সমস্যাসমূহ

- এই প্রক্রিয়াতে ভোট এবং ভোটারের সম্ভাব্য সংযোগযোগ্যতার (linkability) যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ পোস্টাল ভোট স্টেটমেন্টে ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্ত থাকে। ভোটারকে কর্তৃপক্ষকে বিশ্বাস করতে হবে যে তাদের ভোট তাদের সঙ্গে লিঙ্ক করা হবে না। এটি পুরোপুরি নির্ভর করে কর্তৃপক্ষ কীভাবে পোস্টাল ব্যালট হ্যান্ডেল করেন তার উপরে।
- বিবৃতিতে দেওয়া তথ্য এবং স্বাক্ষর কীভাবে যাচাই করা হয় সেটা স্পষ্ট নয়। যদি যাচাই না করা হয় তাহলে এটি ভোটারের আইডেন্টিটির প্রামাণ্যতার (authenticity) সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।
- এই প্রক্রিয়াতে কোনো স্বচ্ছতা এবং নিরীক্ষণযোগ্যতা (transparency and auditability) নেই। পোস্টাল ব্যালট সঠিকভাবে ব্যালট বক্সে ঢোকানো হয়েছে কিনা কিংবা গণনা করা হয়েছে কিনা তা ভোটারের পক্ষে নিশ্চিতভাবে জানার কোনো উপায় নেই।এই দুটি শর্ত পূরণ না করে পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থায় ভোটারের আস্থা অর্জন করা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে।

বাংলাদেশ

বাংলাদেশে প্রবাসীদের জন্য ডাকযোগে ভোটদানের কোনো ব্যবস্থা নেই। তবে কিছু নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর ব্যক্তিরা নির্বাচন তফসিল ঘোষণার ১৫ দিনের মধ্যে তাদের নির্বাচনি এলাকার রিটার্নিং অফিসারের কাছে ডাকযোগে ভোটদানের জন্য আবেদন করতে পারেন। ভোটার ভোটের কয়েকদিন আগে একটি পোস্টাল ভোট প্যাকেজ পান। প্যাকেজের মধ্যে একটি নির্দেশনা সেট (ফরম ১১), দুটি খাম (একটি ব্যালটের জন্য (ফরম ৯) যাকে Envelope 'ক' হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে এবং অন্যটি একটি পোস্টাল খামের জন্য (ফরম ১০), যাকে Envelope 'খ' হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে), একটি ব্যালট পেপার এবং একটি ঘোষণাপত্র (ফরম ৮) থাকে।

ভোটার ঘোষণাপত্রে তার নাম, ঠিকানা, নির্বাচনি এলাকার নাম, সেই নির্বাচনি এলাকার মধ্যে ভোটার ক্রমিক নম্বর লিখেন এবং স্বাক্ষর করেন। একজন সাক্ষীকেও ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করতে হয় এবং পরে এই ঘোষণাপত্রটি একজন গেজেটেড বা কমিশনড অফিসার দ্বারা সত্যায়িত করতে হয়। ভোটার তারপর ব্যালট পেপারে তার ভোট দেন, যা পরে Envelope 'ক'-এর মধ্যে ঢুকিয়ে সিল করেন। এরপরে Envelope 'ক' এবং সত্যায়িত ঘোষণাপত্রটি Envelope 'খ'-এর মধ্যে ঢুকিয়ে Envelope 'খ'-কে বিনামূল্যে ডাকযোগে রিটার্নিং অফিসারের কাছে ফেরত পাঠান। রিটার্নিং অফিসার Envelope 'খ' পাওয়ার পরে খামটি খুলে ঘোষণাপত্র বের করে যাচাই করেন। ঘোষণাপত্র সত্যায়িত না হলে পোস্টাল ভোটটি বাতিল করেন। যদি ঘোষণাপত্র সত্যায়িত হয়ে থাকে তাহলে ভোটারের তথ্য যাচাই ও নিশ্চিত করার পরে প্রাপ্ত ব্যালট খামটি (Envelope 'ক') রেজিস্ট্রিতে নিবন্ধন করা হয়। এর পরে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে খামটি খোলা হয় এবং এর মধ্যেকার ব্যালট গণনা করা হয়।

সমস্যাসমূহ

- কোনো ভোটার পোস্টাল ভোটিংয়ের জন্য আবেদন করার পরে তার আবেদন সফল হয়েছে কিনা তা তাকে কীভাবে জানানো হয় অথবা আদৌ জানানো হয় কিনা সেটি স্পষ্ট করে কোথাও বলা নেই।
- ঘোষণাপত্র সত্যায়ন করা প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য একটি খুবই দুরূহ কাজ হবে।
- ভোটার যাচাইয়ের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ ম্যানুয়াল। এই ম্যানুয়াল প্রক্রিয়া স্কেলেবিলিটির সমস্যা তৈরি করবে, বিশেষ করে যখন খুব অল্প সময়ের মধ্যে অসংখ্য প্রবাসীদের কাছে থেকে অনেক বেশি সংখ্যক পোস্টাল ব্যালট জমা পড়বে। এছাড়াও এটা স্পষ্ট নয় যে কোনো প্রবাসীদের ক্ষেত্রে কোনো সত্যায়ন করার ব্যবস্থা না থাকলে একজন রিটার্নিং অফিসার কীভাবে ভোটারের আইডেন্টিটি যাচাই করবেন। তাই সত্যায়ন করা ব্যবস্থা না থাকলে ভোটারের আইডেন্টিটি যাচাই করার জন্য অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

---

[৯১]"How to vote by post", Accessed: 20-10-2024. [Online]. Available:https://www.electoralcommission.org.uk/voting-and-elections/ways-vote/how-vote-post

- এই প্রক্রিয়াতে কোনো স্বচ্ছতা এবং নিরীক্ষণযোগ্যতা (transparency and auditability) নেই। পোস্টাল ব্যালট সঠিকভাবে ব্যালট বক্সে ঢোকানো হয়েছে কিনা কিংবা গণনা করা হয়েছে কিনা তা ভোটারের পক্ষে নিশ্চিতভাবে জানার কোনো উপায় নেই। এই দুটি শর্ত পূরণ না করে পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থায় ভোটারের আস্থা অর্জন করা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে।

প্রস্তাবিত তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তাসূচক পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থা

এই সেকশনে আমরা প্রবাসীদের জন্য একটি তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তাসূচক পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থার প্রস্তাব উপস্থাপন করছি। প্রস্তাবিত সিস্টেমটি বেশ কয়েকটি সিকিউরিটি এবং প্রাইভেসির বৈশিষ্ট্য মাথায় রেখে ডিজাইন করা হয়েছে। আমরা প্রথমে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করব। পরবর্তীতে, আমরা প্রবাসীদেরকে যে পদ্ধতিতে বর্তমানে ভোটার তালিকায় এবং এনআইডি ডাটাবেজে নিবন্ধন করা হয় তা সংক্ষেপে আলোচনা করব। অবশেষে আমরা আমাদের প্রস্তাব উপস্থাপন করব।

পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ

যেহেতু পোস্টাল ভোটিংয়ে রিমোটলি ভোট প্রদান করা হয়, তাই এর নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে বেশ কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়গুলিকে আমরা পোস্টাল ভোটিংয়ের বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিন্তা করতে পারি, যেগুলো পোস্টাল ভোটিংয়ের বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য। নিচে এই বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে:

- **প্রামাণ্যতা (Authenticity):** একজন যোগ্য ভোটার ভোট দেওয়ার আগে তার আইডেন্টিটির প্রামাণ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।
- **গোপনীয়তা (Confidentiality):** একজন ভোটারের ডাকযোগে পাঠানো পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে প্রদত্ত ভোট অবশ্যই গোপন থাকতে হবে। কেবলমাত্র যখন একজন নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ (যেমন. একজন রিটার্নিং অফিসার) ব্যালট খুলবেন তখনই ভোট প্রকাশ করা যাবে।
- **অখণ্ডতা (Integrity):** একজন ভোটারের প্রদত্ত পোস্টাল ভোট অন্য কেউ পরিবর্তন করতে পারবেন না।
- **অনস্বীকার্যতা (Non-repudiation):** একজন ভোটার একবার পোস্টাল ব্যালট ডাকযোগে পাঠানোর পর তারা ভোট দেওয়া অস্বীকার করতে পারবেন না।
- **সংযোগযোগ্যতা (Linkability):** ভোটারের প্রাইভেসি রক্ষা করতে ডাকযোগে পাঠানো ব্যালটগুলো তাদের সংশ্লিষ্ট ভোটারদের সঙ্গে কোনোভাবেই সংযুক্ত (link) করা যাবে না।
- **স্বচ্ছতা ও নিরীক্ষণযোগ্যতা (Transparency & Auditability):** ভোটদান প্রক্রিয়া যথেষ্ট স্বচ্ছ হওয়া উচিত যাতে ভোটাররা তাদের গোপনীয়তা বিঘ্নিত না করে তাদের ব্যালট নির্দিষ্ট কনস্যুলেটে পৌঁছেছে কিনা এবং সঠিকভাবে নিবন্ধিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করতে পারেন।
- **এক্সেসাবিলিটি (Accessibility):** পোস্টাল ভোটিংয়ের যেকোনো পদ্ধতি এমনভাবে ডিজাইন করতে হবে যাতে এটি সকল প্রবাসী ভোটারের জন্য এক্সেসিবল হয়।
- **স্কেলেবিলিটি (Scalability):** প্রস্তাবিত সিস্টেমটি যথেষ্ট স্কেলেবল হতে হবে যাতে এটি বিশ্বব্যাপী প্রয়োগ করা যায় এবং নির্ভুলভাবে অনেক সংখ্যক পোস্টাল ব্যালট নিয়ে কাজ করতে পারে।

প্রবাসী ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ

প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থা করার একটি প্রধান বাধা হল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রবাসী নিবন্ধিত ভোটার নন এবং তারা এনআইডি সার্ভারে তালিকাভুক্ত নন। এই সমস্যা সমাধানের জন্য বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে একটি ট্রায়াল শুরু করেছে যাতে বাংলাদেশি প্রবাসীদের নির্বাচনি তালিকায় এবং এনআইডি ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এর ফলে তারা ভবিষ্যতের নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

এই উদ্যোগের অধীনে নির্বাচন কমিশন ষোলটি দেশে বাংলাদেশি প্রবাসীদের নির্বাচনি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি পেয়েছে। দেশগুলো হচ্ছে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, যুক্তরাজ্য, ইতালি, কুয়েত, কাতার, ওমান, বাহরাইন, জর্ডান, সিঙ্গাপুর, লেবানন, লিবিয়া, অস্ট্রেলিয়া, মালদ্বীপ এবং কানাডা। তবে নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত কেবল সাতটি দেশে আংশিকভাবে ট্রায়ালটি পরিচালিত হয়েছে। দেশগুলো হচ্ছে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, যুক্তরাজ্য, ইতালি, কুয়েত এবং কাতার। এই সাতটি দেশে মোট ৩৪,৭৪৮ জন প্রবাসী তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করেছেন, যার মধ্যে ১৩,১৮২ জনকে আনুষ্ঠানিকভাবে যাচাই করা হয়েছে এবং ৮,৭৯৬টি এনআইডি কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ১৮,২০৮টি আবেদনের যাচাইকরণ প্রক্রিয়া চলমান থাকায় এই আবেদনগুলো অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

এখন আমরা ভোটার তালিকায় এবং এনআইডি ডাটাবেজে প্রবাসীদের তালিকাভুক্ত করার বর্তমান নিবন্ধন প্রক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা করব।

একজন প্রবাসী একটি অনলাইন পোর্টালের (https://services.nidw.gov.bd) মাধ্যমে ফরম-২(ক) পূরণ করতে বিভিন্ন তথ্য, যেমন বিদেশে তাদের বর্তমান ঠিকানা এবং বাংলাদেশে তাদের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা এবং অনান্য ব্যক্তিগত তথ্য প্রদান করেন। নিবন্ধন প্রক্রিয়ার সময় প্রবাসীকে তাদের বর্তমান এবং স্থায়ী বাংলাদেশি ঠিকানার মধ্যে নির্বাচনি এলাকা নির্বাচন করতে বলা হয়। এছাড়াও তথ্য ক্রস-যাচাইকরণের জন্য এবং যদি অতিরিক্ত তথ্য কিংবা ডকুমেন্ট দরকার হয় তা সংগ্রহ করার জন্য প্রবাসীকে বাংলাদেশে বসবাসরত, তার পরিচিত একজন ব্যক্তির (contact person) তথ্য প্রদান করতে হয়।

নিবন্ধনের পর আবেদনকারী প্রয়োজনীয় বায়োমেট্রিক তথ্য জমা দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কনস্যুলেটে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেন। অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় উপস্থিত ব্যক্তিদের বেশ কিছু নথি উপস্থাপন করতে হয়: তাদের বৈধ মেয়াদ সম্বলিত পাসপোর্ট, একটি অনলাইনে যাচাইযোগ্য জন্ম সনদ, পূরণকৃত ফরম-২ (ক) এবং পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি। এর পরে ভোটার তার বায়োমেট্রিক তথ্য দেন। এই নথিগুলো যাচাইয়ের পরে সার্ভারে আপলোড করা হয়।

আবেদনকারীর নির্বাচিত নির্বাচনি এলাকার উপজেলা/থানা কর্মকর্তা এই নতুন যোগ করা ভোটারের তথ্য অ্যাক্সেস করতে পারেন এবং তিনি সরেজমিন তদন্ত করে আবেদনকারীর তথ্য যাচাইকরণ প্রক্রিয়া শুরু করেন। এই ক্ষেত্রে আবেদনকারীর দেওয়া পরিচিত ব্যক্তি (contact person) একজন ফোকাল পয়েন্ট (focal point) হিসেবে কাজ করেন। যাচাইকরণ সম্পন্ন হলে কর্মকর্তা যাচাইকরণের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে আবেদনটি অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করেন। যদি আবেদনকারীর আবেদন সফল হয়, তখন সংলিষ্ট কনস্যুলেটের কর্মকর্তা তা দেখতে পান এবং তিনি প্রবাসীর তথ্য সাময়িকভাবে একটি অস্থায়ী ডাটাবেজে যোগ করেন। পরবর্তীতে আবেদনকারীর বায়োমেট্রিক তথ্য বিদ্যমান সকল ভোটারদের বায়োমেট্রিক তথ্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়, যা করতে বেশ সময় লাগে। যদি আবেদনকারীর বায়োমেট্রিক তথ্যের সঙ্গে আর কারো বায়োমেট্রিক তথ্যের মিল না থাকে, তবে সেই প্রবাসীর জন্য একটি এনআইডি নম্বর স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হয় এবং প্রবাসীর তথ্যসমূহ একটি স্থায়ী এনআইডি ডাটাবেজে স্থানান্তর করা হয়। যাচাইকরণ সম্পন্ন হলে প্রবাসীকে নির্বাচনি তালিকায় যোগ করা হয়। এরপরে একটি আন্তর্জাতিক SMS এর মাধ্যমে প্রবাসীর মোবাইল টেলিফোনে তার NID নম্বর এবং NID ডাউনলোড করার জন্য একটি লিঙ্ক পাঠানো হয়। মোবাইলে প্রেরিত এই লিংকের মাধমে প্রবাসী তার NID কার্ডের পিডিএফ কপি শুধু একবার ডাউনলোড করতে পারেন এবং পরে প্রিন্ট করতে পারেন। উল্লেখ্য যে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সাধারণত সম্পন্ন হতে প্রায় তিন মাস সময় লাগে।

প্রবাসীদের NID-গুলো ১মাস পর পর স্মার্ট কার্ডে প্রিন্ট করে প্রকল্পের নির্ধারিত ভেন্ডরের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কনস্যুলেটে বিতরণের জন্য প্রেরণ করা হয়। প্রবাসীগণ নির্ধারিত সময়কালের মধ্যে যেকোনো দিন কনস্যুলেটে উপস্থিত হয়ে তাদের স্মার্ট NID কার্ড সংগ্রহ করতে পারেন।

প্রস্তাবিত পদ্ধতির কার্যপ্রণালি

এই সেকশনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য প্রস্তাবিত তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তাসূচক পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থার কার্যপ্রণালি ধাপে ধাপে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই পদ্ধতিটির তিনটি পৃথক পর্যায় (ফেইজ) রয়েছে যা প্রচলিত পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এছাড়াও আমরা ধরে নিচ্ছি যে পূর্বের সেকশনে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিটি প্রবাসী ভোটারদেরকে সাম্প্রতিক বায়োমেট্রিক এবং অন্যান্য তথ্য ও ছবিসহ সঠিকভাবে ভোটার তালিকায় হালনাগাদ করা হয়েছে। আমাদের প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে দুইটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন থাকবে: ভোটারদের জন্য একটি ভোটার অ্যাপ এবং যাচাইকারীদের (যেমন, Returning Officer, সংক্ষেপে RO-এর) জন্য একটি ভেরিফায়ার অ্যাপ (চিত্র ১)।

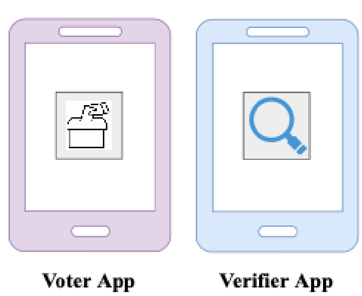

চিত্র ১: ভোটার অ্যাপ এবং ভেরিফায়ার অ্যাপ

রেজিস্ট্রেশন

নিবন্ধন (রেজিস্ট্রেশন) প্রক্রিয়ার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো প্রবাসীদেরকে একটি পৃথক পোস্টাল ভোটিং রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করা, যাতে তাদের জন্য প্রস্তাবিত পোস্টাল ভোটিং প্রক্রিয়া সহজতর হয়। নিবন্ধন প্রক্রিয়ার সময় প্রতিটি প্রবাসী তাদের ভোটার অ্যাপটি ব্যবহার করে নিম্নে বর্ণিত পদক্ষেপগুলো সম্পন্ন করবেন। এটি উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলোর মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করার এটি একটি উদাহরণ। বাস্তবে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি চূড়ান্ত করা যেতে পারে।

- একজন প্রবাসী ভোটার ভোটিং অ্যাপটি ইনস্টল করেন এবং ইনস্টলেশনের পর অ্যাপে রেজিস্ট্রেশন বাটনে ক্লিক করেন।
- ভোটার তাদের পূর্ণ নাম, জন্ম তারিখ এবং এনআইডি নম্বর প্রবেশ করান। এই তথ্যগুলো এনআইডি ডাটাবেসের সঙ্গে যাচাই করা হয় (চিত্র ২)। তারপর ভোটারের নির্বাচনি এলাকা নির্বাচনি তালিকা থেকে নির্ধারণ করা হয়।
- পরবর্তীতে ভোটার তাদের বিদেশে বসবাসকারী দেশের পোস্টাল ঠিকানা, ফোন নম্বর, ইমেইল ঠিকানা সহ একটি ইউজারনেম এবং একটি পাসওয়ার্ড প্রবেশ করান। ইমেইল এবং ফোন নম্বর OTP (ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড) পাঠিয়ে যাচাই করা হয়।
- ভোটার ভোট অ্যাপটি ব্যবহার করে এনআইডি কার্ডের সামনে ও পিছনের দিকের ছবি তোলেন এবং এনআইডি কার্ডের সামনের দিকের সঙ্গে একটি সেলফি তোলেন। এই ছবিগুলো সার্ভারে পাঠানো হয়। তারপরে ইমেজ প্রসেসিং এলগোরিদম এবং মুখ শনাক্তকরণ (face recognition) পদ্ধতি ব্যবহার করে যাচাই করা হয়।
- যাচাই সফল হলে ভোটারের জন্য পোস্টাল ভোটিং রেজিস্টারে একটি নতুন এন্ট্রি তৈরি করা হয় (চিত্র ৩), যার মাধ্যমে নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

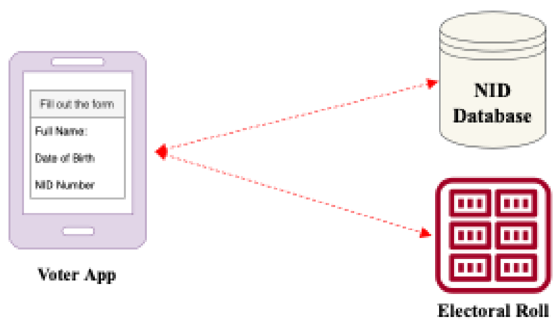

চিত্র ২: প্রবাসী ভোটারের তথ্য NID ডাটাবেসের এবং ভোটার তালিকার তথ্যের সঙ্গে ভেরিফাই করা হয়

চিত্র ৩: যাচাই সফল হলে প্রবাসী ভোটারকে পোস্টাল ভোটিং রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়

প্রস্তাবিত সিস্টেম ব্যবহার করে প্রবাসীদের ভোট দেওয়ার জন্য আমরা দুটি পদ্ধতি প্রস্তাব করেছি। প্রতিটি পদ্ধতির নিজস্ব সুবিধা-অসুবিধা রয়েছে। নিচে আমরা এই পদ্ধতিগুলোকে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করছি।

পদ্ধতি ১ এর মাধ্যমে ভোটদান

নিবন্ধনের পর নিবন্ধিত প্রবাসী ভোটার তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় ডাকযোগে একটি প্যাকেজ (চিত্র ৪) পাবেন। প্যাকেজটিতে একটি ঘোষণাপত্র, দুটি খাম (একটি ব্যালট খাম (Envelope A) এবং একটি পোস্টাল খাম (Envelope B)), একটি পোস্টাল ব্যালট পেপার এবং একটি নির্দেশনা পত্র অন্তর্ভুক্ত থাকবে। উল্লেখ্য যে ঘোষণাপত্র এবং ব্যালট পেপারে বারকোড সহ একটি নির্দিষ্ট নম্বর প্রিন্ট করা থাকবে এবং বারকোডের মধ্যে সেই নম্বরটি এনকোড করা থাকবে। বারকোড অন্তর্ভুক্ত করার যুক্তি যথাসময়ে পরে ব্যাখ্যা করা হবে। আরও উল্লেখ্য যে Envelope A এর উপরে ওই ভোটারের জন্য নির্দিষ্ট কনস্টিটিউশন প্রিন্ট করা থাকবে।

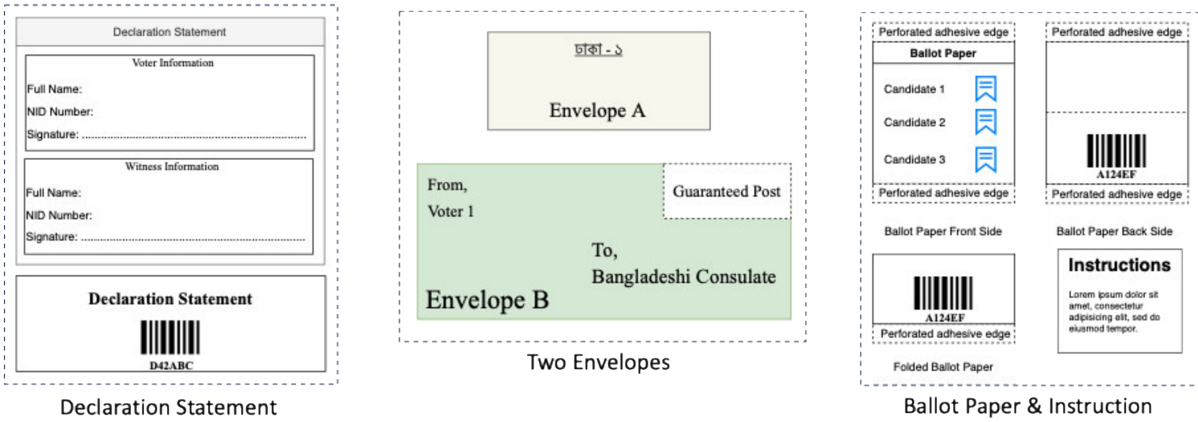

চিত্র ৪: পোস্টাল ভোট প্যাকেজ

এই পোস্টাল প্যাকেজটি পাওয়ার পর ভোটার ভোট দেওয়ার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করবেন:

- প্রথমত ভোটারকে ঘোষণাপত্রের নির্দিষ্ট অংশে প্রয়োজনীয় তথ্য (পূর্ণ নাম, এনআইডি নম্বর এবং স্বাক্ষর) পূরণ করতে হবে (চিত্র ৫)। এরপরে ভোটার একজন সাক্ষী খুঁজে বের করবেন যিনি অন্য একজন বাংলাদেশি প্রবাসী ভোটার বা নাগরিক হতে পারেন। সাক্ষীকেও ঘোষণাপত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য (পূর্ণ নাম, এনআইডি নম্বর এবং স্বাক্ষর) পূরণ করতে হবে।
- ভোটার তার ইউজারনেম, পাসওয়ার্ড এবং একটি ওয়ান-টাইম পাসওয়ার্ড (OTP) ব্যবহার করে ভোটার অ্যাপে লগ ইন করবেন। তারপর ভোটার অ্যাপ ব্যবহার করে ঘোষণাপত্রের বারকোড স্ক্যান করবেন। ভোটারকে স্বাক্ষীর এনআইডি নম্বর দিতে হবে, যা পরবর্তীতে সিস্টেমে রেকর্ড করা হবে।
- পরবর্তীতে ভোটার প্রদত্ত পোস্টাল ব্যালট পেপার ব্যবহার করে তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিবেন এবং ভোট দেওয়ার পরে ব্যালট পেপারটি ভাঁজ করবেন। ব্যালট পেপারটি এমনভাবে তৈরি করা হবে যে ব্যালট পেপারের সাইড পারফরেটেড (perforated) হবে যেখানে একটি আঠা লাগানো নিরাপত্তা লেবেল থাকবে। ব্যালট পেপারটি ভাঁজ করার পরে পারফরেটেড সাইড থেকে নিরাপত্তা লেবেল সরানো হলে এটি আঠা দিয়ে অন্য বিপরীত সাইডের সঙ্গে আটকে যাবে।

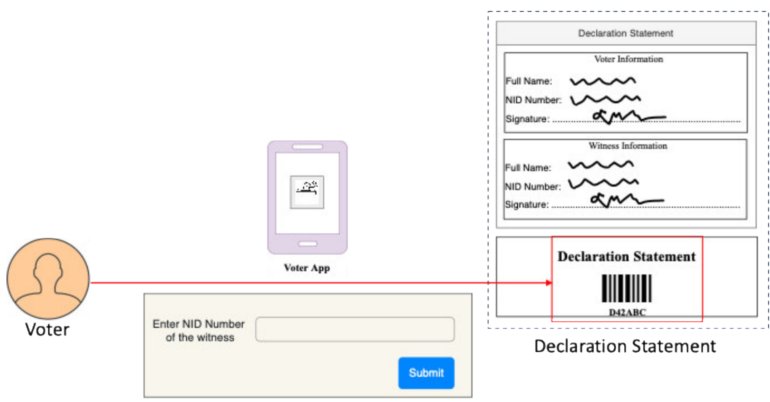

চিত্র ৫: ঘোষণাপত্র পূরণ করা

- ভোটার ব্যালট পেপারের বারকোডের নিচে অবস্থিত ব্যালট নম্বরটি সাবধানে কোথাও লিখে রাখবেন অথবা ছবি তুলে সেভ করে রাখবেন (চিত্র ৬)।
- ভোটার ভাঁজ করা ব্যালটটি Envelope A তে রাখবেন এবং পরবর্তীতে Envelope A এবং স্বাক্ষরিত ঘোষণাপত্রটি Envelope B তে ঢোকাবেন। ভোটার এরপরে Envelope B কে তার জন্য নির্ধারিত বাংলাদেশি কনস্যুলেটে পোস্ট করবেন।

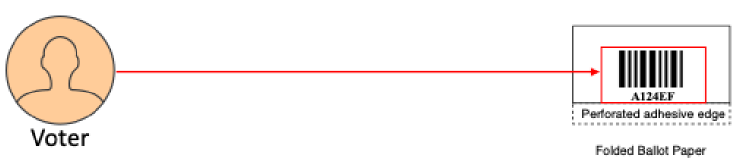

চিত্র ৬: ব্যালট পেপারের নম্বর নোট করা

পদ্ধতি ১ এর মাধ্যমে ভোট যাচাই এবং গণনা

এরপর আমরা ভোট যাচাই এবং গণনার পদক্ষেপগুলো পেশ করছি।

- কনস্যুলেটে পৌঁছানোর পরে একজন কর্মকর্তা (যাচাইকারী) Envelope B খুলে ঘোষণাপত্র এবং Envelope A বের করবেন।
- যাচাইকারী ভেরিফায়ার অ্যাপ ব্যবহার করে ঘোষণাপত্রের বারকোড স্ক্যান করবেন (চিত্র ৭)। বারকোড স্ক্যান করার সময় সিস্টেমে একটি এন্ট্রি অন্তর্ভুক্ত করা হবে যা নিশ্চিত করবে যে পোস্টাল এনভেলপটি কনস্যুলেটে পৌঁছেছে।

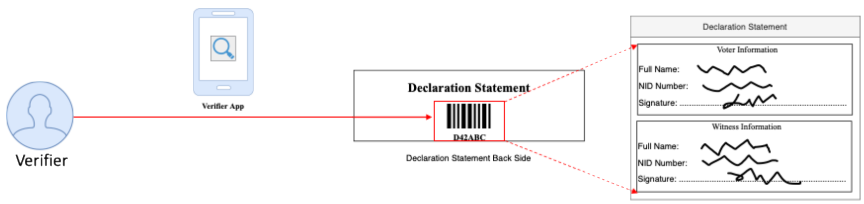

চিত্র ৭: ঘোষণাপত্রের তথ্য যাচাই করা

- এরপরে ভেরিফায়ার অ্যাপ এনআইডি সার্ভারের সঙ্গে যোগাযোগ করে ভোটার এবং সাক্ষীর এনআইডি নম্বর ব্যবহার করে ভোটার এবং সাক্ষীর স্বাক্ষর রিট্রিভ (retrieve) করে যাচাইকারীর ডিসপ্লেতে দেখাবে। যাচাইকারী ডিসপ্লেতে দেখানো স্বাক্ষরগুলো ঘোষণাপত্রের স্বাক্ষরগুলোর সঙ্গে যাচাই করবেন। সফল যাচাইকরণের পর Envelope A একটি নির্দিষ্ট বক্সের মধ্যে রাখা হবে।
- এভাবে পোস্টাল ব্যালট সংগ্রহের ডেডলাইন শেষ হওয়ার পরে ওই কনস্যুলেটে নির্দিষ্ট বক্সের মধ্যে রাখা সকল প্রবাসী ভোটারের Envelope A একটি diplomatic pouch এ করে সিকিউরলি বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশনে ফেরত পাঠানো হবে।
- এভাবে সমস্ত কনস্যুলেট থেকে diplomatic pouch এ আসা বক্সগুলো বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশনে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে খোলা হবে, সকল প্রবাসী ভোটারদের পাঠানো Envelope A বের করা হবে এবং Envelope A এর উপরে ছাপানো কনস্টিটিউশন অনুযায়ী বাছাই করা হবে। এর পরে একেক নির্বাচনি এলাকার জন্য বাছাইকৃত Envelope A-গুলোকে ওই নির্বাচনি এলাকার পোস্টাল ভোটিংয়ের জন্য নির্ধারিত ব্যালট বক্সে ঢোকানো হবে। এই ব্যালট বাক্সগুলো নির্বাচন কমিশনের ট্রেজারিতে সিকিউরলি সংরক্ষণ করা হবে।
- ভোটের দিনে নির্বাচন কমিশনে পোস্টাল ভোটের ব্যালট বক্সগুলো ট্রেজারি থেকে বের করে রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং এজেন্ট সহ অনান্য অনুমোদিত ব্যক্তিদের সামনে খোলা হবে।
- পোস্টাল ভোটের ব্যালট বক্স থেকে প্রতিটি Envelope A খোলা হয় এবং ভাঁজ করা পোস্টাল ব্যালটটি বের করা হবে।
- অনুমোদিত যাচাইকারী ভাঁজ করা ব্যালট পেপারের উপরে ছাপানো বারকোড ভেরিফায়ার অ্যাপ ব্যবহার করে স্ক্যান করবেন। এই স্ক্যান থেকে প্রাপ্ত ব্যালট নম্বর একটি ব্যালট রেজিস্ট্রিতে সংরক্ষণ করা হবে (চিত্র ৮)। উল্লেখ্য যে এই রেজিস্ট্রিতে কোনো ভোটারের তথ্য থাকবে না; সেখানে শুধু ব্যালট নম্বর রেকর্ড করা হবে। এটি করার দুইটি উদ্দেশ্য আছে: ব্যালট পেপারের প্রামাণ্যতা (authenticity) যাচাই করা এবং পোস্টাল ব্যালটটি যে ভোটের সময় খোলা হয়েছে তার রেকর্ড রাখা।

চিত্র ৮: ব্যালট রেজিস্ট্রিতে ব্যালট নম্বর অন্তর্ভুক্ত করা

- অনুমোদিত ব্যক্তি পোস্টাল ব্যালটের আঠালো দিকটি ছিঁড়ে ভোট প্রকাশ করবেন যা নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে গণনা করা হবে। এর পরে গণনাকৃত ভোট নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে প্রতিটি নির্বাচনি এলাকার রিটার্নিং অফিসারের কাছে পাঠানো হবে এবং পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভোট ওই নির্বাচনি এলাকার ভোটের সঙ্গে যোগ করা হবে।
- ভোটাররা তাদের ভোটার অ্যাপ এবং সেভ করা ব্যালট নম্বর ব্যবহার করে তাদের ব্যালট যে খোলা হয়েছে তার রেকর্ড যাচাই করতে পারবেন (চিত্র ৯)।

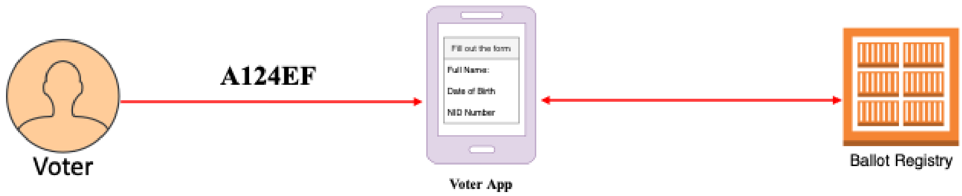

চিত্র ৯: ব্যালট রেজিস্ট্রি যাচাই করা

পদ্ধতি ২ এর মাধ্যমে ভোটদান

নিবন্ধনের পর নিবন্ধিত প্রবাসী ভোটার তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় ডাকযোগে একটি প্যাকেজ (চিত্র ১০) পাবেন। প্যাকেজটিতে তিনটি খাম থাকবে: একটি ব্যালট খাম (Envelope A), একটি কন্টেইনার খাম (Envelope B) এবং একটি পোস্টাল খাম (Envelope C)। এছাড়াও প্যাকেজটিতে একটি পোস্টাল ব্যালট পেপার এবং একটি নির্দেশনা পত্র অন্তর্ভুক্ত থাকবে। উল্লেখ্য যে ব্যালট পেপারে বারকোড সহ একটি নির্দিষ্ট নম্বর প্রিন্ট করা থাকবে এবং বারকোডের মধ্যে সেই নম্বরটি এনকোড করা থাকবে। একই সঙ্গে Envelope B-তেও একটি QR কোড ছাপানো থাকবে। বারকোড এবং QR কোড অন্তর্ভুক্ত করার যুক্তি পরে ব্যাখ্যা করা হবে। আরও উল্লেখ্য যে Envelope A এর উপরে ওই ভোটারের জন্য নির্দিষ্ট কনস্টিটিউশন প্রিন্ট করা থাকবে। নিচে এই পদ্ধতিতে ভোটদানের প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে বর্ণনা করা হলো।

- ভোটার অ্যাপে লগ ইন করার পর প্রবাসী ভোটার তার ইউজারনেম, পাসওয়ার্ড এবং একটি ওয়ান-টাইম পাসওয়ার্ড (OTP) ব্যবহার করে অ্যাপে প্রবেশ করবেন। পরবর্তীতে ভোটার অ্যাপ ব্যবহার করে ভোটার একটি ছবি বা সেলফি তুলবেন, যা এনআইডি ডাটাবেসের সঙ্গে যাচাই করা হবে (চিত্র ১১)। এক্ষেত্রে live verification এর মাধ্যমেও ভোটারকে যাচাই করা যেতে পারে।
- যাচাই সফল হলে ভোটার অ্যাপ ব্যবহার করে ভোটার Envelope B-তে থাকা QR কোড স্ক্যান করবেন (চিত্র ১২)। QR কোডের তথ্য সিস্টেমে ভোটারের বিপরীতে সংরক্ষণ করা হবে।
- পরবর্তীতে ভোটার প্রদত্ত পোস্টাল ব্যালট পেপার ব্যবহার করে তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিবেন এবং ভোট দেওয়ার পরে ব্যালট পেপারটি ভাঁজ করবেন। ব্যালট পেপারটি এমনভাবে তৈরি করা হবে যে ব্যালট পেপারের সাইড পারফরেটেড হবে যেখানে একটি আঠা লাগানো নিরাপত্তা লেবেল থাকবে। ব্যালট পেপারটি ভাঁজ করার পরে পারফরেটেড সাইড থেকে নিরাপত্তা লেবেল সরানো হলে এটি আঠা দিয়ে অন্য বিপরীত সাইডের সঙ্গে আটকে যাবে।
- ভোটার ব্যালট পেপারের বারকোডের নিচে অবস্থিত ব্যালট নম্বরটি সাবধানে কোথাও লিখে রাখবেন অথবা ছবি তুলে সেভ করে রাখবেন (চিত্র ৬)।
- ভোটার ভাঁজ করা ব্যালটটি Envelope A-এর মধ্যে রাখবেন এবং Envelope A-কে Envelope B-এর মধ্যে রাখবেন। সবশেষে Envelope B-কে Envelope C-এর মধ্যে ঢুকাবেন এবং তার জন্য নির্ধারিত বাংলাদেশি কনস্যুলেটে পোস্ট করবেন।

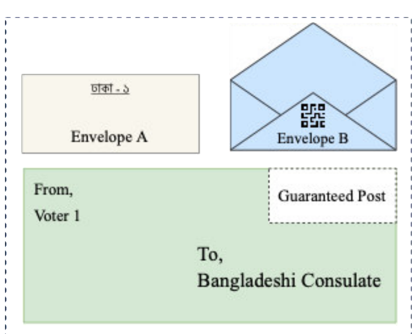

Three Envelopes

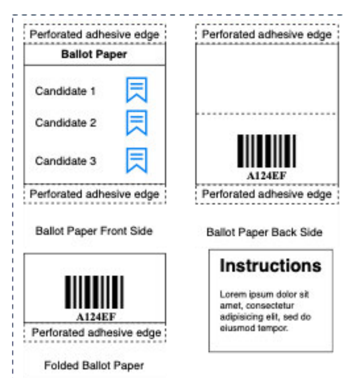

Ballot Paper & Instruction

চিত্র ১০: পদ্ধতি ২ এর জন্য পোস্টাল প্যাকেজ

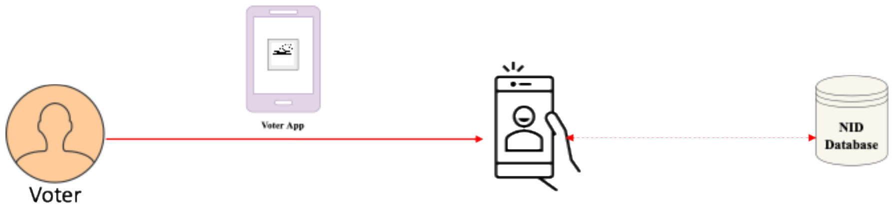

চিত্র ১১: প্রবাসী ভোটারকে যাচাই করা

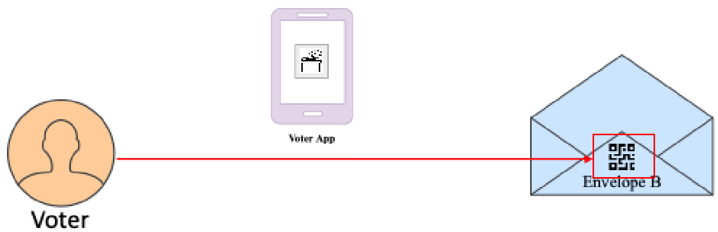

চিত্র ১২: ভোটার Envelope B-এর QR code স্ক্যান করছেন

পদ্ধতি ২ এর মাধ্যমে ভোট যাচাই এবং গণনা

এরপর আমরা পদ্ধতি ২ এর মাধ্যমে ভোট যাচাই এবং গণনার পদক্ষেপগুলো বর্ণনা করছি।

- কনস্যুলেটে পৌঁছানোর পরে একজন কর্মকর্তা (যাচাইকারী) Envelope C খুলে Envelope B বের করবেন।
- যাচাইকারী ভেরিফায়ার অ্যাপ ব্যবহার করে Envelope B-তে থাকা QR কোড স্ক্যান করবেন (চিত্র ১৩), যা ভোটারের স্ক্যানকৃত এন্ট্রির সঙ্গে যাচাই করা হবে। এটি করার দুইটি উদ্দেশ্য আছে: এটি নিশ্চিত করবে যে একজন বৈধ প্রবাসী ভোটার খামটি পাঠিয়েছেন এবং এটি ভোটারকে কনস্যুলেটে Envelope B-এর ডেলিভারি ট্র্যাক করতে সাহায্য করবে।

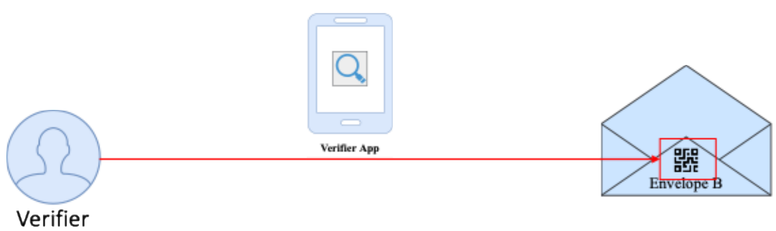

চিত্র ১৩: Envelope B এর QR code স্ক্যানিং

- সফল যাচাইকরণের পর Envelope B থেকে Envelope A বের করা হয় এবং Envelope A একটি নির্দিষ্ট বক্সের মধ্যে রাখা হবে।
- এভাবে পোস্টাল ব্যালট সংগ্রহের ডেডলাইন শেষ হওয়ার পরে ওই কনস্যুলেটে নির্দিষ্ট বক্সের মধ্যে রাখা সকল প্রবাসী ভোটারের Envelope A একটি diplomatic pouch এ করে সিকিউরলি বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হবে।
- এভাবে সমস্ত কনস্যুলেট থেকে diplomatic pouch এ আসা বক্সগুলো বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশনে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে খোলা হবে, সকল প্রবাসী ভোটারদের পাঠানো Envelope A বের করা হবে এবং Envelope A এর উপরে ছাপানো কনস্টিটিউশন অনুযায়ী বাছাই করা হবে। এর পরে একেক নির্বাচনি এলাকার জন্য বাছাইকৃত Envelope A-গুলোকে ওই নির্বাচনি এলাকার পোস্টাল ভোটিংয়ের জন্য নির্ধারিত ব্যালট বক্সে ঢোকানো হবে। এই ব্যালট বাক্সগুলো নির্বাচন কমিশনের ট্রেজারিতে সিকিউরলি সংরক্ষণ করা হবে।
- ভোটের দিনে নির্বাচন কমিশনে পোস্টাল ভোটের ব্যালট বক্সগুলো ট্রেজারি থেকে বের করে রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং এজেন্ট সহ অনান্য অনুমোদিত ব্যক্তিদের সামনে খোলা হবে।
- পোস্টাল ভোটের ব্যালট বক্স থেকে প্রতিটি Envelope A খোলা হয় এবং ভাঁজ করা পোস্টাল ব্যালটটি বের করা হবে।

- অনুমোদিত যাচাইকারী ভাঁজ করা ব্যালট পেপারের উপরে ছাপানো বারকোড ভেরিফায়ার অ্যাপ ব্যবহার করে স্ক্যান করবেন। এই স্ক্যান থেকে প্রাপ্ত ব্যালট নম্বর একটি ব্যালট রেজিস্ট্রিতে সংরক্ষণ করা হবে (চিত্র ৮)। উল্লেখ্য যে এই রেজিস্ট্রিতে কোনো ভোটারের তথ্য থাকবে না; সেখানে শুধু ব্যালট নম্বর রেকর্ড করা হবে। এটি করার দুইটি উদ্দেশ্য আছে: ব্যালট পেপারের প্রামাণ্যতা (authenticity) যাচাই করা এবং পোস্টাল ব্যালটটি যে ভোটের সময় খোলা হয়েছে তার রেকর্ড রাখা।
- অনুমোদিত ব্যক্তি পোস্টাল ব্যালটের আঠালো দিকটি ছিঁড়ে ভোট প্রকাশ করবেন, যা নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে গণনা করা হবে। এর পরে গণনাকৃত ভোট নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে প্রতিটি নির্বাচনি এলাকার রিটার্নিং অফিসারের কাছে পাঠানো হবে এবং পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভোট ওই নির্বাচনি এলাকার ভোটের সঙ্গে যোগ করা হবে।
- ভোটাররা তাদের ভোটার অ্যাপ এবং সেভ করা ব্যালট নম্বর ব্যবহার করে তাদের ব্যালট যে খোলা হয়েছে তার রেকর্ড যাচাই করতে পারবেন (চিত্র ৯)।

প্রস্তাবিত পদ্ধতির পর্যালোচনা

এখন আমরা আমাদের প্রস্তাবিত সমাধান কেমন করে পূর্বের সেকশনে উল্লেখিত কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যগুলো পূরণ করে সেটার বিশ্লেষণ করব।

বাংলাদেশের বর্তমান পোস্টাল ভোটদান ব্যবস্থায় ভোটারের প্রামাণ্যতা (authenticity) যাচাই করার জন্য একজন গেজেটেড কর্মকর্তা দ্বারা প্রত্যয়ন করানো বাধ্যতামূলক রয়েছে। এইভাবে প্রত্যয়ন করা অবশ্যম্ভাবীভাবেই প্রবাসী ভোটারদের জন্য একটি খুবই দুরূহ কাজ হতে পারে। এই সমস্যা দূর করার জন্য আমরা প্রস্তাবিত সমাধানের দুইটিতেই ভোট দেওয়ার সময় প্রতিটি ভোটারকে তার আইডেন্টিটি যাচাই করার জন্য তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক সমাধান প্রস্তাব করেছি। প্রথমত শুধু যোগ্য ভোটাররাই নিবন্ধনের সময় পোস্টাল ভোটিংয়ের জন্য নিবন্ধন করতে পারবেন, কেননা তাদের পরিচয় তাদের মুখের ছবি এবং এনআইডি কার্ডের মাধ্যমে যাচাই করা হবে। সমাধান ১ এর সময় ভোটারের authenticity তাদের স্বাক্ষর এবং ভোটার অ্যাপের ইন্টারঅ্যাকশনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়। সমাধান ২ এর সময় ভোটারের প্রামাণ্যতা পুনরায় ভোটার অ্যাপ ব্যবহার করে মুখ শনাক্তকরণের (face recognition) মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়।

উভয় পদ্ধতিতেই প্রদত্ত ভোটের গোপনীয়তা নিশ্চিত করা হয়। কারণ কনস্যুলেটে কখনোই Envelope A খুলে ভোট প্রকাশ করা হয়না। বরং প্রচলিত ভোটদান ব্যবস্থার মতো ভোটের দিনে অনুমোদিত ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনে Envelope A-গুলো খুলে ওই এলাকার সকল প্রবাসী ভোটারদের ভোট প্রকাশ করা হয়। এই পদ্ধতি ভোট এবং ভোটারের মধ্যে কোনো সম্ভাব্য সংযোগ (link) দূর করে যার ফলে ব্যক্তির গোপনীয়তা নিশ্চিত হয়।

যেহেতু পোস্টাল ব্যালট শুধু ভোটের দিনে অনুমোদিত ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে খোলা হয় তাই কোনো দুষ্ট (malicious) পক্ষ কোনোভাবেই প্রদত্ত ভোট টেম্পার করতে পারবেননা, যার ফলে ভোটের অখণ্ডতা (integrity) নিশ্চিত হয়।

উভয় সমাধানই অনস্বীকার্যতা (non-repudiation) বৈশিষ্ট্য মেনে চলে। পদ্ধতি ১ এর ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য ভোটার এবং স্বাক্ষীর স্বাক্ষর, এনআইডি নম্বর এবং ভোটার অ্যাপের মাধ্যমে অনুমোদিত ইন্টারঅ্যাকশন দ্বারা নিশ্চিত করা হয়। সমাধান ২ এর ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য ভোটার অ্যাপ ব্যবহার করে Envelope B এর QR কোড স্ক্যান করার আগে ভোটারের তোলা সেলফির মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়।

ভোটার তাদের পাঠানো পোস্টাল ব্যালটের স্ট্যাটাস ভোটার অ্যাপ ব্যবহার করে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। তারা জানতে পারবেন ব্যালটটি যাচাইয়ের পরে গৃহীত হয়েছে কিনা। এছাড়াও ভোটার ব্যক্তিগতভাবে সংরক্ষিত ব্যালট নম্বর ব্যবহার করে ব্যালট রেজিস্ট্রিতে যাচাই করতে পারেন যে তাদের পোস্টাল ব্যালট আনুষ্ঠানিক গণনাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কিনা। এই প্রক্রিয়া প্রদত্ত ভোটের স্বচ্ছতা (transparency) এবং নিরীক্ষণযোগ্যতা (auditability) বাড়ায়।

পদ্ধতি ১ এ ঘোষণাপত্রের রেকর্ড রাখার মাধ্যমে পেপার অডিট ট্রেইলের সুবিধা আছে। কিন্তু এই সমাধানে ভোটারের ভোট যাচাই করতে বেশি সময় লাগে, কেননা এখানে কনস্যুলেটে পাঠানো প্রতিটি প্রবাসী ভোটারের আইডেন্টিটি সংশ্লিষ্ট ঘোষণাপত্রে প্রদত্ত তথ্য ব্যবহার করে ম্যানুয়ালি যাচাই করতে হয়। অন্যদিকে পদ্ধতি ২ এ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভোটারের আইডেন্টিটি ভোটার অ্যাপের মাধ্যমে যাচাই করা হয়, তাই এই ক্ষেত্রে সময় অনেক কম লাগে। তবে এই পদ্ধতিতে কোনো পেপার অডিট ট্রেইলের সুবিধা নেই, সমস্ত তথ্য সিস্টেমের ডাটাবেজে সংরক্ষিত থাকে।

প্রস্তাবিত ভোটদান ব্যবস্থা সকল প্রবাসী ভোটারদের জন্য এক্সেসিবল করা সম্ভব। এর কারণ হল প্রতিটি ভোটারের ভোটদান প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে শুধু একটি স্মার্টফোন প্রয়োজন হবে। আর আমরা অনুমান করছি যে অধিকাংশ প্রবাসী ভোটারের ইতোমধ্যেই একটি স্মার্টফোন রয়েছে। প্রস্তাবিত সমাধানটি আরও এক্সেসিবল করতে একাধিক ভোটারকে তাদের পৃথক পৃথক এনআইডি নম্বর দ্বারা শনাক্তকরণের ব্যবস্থা করে একই স্মার্টফোন শেয়ার করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে এটি এমনভাবে ডিজাইন করতে হবে যেন ভোটারদের সিকিউরিটি এবং প্রাইভেসি কোনোভাবেই ক্ষুণ্ন না হয়।

পোস্টাল ভোটিং প্রক্রিয়ার একটি অন্তর্নিহিত চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এখানে human intervention এর দরকার হয়, যার ফলে যখন প্রবাসী ভোটারদের সংখ্যা অনেক বেশি হয় তখন স্কেলেবিলিটি নিশ্চিত করা দুরূহ হতে পারে। প্রস্তাবিত সমাধানেও এই চ্যালেঞ্জটি রয়েছে। তবে সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জ কার্যকরভাবে সমাধান করা যেতে পারে।

প্রস্তাবিত দুই পদ্ধতির তুলনামূলক পর্যালোচনা টেবিল ৩ এ দেওয়া হলো।

টেবিল ৩: প্রস্তাবিত দুই পদ্ধতির তুলনামূলক পর্যালোচনা

বৈশিষ্ট্যসমূহ	প্রস্তাবিত ১ম পদ্ধতি	প্রস্তাবিত ২য় পদ্ধতি
প্রামাণ্যতা (Authenticity)	নিবন্ধনের সময় ভোটারের এনআইডি কার্ডের ছবি এবং মুখ শনাক্তকরণের (face recognition-এর) মাধ্যমে এবং ঘোষণাপত্রে ভোটারের স্বাক্ষর যাচাইয়ের মাধ্যমে ভোটারের authenticity নিশ্চিত করা হয়।	নিবন্ধনের সময় ভোটারের এনআইডি কার্ডের ছবি এবং মুখ শনাক্তকরণের (face recognition-এর) মাধ্যমে এবং ভোটদানের পূর্বে পুনরায় ভোটার অ্যাপ ব্যবহার করে মুখ শনাক্তকরণের মাধ্যমে ভোটারের authenticity নিশ্চিত করা হয়।
গোপনীয়তা (Confidentiality) ও সংযোগযোগ্যতা (Linkability)	উভয় পদ্ধতিতেই ভোটের দিনে নির্বাচন কমিশনে অনুমোদিত ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে সব Envelope A খুলে সকল প্রবাসী ভোটারদের প্রদত্ত ভোট প্রকাশ করা হয়। যার মাধ্যমে ভোটের গোপনীয়তা নিশ্চিত হয়। একই সঙ্গে ভোটারের পাঠানো ব্যালট খাম এবং পোস্টাল খাম সম্পূর্ণ আলাদা হবার কারণে ভোটার এবং তার ভোটের মধ্যে সম্ভাব্য সংযোগযোগ্যতা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।	
অখণ্ডতা (Integrity)	উভয় পদ্ধতিতেই যেহেতু পোস্টাল ব্যালট শুধু ভোটের দিনে অনুমোদিত ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে খোলা হয় তাই যে কেউ কোনোভাবেই প্রদত্ত ভোট টেম্পার করতে পারবেনা, ফলে ভোটের অখণ্ডতা নিশ্চিত হয়।	
অনস্বীকার্যতা (Non-repudiation)	ভোটার এবং স্বাক্ষীর স্বাক্ষর, এনআইডি নম্বর এবং ভোটার অ্যাপের মাধ্যমে অনুমোদিত ইন্টারঅ্যাকশন দ্বারা এই বৈশিষ্ট্য নিশ্চিত করা হয়।	ভোটার অ্যাপ ব্যবহার করে Envelope B এর QR কোড স্ক্যান করার আগে ভোটারের তোলা সেলফির মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়।
স্বচ্ছতা ও নিরীক্ষণযোগ্যতা (Transparency & Auditability)	উভয় পদ্ধতিতেই ভোটার অ্যাপ ব্যবহার করে একজন ভোটার পোস্টাল খাম এবং তার ব্যালটের স্ট্যাটাস ট্র্যাক করতে পারবেন, যার মাধ্যমে প্রদত্ত ভোটের স্বচ্ছতা এবং নিরীক্ষণযোগ্যতা নিশ্চিত হয়।	
এক্সেসাবিলিটি (Accessibility)	উভয় পদ্ধতিই সকল প্রবাসী ভোটারদের জন্য এক্সেসিবল করা সম্ভব।	
স্কেলেবিলিটি (Scalability)	এই পদ্ধতিতে ঘোষণাপত্রে ভোটারদের প্রদত্ত তথ্য ম্যানয়ালি যাচাই করতে হয়। তাই ভোটারের সংখ্যা যখন অনেক বেশি হবে তখন এই পদ্ধতি স্ক্যালেবল করা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে।	এই পদ্ধতিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভোটারের আইডেন্টিটি ভোটার অ্যাপের মাধ্যমে যাচাই করা হয়, তাই এই ক্ষেত্রে সময় অনেক কম লাগে। এবং যার কারণে যাচাই প্রক্রিয়াটি স্ক্যালেবল করা সম্ভব।
অডিট ট্রেইল (Audit trail)	এই পদ্ধতিতে ঘোষণাপত্রের রেকর্ড রাখার মাধ্যমে পেপার অডিট ট্রেইলের সুবিধা আছে।	এই পদ্ধতিতে ডাটাবেজে তথ্য সংরক্ষণ করে ডিজিটাল অডিট ট্রেইলের ব্যবস্থা করা সম্ভব।

দুই পদ্ধতিই মোটামুটিভাবে সব বৈশিষ্ট্যই পূরণ করে। তবে প্রবাসীরা যে ভোট দিয়েছেন - এর পেপার অডিট ট্রেইলের যদি দরকার হয় তাহলে পদ্ধতি ১ গ্রহণ করা যেতে পারে। আর পেপার অডিট ট্রেইলের থেকে স্ক্যালেবিলিটি নিশ্চিত করা যদি বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীয়মান হয় তবে পদ্ধতি ২ গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রস্তাবিত সমাধানের সফল প্রয়োগ নিশ্চিত করতে আমাদের কিছু বিষয় বিবেচনা করতে হবে। নিচে এগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করে হয়েছে:

- পোস্টাল ব্যালটের সংশ্লিষ্ট কনস্যুলেটে পৌঁছানোর জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করতে হবে। প্রবাসী ভোটারদের ভালোমত জানাতে হবে যে এই সময়সীমা মেনে চলতে ব্যর্থ হলে ভোট বাতিল হয়ে যাবে।
- প্রতিটি কনস্যুলেটে ডাকযোগে ব্যালট পাঠানোর সঙ্গে সম্পর্কিত ডাক মাশুল সম্পর্কে চিন্তা করা প্রয়োজন। আমাদের প্রস্তাবে আমরা অনুমান করছি এটির জন্য প্রয়োজনীয় ফি প্রবাসী ভোটাররা নিজেই বহন করবেন। ভোটাররা নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে পোস্টাল ব্যালটের খাম যেন কনস্যুলেটে পৌঁছায় তা নিশ্চিত করতে একটি নিবন্ধিত এবং গ্যারান্টিযুক্ত ডাক সেবা ব্যবহার করতে পারেন। তবে বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষ যদি চান তবে প্রতিটি প্রবাসী ভোটারের ডাক মাশুল বহন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন।

আইনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন

প্রবাসীদের জন্য প্রস্তাবিত পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করার জন্য *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ* ১৯৭২, *ভোটার তালিকা আইন* ২০০৯ এবং *ভোটার তালিকা বিধিমালা* ২০১২ এ সংশোধনী করার প্রয়োজন হবে। তবে এই পরিবর্তনগুলো করার আগে প্রস্তাবিত দুইটি পদ্ধতির মধ্যে যে কোনো একটিকে গ্রহণ করতে হবে এবং গৃহীত পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে উল্লেখিত গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, আইন এবং বিধিমালার পরিবর্তন করতে হবে।

সুপারিশসমূহ

প্রস্তাবিত সিস্টেম বাস্তবায়নের জন্য আমরা নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো উপস্থাপন করছি:

- সকল প্রবাসী বাংলাদেশিদের যতদ্রুত সম্ভব ভোটার তালিকায় এবং এনআইডি সার্ভারে নিবন্ধনের ব্যবস্থা করা। নিবন্ধনের সময় তাঁদের বায়োমেট্রিক তথ্য এবং সাম্প্রতিক ছবি যেন হালনাগাদ করা থাকে এটা নিশ্চিত করা দরকার। বর্তমানে প্রচলিত প্রবাসীদের নিবন্ধন প্রক্রিয়াতে যেহেতু অনেক সময় লাগে, এটি আরও অপটিমাইজ করে পুরো প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য কার্যকর কৌশল বের করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু সকল প্রবাসীর পাসপোর্ট রয়েছে, তাই পাসপোর্ট ডাটাবেজে সংরক্ষিত তথ্য ব্যবহার করে নিবন্ধন প্রক্রিয়া দ্রুততর সময়ের মধ্যে করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

- বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত সকল প্রবাসীদের ভোটার তালিকায় এবং এনআইডি সার্ভারে নিবন্ধন করতে বেশ সময় লেগে যেতে পারে। এমতাবস্থায় ডিসেম্বর ২০২৫ এ আগামী জাতীয় নির্বাচন হবার সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে অক্টোবর ২০২৫ এর মধ্যে যেসকল প্রবাসীদের ভোটার তালিকায় এবং এনআইডি সার্ভারে নিবন্ধন করা সম্ভব হবে, তাদেরকে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনে প্রস্তাবিত পোস্টাল ভোটিং পদ্ধতিতে ভোট দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া যেতে পারে।

- প্রবাসীদের জন্য একটি তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তাসূচক পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রবাসীদের পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থায় জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। আমরা নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে এই লক্ষ্যে দুইটি সমাধান প্রস্তাব করেছি। প্রবাসীদের ভোটদানের সুযোগ দেওয়ার জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ হবে দুইটি সমাধানের মধ্যে থেকে একটিকে বেছে নিয়ে তা বাস্তবায়ন করা।

- প্রস্তাবিত পদ্ধতির বাস্তবায়নকল্পে দুইটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন – ভোটার অ্যাপ এবং ভেরিফায়ার অ্যাপ – যথাযথ ফাংশনালিটিসহ ডেভেলপ করা। এক্সেসবিলিটি বাড়ানোর জন্য এই অ্যাপ্লিকেশনগুলো অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস উভয় প্ল্যাটফর্মের জন্য ডেভেলপ করা উচিত। এছাড়াও প্রস্তাবিত পদ্ধতির জন্য একটি ব্যাকএন্ড সিস্টেম ডেভেলপ করা প্রয়োজন যেটি একটি সিকিউর ডাটাবেসের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনগুলো এই ব্যাকএন্ড সিস্টেমের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে, যা পরবর্তীতে এনআইডি সার্ভার, জাতীয় নির্বাচনি তালিকা এবং প্রবাসী ভোটারদের জন্য নির্দিষ্ট নির্বাচনি তালিকার সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে।

- বিভিন্ন তথ্যের নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা নিশ্চিত করার জন্য তথ্যগুলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে ট্রান্সমিট করার সময় HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) এর মতো সিকিউর প্রোটোকল অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। তথ্য যখন ডাটাবেজে রাখা হবে তখন অবশ্যই ডেটা এনক্রিপ্ট করে রাখতে হবে। এছাড়াও অনস্বীকার্যতা নিশ্চিত করার জন্য ডিজিটাল সিগনেচার ব্যবহার করতে হবে। সিকিউরিটি নিশ্চিত করার জন্য ক্রিপ্টোগ্রাফিক কী ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সমস্ত ক্রিপ্টোগ্রাফিক কী এর ব্যবস্থাপনার জন্য সর্বশেষ ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। তদুপরি ডাটাবেসের জন্য সবচেয়ে উপযোগী এবং সিকিউর অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম ব্যবহার করতে হবে। একই সঙ্গে প্রতিটি ডেটা অ্যাক্সেস নিরাপদে লগ (log) করার জন্য একটি অপরিবর্তনীয় (immutable) অডিট ট্রেইলের ব্যবস্থা করতে হবে।

- যেহেতু প্রস্তাবিত সিস্টেমটি একটি নতুন কনসেপ্ট, জাতীয় নির্বাচনে এটিকে ব্যবহারের আগে এটির ব্যাপক পরীক্ষা/নিরীক্ষার প্রয়োজন। আমরা কমপক্ষে তিন-পর্যায়ের ট্রায়ালের পক্ষে সুপারিশ করছি। প্রাথমিক পর্যায়ে সিস্টেমটি একটি দেশে ট্রায়াল করা উচিত যাতে প্রায় ৫০ থেকে ১০০জন প্রবাসী ভোটার অংশগ্রহণ করবেন। পরবর্তীতে এটি পাঁচ থেকে দশটি দেশে পরীক্ষা করা যেতে পারে যেখানে ১,০০০ থেকে ৫,০০০ প্রবাসী ভোটার অংশগ্রহণ করবেন। অবশেষে সিস্টেমটি যত বেশি সম্ভব দেশে ব্যাপকভাবে ট্রায়ালের ব্যবস্থা করা উচিত, যেখানে ২০০০০ বা তার বেশি প্রবাসী ভোটার অংশগ্রহণ করবেন। এই তিন-পর্যায়ের ট্রায়াল প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে যেকোনো অস্বাভাবিকতা শনাক্ত এবং সংশোধন করতে সহায়তা করবে, যা জাতীয় নির্বাচনে প্রস্তাবিত সিস্টেমটি ব্যবহারের পথকে সুগম করবে।

- পরবর্তীতে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এক বা একাধিক সিকিউরিটি অডিট ফার্ম দ্বারা সিস্টেমটির ক্রমাগত নিরাপত্তা অডিট (security audit) করা প্রয়োজন। ডেভেলপকৃত সিস্টেমের উপরে আস্থা স্থাপনের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে।

- এই নতুন সিস্টেম যাতে ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে সেইজন্য এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার জন্যে প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা চিন্তা করা উচিত।

- আমাদের সেই সব ভোটারদেরও বিবেচনা করতে হবে যারা এমন দেশে বসবাস করেন যেখানে বাংলাদেশের কোনো কনস্যুলেট নেই। এই ক্ষেত্রে, সেইসব দেশের নিকটতম বাংলাদেশি কনস্যুলেটকে সেইসব প্রবাসীদের জন্য পোস্টাল ব্যালট বিতরণ এবং সংগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে মনোনীত করা উচিত। এই দেশগুলোর জন্য কোন কনস্যুলেট কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করবে তা নির্ধারণের জন্য একটি পলিসি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

- প্রবাসী ভোটারদের কাছে বিতরণের জন্য পোস্টাল প্যাকেজ প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া বিস্তারিতভাবে পূর্বে বর্ণনা করা হয়নি। কনস্যুলেট কর্মকর্তাদের লজিস্টিক সংক্রান্ত কাজ, সময় এবং খরচ কমানোর জন্য একটি পদ্ধতি হতে পারে পোস্টাল প্যাকেজ বাংলাদেশে প্রস্তুত করে প্রতিটি কনস্যুলেটে বিতরণ করা। নির্বাচন কমিশন (ইসি) প্রস্তাবিত সিস্টেম ব্যবহার করে নিবন্ধিত ভোটারদের তাদের সংলিষ্ট কনস্যুলেটের সঙ্গে অ্যাটাচ করে প্রতিটি কনস্যুলেটের জন্য সংশ্লিষ্ট ভোটারদের তালিকা তৈরি করতে পারে। তারপর পোস্টাল প্যাকেজ তদনুসারে প্রস্তুত করা যেতে পারে, যেখানে প্রতিটি প্রবাসী ভোটারের বর্তমান ঠিকানা পোস্টাল প্যাকেজের উপরে এবং কনস্যুলেটের ঠিকানা পোস্টাল খামে সংযুক্ত করা থাকবে। কনস্যুলেটের কর্মকর্তাগণ তাদের কাছে পাঠানো পোস্টাল প্যাকেজ সংশ্লিষ্ট দেশের পোস্টাল সার্ভিস ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট প্রবাসী ভোটারদের কাছে বিতরণ করবেন।

- পোস্টাল ভোটিং প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত সমস্ত কার্যক্রম (নিবন্ধন থেকে শুরু করে নির্বাচন কমিশনের ট্রেজারিতে পোস্টাল ব্যালট বক্স সিকিউরলি সংরক্ষণ করা পর্যন্ত) সম্পন্ন করার জন্য পর্যাপ্ত সময় দরকার। জাতীয় নির্বাচন যেদিন অনুষ্ঠিত হবে তার আগেই এই সমস্ত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে পোস্টাল ভোটিংয়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়কাল নির্ধারণ করা জরুরি। এই সময়কাল নির্ধারণ করার জন্য বেশ কিছু বিষয় বিবেচনা করতে হবে: নির্বাচন কমিশনের লোকবল ও সক্ষমতা, বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশের কনস্যুলেটের লোকবল ও সক্ষমতা, প্রস্তাবিত দুইটি সমাধান থেকে কোন সমাধানটি গ্রহণ করা হয়েছে, এই প্রক্রিয়ার ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত সংশ্লিষ্ট সবাই কত ভালো ও নির্ভুলভাবে সিস্টেমটাকে ব্যবহার করতে পারছেন এবং ডেভেলপকৃত সিস্টেম কতটুকু স্কেলেবল এবং কত ভালোভাবে পারফর্ম করতে পারছে। এইসব কিছু এবং ট্রায়ালের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে পোস্টাল ভোটিংয়ের জন্য একটি কার্যকর সময়কাল নির্ধারণ করতে হবে।

- যদিও সম্পূর্ণ প্রস্তাবনাটি প্রবাসী ভোটারদের মাথায় রেখে ডিজাইন করা হয়েছে তবে প্রস্তাবিত সিস্টেমের কার্যপ্রণালীতে অল্প কিছু পরিবর্তন করে এটি দেশের অভ্যন্তরে অনুপস্থিত ভোটারদের জন্যও সহজেই ব্যবহার করা যেতে পারে। নির্বাচন কমিশন (ইসি) একটি অ্যাডভান্সড সিস্টেম ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট নির্বাচনি এলাকার অনুপস্থিত ভোটারদের তালিকা তৈরি করতে পারবে। এই ভোটাররা একই ভোটার অ্যাপ ব্যবহার করে একটি পৃথক অভ্যন্তরঢু পোস্টাল ভোটার তালিকায়নিবন্ধন করতে পারবেন। তারপরে নির্দিষ্ট সময়ে এইরূপে নিবন্ধিত অনুপস্থিত ভোটারদের বর্তমান ঠিকানায় পোস্টাল প্যাকেজ প্রেরণ করা হবে এবং পূর্বে আলোচিত পদ্ধতিতে নিবন্ধনকৃত ভোটাররা তাদের পরিচয় যাচাই করতে এবং ভোটদান করতে পারবেন। রিটার্নিং অফিসার বা তাদের মনোনীত কর্মকর্তারা ভেরিফায়ার হিসেবে কাজ করতে পারেন। আমাদের ডাক বিভাগের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে যেহেতু সন্দেহ আছে, তাই একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হবে এইসকল ভোটারদের কাছে নির্ভরযোগ্যভাবে পোস্টাল প্যাকেজ পাঠানো এবং পরবর্তীতে রিটার্নিং অফিসারের কাছে পোস্টাল ব্যালট পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য পোস্টাল প্যাকেজ ট্র্যাক করা যায় এরকম কোনো কুরিয়ার সার্ভিস ব্যবহার করা যেতে পারে।

১১. অনলাইন (ইন্টারনেট) ভোটিং

তথ্য-প্রযুক্তি এবং ইন্টারনেটের বহুল ব্যবহারের কারণে এবং একইসঙ্গে সিকিউরিটি এবং প্রাইভেসি প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী অনলাইন বা ইন্টারনেট ভোটিংয়ের ব্যাপারে আগ্রহ দিন দিন বেড়েই চলছে। বিশ্বের বেশ কিছু দেশ এরই মধ্যে তাদের জাতীয় নির্বাচনে অনলাইন ভোটিংয়ের ব্যবস্থা করেছে। আরও অনেক দেশ এই ব্যাপরে গভীরভাবে পর্যালোচনা করছে। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমাদেরকেও অনলাইন ভোটিংয়ের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই অধ্যায়ে আমরা অনলাইন ভোটিংয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে এবং একই সঙ্গে বিশ্বের বেশ কিছু দেশের অনলাইন ভোটিং ব্যবস্থা পর্যালোচনা করেছি। অধিকন্তু আমরা একটি আধুনিক এবং নিরাপদ (secured) অনলাইন ভোটিং সিস্টেমের জন্য যে সকল সিকিউরিটি এবং প্রাইভেসি প্রযুক্তির প্রয়োজন সেগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। এই প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করে কিভাবে একটি আধুনিক, নিরাপদ এবং ভবিষ্যৎমুখী অনলাইন ভোটিং সিস্টেম প্রণয়ন (develop) করা সম্ভব তা নিয়ে আলোকপাত করেছি। সবশেষে এরকম একটি অনলাইন ভোটিং সিস্টেম design এবং develop করার জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশসমূহ পেশ করেছি।

অনলাইন ভোটিং ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা, চ্যালেঞ্জসমূহ এবং সিকিউরিটি ও প্রাইভেসি বৈশিষ্ট্যসমূহ

এই সেকশনে আমরা অনলাইন (ইন্টারনেট) ভোটিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাগুলো, এর সঙ্গে সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলো এবং একটি অনলাইন ভোটিং সিস্টেমের প্রধান সিকিউরিটি ও প্রাইভেসির বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি।

সুবিধাসমূহ

অনলাইন ভোটিংয়ের বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে। বিশেষ করে অনলাইন ভোটিং সম্পূর্ণ ভোটিং প্রক্রিয়াকে আরও সহজলভ্য এবং এফিশিয়েন্ট করে করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনলাইন ভোটিংয়ের কিছু প্রধান সুবিধাসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো:

- বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিতে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে শারীরিকভাবে যারা (যেমন, বিদেশে বসবাসরত প্রবাসী নাগরিক, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং দূরবর্তী এলাকার মানুষ) ভোট দিতে পারেন না, সেইসব ব্যক্তিদের জন্য সহজেই ভোটদানের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে অনলাইন ভোটিং ভোটের অভিগম্যতা (accessibility) বাড়াতে পারে। অনলাইন ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটকেন্দ্রে শারীরিকভাবে উপস্থিত থেকে সরাসরি ভোট না দিয়ে, বরং যে যেখানে আছেন সেখান থেকেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভোট দিতে পারেন। এই পদ্ধতি আধুনিক জীবনের সঙ্গে মানানসই এবং অত্যন্ত সুবিধাজনক, ফলশ্রুতিতে বেশি সংখ্যক মানুষ ভোটদানে উৎসাহিত হয়।
- অনলাইন ভোটিংয়ের ফলে আরও দ্রুততর এবং দক্ষতার সঙ্গে ভোট গণনা এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফলাফল ঘোষণা করা সম্ভব হয় - যা বর্তমানে প্রচলিত ভোটিং পদ্ধতির প্রশাসনিক বোঝা (burden) কমিয়ে খরচ সাশ্রয় করতে পারে। তবে সামগ্রিক খরচের প্রভাব সিস্টেম ডিজাইন এবং বাস্তবায়নের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে।
- অনলাইন ভোটিংয়ে ইলেক্ট্রনিক সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট গণনা করা হয়, যা মনুষ্য-সৃষ্ট ভুলের সম্ভাবনা এবং ঝুঁকি কমিয়ে ফলাফলের নির্ভুলতা বাড়াতে সাহায্য করে।
- অনলাইন ভোটিংয়ের পক্ষের সমর্থকরা এই বলে যুক্তি দেন যে অনলাইন ভোটিং ডিজিটাল প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত তরুণ জনসংখ্যাকে ব্যাপকভাবে আকর্ষণ করবে। এর ফলে ভোটের সময় ভোটার উপস্থিতি বাড়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এছাড়াও অনলাইন ভোটিং প্রক্রিয়া প্রথমবার যারা ভোট দিবেন তাদের এবং তরুণ ভোটারদের মধ্যে খুবই আকর্ষণীয় হতে পারে।
- অনলাইন ভোটিংয়ে ব্যবহৃত সিস্টেম, বিশেষ করে যেগুলোতে ওপেন-সোর্স সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয় সে সিস্টেমগুলো, নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা এবং আস্থা বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে। ওপেন-সোর্স কোড স্বাধীনভাবে পর্যালোচনা করা যায় যা কোডের সক্ষমতার প্রতি আস্থা বাড়াতে পারে। তবে এটি মনে রাখতে হবে যে অনলাইন ভোটিংয়ে ভোট জালিয়াতি, ভোটারের গোপনীয়তা লঙ্ঘন এবং তৃতীয় কোনো পক্ষের প্রভাবের আশঙ্কা নিয়ে বেশ উদ্বেগ রয়েছে। শক্তিশালী সিকিউরিটি ব্যবস্থা এবং প্রাইভেসি সহায়ক/বর্ধক প্রযুক্তির মাধ্যমে এই উদ্বেগগুলো মোকাবেলা করা সম্ভব। একইসঙ্গে সিস্টেমের প্রতি জনসাধারণের আস্থা গড়ে তোলা অনলাইন ভোটিংয়ের সফল বাস্তবায়নের জন্য অপরিহার্য।
- অনলাইন ভোটিং ব্যবস্থা গ্রহণ করে ভোটে অংশগ্রহণকারী কর্মীদের সময় বাঁচানো এবং ব্যালট পেপার ছাপানো ও বিতরণের সঙ্গে সম্পর্কিত খরচ কমানোর মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি খরচ সাশ্রয় করা যেতে পারে।
- ইন্টারনেট ভোটিংয়ের অনেক ব্যবস্থায় ভোটারদের একাধিকবার ভোটদানের সুযোগ দেওয়া হয়, কিন্তু শুধু শেষ ভোটটি গণনা করা হয়। অনেকে মনে করেন যে এ ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোট বিক্রি এবং পারিবারিকভাবে ভোটদানের (family voting) সম্ভাবনা কমানো যেতে পারে। এই ধরনের সুযোগ পোস্টাল ভোটিং কিংবা অন্যান্য ভোটিং ব্যবস্থাতে অনুপস্থিত।
- অনেক সময় পোস্টাল ভোটিংয়ে পোস্টাল সিস্টেমের সমস্যার কারণে পোস্টাল ব্যালট নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে ভোটের সময়সীমার পরে পৌঁছায়, যা তখন আর গণনায় অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। অনলাইন ভোটিংয়ে যেহেতু তাৎক্ষণিকভাবে ভোট পৌঁছাতে পারে, সেখানে এইধরনের কোনো সমস্যা হয় না।

চ্যালেঞ্জসমূহ

যদিও অনলাইন ভোটিংয়ের অনেক সুবিধা রয়েছে, তবে অনলাইন ভোটিংয়ের মাধ্যমে নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় সততা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়। নিচে এই চ্যালেঞ্জগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে:

- **ডিজিটাল সিস্টেমের সিকিউরিটি নিশ্চিত করা:** অনলাইন ভোটিং এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ভোটিং সিস্টেমকে সাইবার হুমকি থেকে রক্ষা করা। এই ধরনের সিস্টেমে বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে ডেটা ব্রিচ (data breach) হতে পারে এবং ভোটারের তথ্য অননুমোদিতভাবে প্রকাশ হয়ে যেতে পারে। একইভাবে সাইবার অ্যাটাকের মাধ্যমে ব্যালটের গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হতে পারে, কোনো হ্যাকিং বা ম্যালওয়্যারের মাধ্যমে সিস্টেমে ভোট গণনার সময় ভোট কারচুপির (manipulation) চেষ্টা করা হতে পারে এবং Denial-of-Service (DoS) অ্যাটাকের মাধ্যমে সিস্টেমকে এমনভাবে আক্রান্ত করা হতে পারে যাতে ভোটের সময় কেউ ভোট দিতে না পারে।

- **ভোটার চিহ্নিতকরণ (identification) এবং পরিচয় যাচাই করা:** অনলাইন ভোটিংয়ের সময় যেহেতু ভোটাররা দূর থেকে (remotely) সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত হন, তাই ভোটারদেরকে সঠিকভাবে চিহ্নিত (identify) করা এবং ভোটদানের সময় তাদের পরিচয় সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেন শুধু যোগ্য ব্যক্তিরাই ভোট দিতে পারেন। তবে ভোটারের পরিচয় নিশ্চিতকরণের সময় ভোটারের প্রাইভেসির কথাও খেয়াল রাখতে হবে। ভোটিং সিস্টেমে যদি কোনো দুর্বলতা থাকে তাহলে এরকম হতে পারে যে অননুমোদিত কোনো ব্যক্তি সিস্টেমে অন্য কারো জায়গায় এক্সেস পেয়ে অন্যের হয়ে ভোট দিয়ে দিতে পারছে। এমনকি এইভাবে সিস্টেমের এডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোলও আট্যাকাররা পেয়ে যেতে পারে। ফিশিং এবং সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমেও অ্যাটাকাররা কোনো অনলাইন সিস্টেমকে অ্যাটাক করতে পারে যার মাধ্যমে ভোটারের পরিচয় সংক্রান্ত তথ্য বেহাত হয়ে যেতে পারে।

- **স্বচ্ছতা এবং নিরীক্ষাযোগ্যতা:** অনলাইন ভোটিং সিস্টেমের জটিল প্রকৃতি তাদের কার্যপ্রণালিকে অস্পষ্ট করে তুলতে পারে, যার ফলে এগুলো কীভাবে কাজ করছে তা জনসাধারণতো বটেই এমনকি বিশেষজ্ঞদের জন্যও বোঝা কঠিন হয়ে যায়। সিস্টেমে যদি কোনো স্বচ্ছতা না থাকে, তবে সিস্টেমের সিকিউরিটি যাচাই করা খুবই কঠিন হয়ে যায়, যা সিস্টেমের মাধ্যমে তৈরিকৃত নির্বাচনের ফলাফলের যাচাইযোগ্যতা এবং নিরীক্ষণযোগ্যতা (verifiability and auditability) সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সংশয় তৈরি করতে পারে।

- **ইউনিভার্সাল স্ট্যান্ডার্ডের অভাব:** অনলাইন ভোটিং সিস্টেমের জন্য বিশ্বব্যাপী সর্বজনগৃহীত কোনো মানদণ্ড (standard) নেই। এর ফলে একেক দেশ একেক রকমভাবে অনলাইন ভোটিং সিস্টেম তৈরি করেছে। বিশ্বব্যাপী সর্বজনগৃহীত কোনো স্ট্যান্ডার্ড, সিকিউরিটি প্রোটোকল এবং নিরাপত্তার রিক্যোয়ারমেন্ট ছাড়া অনলাইন সিস্টেমের মধ্যে নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্যতার সামঞ্জস্য করা খুবই দুরূহ হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, সুইজারল্যান্ডে অনলাইন ভোটিংয়ের জন্য বিকেন্দ্রীকৃত পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় যেখানে প্রতিটি ক্যান্টন নিজের ভোটিং সিস্টেম বেছে নিতে পারে। এই বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থা সিস্টেম ডিজাইনের ক্ষেত্রে নমনীয়তা (flexibility) প্রদান করলেও সারা দেশে একই রকম নিরাপত্তা মান বজায় রাখা চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায়।

- **জনগণের আস্থা গড়ে তোলা:** অনলাইন ভোটিংয়ের সাফল্যের জন্য জনসাধারণের আস্থা গড়ে তোলা এবং তা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনলাইন ভোটিংয়ের নির্ভরযোগ্যতা এবং নিরাপত্তা নিয়ে অনেকের মধ্যে সন্দেহ রয়েছে, যা ভোটের সময় সম্ভাব্য জালিয়াতি, ভোটের গোপনীয়তার লঙ্ঘন এবং ফিজিক্যালি ভোটদান প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতি সম্পর্কিত যে উদ্বেগ রয়েছে তাকে উসকে দেয়। তাই অনলাইন ভোটিংয়ের উপরে জনসাধারণের আস্থা গড়ে তোলার জন্য একটি শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্বলিত অনলাইন ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করা, স্বচ্ছ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা এবং জনসচেতনতামূলক প্রচারাভিযানের মাধ্যমে জনসাধারণের উদ্বেগ মোকাবেলা করা অপরিহার্য।

- **ডিজিটাল বিভাজন দূর করা:** সকল যোগ্য ভোটারের জন্য অনলাইন ভোটিংয়ে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। ভোটারদের মধ্যে যারা অনলাইন ভোটিং প্রযুক্তি এক্সেস করতে পারেন এবং যারা পারেন না, তাদের মধ্যকার এই 'ডিজিটাল ডিভাইড' যাতে কারো অংশগ্রহণে বাধা সৃষ্টি না করতে পারে তা নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে বয়স্ক ভোটার এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা অনলাইন ভোটিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করতে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। যার ফলে এরকম শ্রেণির ভোটারদের সুবিধার জন্য একটি বিকল্প ভোটদান পদ্ধতির ব্যবস্থা করা অতীব জরুরি।

এগুলো ছাড়াও আরও কিছু সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ রয়েছে যা উল্লেখ করা প্রয়োজন: সফটওয়্যার ভেন্ডর অথবা প্রযুক্তির ওপর অত্যধিক নির্ভরতার কারণে নির্বাচন প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ হ্রাস পাওয়া, পুনঃগণনার সম্ভাবনা না থাকা, অনলাইন ভোটিং সিস্টেম ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ জন্য বর্ধিত খরচ এবং অভ্যন্তরীণ কিংবা বাহ্যিক অ্যাটাকারের মাধ্যমে সিস্টেমে মানিপুলেশনের আশঙ্কা।

অনলাইন ভোটিং সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করা প্রয়োজন। শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থা, স্বচ্ছ প্রক্রিয়া, কঠোর পরীক্ষা ও নিরীক্ষণ এবং জনসাধারণের আস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে কেবল অনলাইনে পরিচালিত যেকোনো ভোটের ইন্টেগ্রিটি, নিরাপত্তা এবং অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা সম্ভব।

সিকিউরিটি এবং প্রাইভেসি বৈশিষ্ট্যসমূহ

যেকোনো অনলাইন ভোটিং সিস্টেমের সিকিউরিটি এবং প্রাইভেসি নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সেকশনে আমরা যেকোনো অনলাইন ভোটিংয়ের প্রধান সিকিউরিটি এবং প্রাইভেসির বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরছি।

সিকিউরিটি বৈশিষ্ট্যসমূহ

ভোটিংয়ের ক্ষেত্রে সিকিউরিটির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো:

- **গোপনীয়তা (Confidentiality):** অনলাইন ভোটিংয়ের ক্ষেত্রে গোপনীয়তার বৈশিষ্ট্যের অর্থ হচ্ছে ভোটের গোপনীয়তা এবং ভোটারের ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। অনলাইন ভোটিংয়ের ক্ষেত্রে প্রদত্ত ভোট ইন্টারনেটের মাধ্যমে নিরাপদভাবে প্রেরণের এবং ভোট ভোটিং সিস্টেমে সিকিউরলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। গোপনীয়তার সঙ্গে সম্পর্কিত আরেকটি ধারণা হল ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, যা পরে আলোচনা করা হয়েছে।

- **অখণ্ডতা (Integrity):** এই বৈশিষ্ট্য নিশ্চিত করে যে সিস্টেমের নিরাপত্তা বিঘ্নিত না করে অননুমোদিত কেউ (চূড়ান্ত) প্রদত্ত ভোটকে বদল করতে পারবে না।

- **প্রাপ্যতা (Availability):** ভোটিং সিস্টেমটি সম্পূর্ণ ভোটদান প্রক্রিয়ার সময়কাল জুড়ে কার্যকর থাকা উচিত যাতে ভোটাররা নিরবচ্ছিন্নভাবে ভোটদান করতে পারে। ভোটদানকালীন সময় সাইবার আক্রমণ এবং অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিও যাতে সিস্টেমে এমন কোনো সমস্যা তৈরি করতে না পারে যার ফলে ভোটাররা ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে ভোট দিতে পারছেন না।

- **বিশ্বাসযোগ্যতা/প্রামাণ্যতা (Authenticity):** প্রত্যেক ভোটারের পরিচয়ের বিশ্বাসযোগ্যতা/প্রামাণ্যতা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যাতে কেবল যোগ্য ভোটাররাই তাদের নির্ধারিত নিজ নির্বাচনি এলাকায় (constituency) ভোট দেওয়ার অনুমতি পায়।

- **জবাবদিহিতা (Accountability):** অনলাইন ভোটিংয়ের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার অর্থ হচ্ছে ভোটিং প্রক্রিয়ায় জড়িত সমস্ত ব্যক্তি কিংবা সংস্থাকে তাদের কাজের জন্য দায়বদ্ধ করা। নির্বাচন যে ন্যায্য এবং সঠিকভাবে পরিচালিত হয়েছে এটা নিশ্চিত করার জন্য এরকম দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা খুবই জরুরি। ভোটিং সিস্টেমের প্রতি জনসাধারণের আস্থা গড়ে তোলা এবং আস্থা বজায় রাখার জন্য এই ধরনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

- **অনস্বীকার্যতা (Non-repudiation):** এই বৈশিষ্ট্যটির অর্থ হলো ভোটিং সিস্টেমের মধ্যে কেউ কোনো কাজ করলে সেটা যেন অস্বীকার করতে না পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে একজন ভোটার একবার ভোট দিলে, পরবর্তীতে তা অস্বীকার করতে পারবেন না।

প্রাইভেসি বৈশিষ্ট্যসমূহ

একটি অনলাইন ভোটিং সিস্টেমকে নিম্নলিখিত গোপনীয়তার (প্রাইভেসির) বৈশিষ্ট্যগুলো পূরণ করা উচিত।

- **পরিচয়ের গোপনীয়তা (Privacy regarding the voter identity):** একটি মৌলিক কিন্তু চ্যালেঞ্জিং প্রাইভেসির বৈশিষ্ট্য হল ভোটদান প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে একজন ভোটারের পরিচয় নিখুঁতভাবে এবং সঠিকভাবে নিশ্চিত করা। তবে ভোটদানের সময় তাদের বেনামিত্ব (anonymity) নিশ্চিত করাও জরুরি। এই দুটি রিক্যোয়ারমেন্ট পরস্পরের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, যার কারণে এদেরকে স্যাটিসফাই করা একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ।

- **পরিচয় এবং ভোটের সংযোগহীনতা (Unlinkability of the voter identity and the vote cast):** অনলাইন ভোটিংয়ের আরেকটি প্রাইভেসির রিক্যোয়ারমেন্ট হচ্ছে ভোটারকে তাদের প্রদত্ত ভোট থেকে পুরোপুরিভাবে পৃথক করা। এই পৃথকীকরণ নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তির পরিচয় এবং তাদের ভোটের মধ্যে যাতে কোনোভাবেই কোনো সংযোগ যেন (link) স্থাপন না করা যায়।

অনলাইন ভোটিং ব্যবস্থার সহায়ক প্রযুক্তিসমূহের পর্যালোচনা

উপরে উল্লেখিত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করার জন্য এবং অনলাইন ভোটিংয়ের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার বৈশিষ্ট্যগুলো পূরণ করার জন্য একটি অনলাইন ভোটিং সিস্টেমকে অবশ্যই কিছু ক্রিপ্টোগ্রাফিক পদ্ধতি, বিভিন্ন গোপনীয়তা সহায়ক/বর্ধক প্রযুক্তি এবং ব্লকচেইনের সমন্বয়ের দরকার হতে পারে। এই জন্য এই সেকশনে আমরা এই প্রযুক্তিগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে পর্যালোচনা করেছি।

ক্রিপ্টোগ্রাফি (Cryptography)

ক্রিপ্টোগ্রাফি একটি বৈজ্ঞানিক ডিসিপ্লিন যা তথ্য সিকিউরলি আদানপ্রদান এবং সংরক্ষণের জন্য এমন কিছু পদ্ধতির ব্যবস্থা করে যার মাধ্যমে তথ্যের গোপনীয়তা (confidentiality), অখণ্ডতা (integrity), বিশ্বাসযোগ্যতা/প্রামাণ্যতা (authenticity) এবং অনস্বীকার্যতা (non-repudiation) নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। ক্রিপ্টোগ্রাফিক পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্যকে এনক্রিপ্ট করে সাইফারটেক্সটে (ciphertext-এ) এমনভাবে রূপান্তর করা হয় যার মাধ্যমে তথ্য আর বোধগম্য (understandable) থাকেনা। যার কাছে সংশ্লিষ্ট ডিক্রিপশন কী থাকবে সেই শুধু সাইফারটেক্সটকে ডিক্রিপ্ট করে আবার মূল বোধগম্য তথ্যে রূপান্তর করতে পারবে। ক্রিপ্টোগ্রাফি বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় যার মাধ্যমে অনলাইনে ফিনান্সিয়াল লেনদেন নিরাপদ করা যায়, সংবেদনশীল তথ্য সুরক্ষিত করা যায় এবং নিরাপদ যোগাযোগ সহজতর করা যায়। যেমন, হোয়াটসঅ্যাপের মতো ম্যাসেজিং প্ল্যাটফর্মে এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন নিশ্চিত করার জন্য ক্রিপ্টোগ্রাফিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও ক্রিপ্টোগ্রাফিক পদ্ধতি, যেমন ডিজিটাল স্বাক্ষর (signature) ব্যবহার করে তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করা যায়। বিভিন্ন ক্রিপ্টোগ্রাফিক পদ্ধতিগুলো ব্লকচেইন প্রযুক্তির একটি মৌলিক উপাদান হিসেবে কাজ করে, যার মাধ্যমে ফিনান্সিয়াল লেনদেনের (ট্রানজ্যাকশনের) অখণ্ডতা (integrity) এবং ব্যবহারকারীর অ্যানোনিমিটি (anonymity) নিশ্চিত করা যায়। তদুপরি, ক্রিপ্টোগ্রাফি নিরাপদ ওয়েব ব্রাউজিং (Hypertext Transfer Protocol Secure বা HTTPS এর মাধ্যমে), নিরাপদ ফাইল সংরক্ষণ এবং ডিজিটাল সিস্টেমে পরিচয় যাচাইকরণের প্রধান প্রযুক্তি হিসেবে কাজ করে। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে ক্রিপ্টোগ্রাফিক প্রযুক্তি বর্তমান সময়ে সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার এক অপরিহার্য অনুষঙ্গ। নিচে বিভিন্ন ক্রিপটোগ্রাফিক পদ্ধতি এবং তাদের অ্যাপ্লিকেশন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

সিমেট্রিক এনক্রিপশন

সিমেট্রিক এনক্রিপশন, যা সিমেট্রিক কী এনক্রিপশন নামেও পরিচিত, একটি ক্রিপ্টোগ্রাফিক অ্যালগরিদম যা এনক্রিপশন এবং ডিক্রিপশন উভয় কাজের জন্য একটি সিঙ্গেল কী ব্যবহার করে। এর মানে কোনো তথ্য একজন প্রেরক থেকে কোনো প্রাপকের কাছে পাঠানোর সময় প্রেরক যে কী ব্যবহার করে তথ্য এনক্রিপ্ট করবেন প্রাপককে সেই একই কী ব্যবহার করেই ডিক্রিপ্ট করতে হবে (চিত্র ১)। সিমেট্রিক এনক্রিপশন খুবই ফাস্ট এবং এফিশিয়েন্ট হওয়ার কারণে এটি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। তবে এটির প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে প্রেরক এবং প্রাপকের মধ্যে সিকিউরলি সিমেট্রিক কী বিতরণের ব্যবস্থা করা। Advanced Encryption Standard (AES) সিমেট্রিক এনক্রিপশনের গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে বহুল ভাবে ব্যবহৃত হয়।

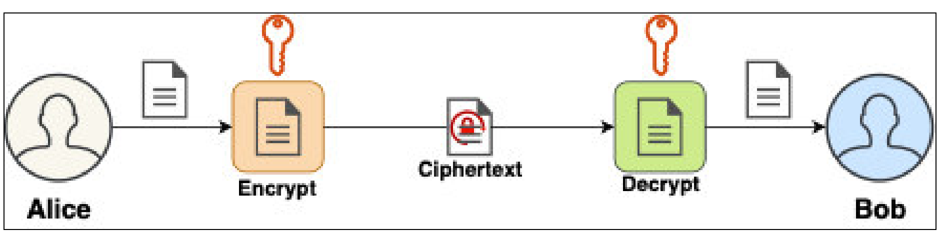

চিত্র ১: সিমেট্রিক কী এনক্রিপশন

এসিমেট্রিক এনক্রিপশন/পাবলিক কী ক্রিপ্টোগ্রাফি

যদিও সিমেট্রিক এনক্রিপশন নিরাপদ, ফাস্ট এবং এফিশিয়েন্ট, এর একটি অন্তর্নিহিত সমস্যা রয়েছে: এটির সিকিউরিটি একজন প্রেরক এবং প্রাপকের মধ্যে একটি সিকিউর কী বিনিময় অ্যালগরিদমের ওপর নির্ভর করে। এই সমস্যা দূর করার জন্য এটির বিকল্প হিসেবে অ্যাসিমেট্রিক এনক্রিপশন (asymmetric encryption) বা পাবলিক কী ক্রিপ্টোগ্রাফি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এসিমেট্রিক এনক্রিপশনে দুটি পৃথক কী ব্যবহৃত হয়: একটি পাবলিক কী এবং একটি প্রাইভেট কী। পাবলিক কী সবার জন্য উন্মুক্ত করা যেতে পারে, তবে প্রাইভেট কী অবশ্যই গোপন রাখতে হয়। তথ্য এনক্রিপ্ট করার জন্য প্রেরক প্রাপকের পাবলিক কী ব্যবহার করে একটি সাইফারটেক্সট (ciphertext) তৈরি করেন, যা প্রাপকের কাছে প্রেরণ করা হয়। প্রাপক তার সংশ্লিষ্ট প্রাইভেট কী ব্যবহার করে প্রাপ্ত সাইফারটেক্সট ডিক্রিপ্ট করেন (চিত্র ২)। RSA, Elgamal এবং Elliptic Curve Cryptography (ECC) কিছু ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত পাবলিক কী সিস্টেমের উদাহরণ। তবে যেকোনো সিমেট্রিক কী সিস্টেমের অ্যালগরিদমের তুলনায় এই পাবলিক কী সিস্টেমগুলো অনেক স্লো (slow)।

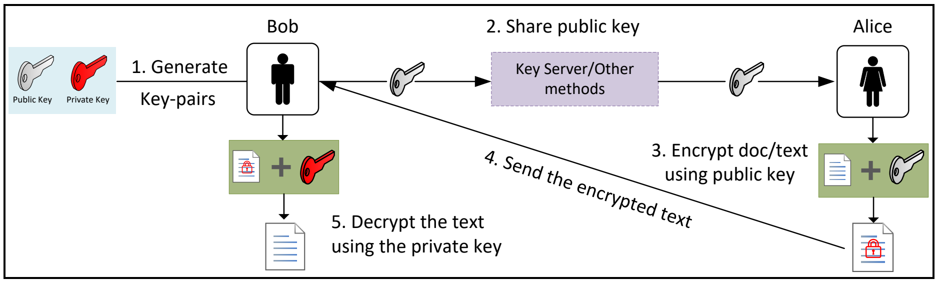

চিত্র ২: অ্যাসিমেট্রিক এনক্রিপশন

সিমেট্রিক এবং অ্যাসিমেট্রিক উভয়ই সিস্টেম তথ্যের গোপনীয়তা (confidentiality) নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত হয়।

ক্রিপ্টোগ্রাফিক হ্যাশ ফাংশন

ক্রিপ্টোগ্রাফিক হ্যাশ ফাংশন একটি গাণিতিক ফাংশন যা যেকোনো দৈর্ঘ্যের ইনপুট গ্রহণ করে এবং একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের র‍্যান্ডম স্ট্রিং জেনারেট করে, যা ওই ইনপুটের হ্যাশ বা মেসেজ ডাইজেস্ট হিসেবে পরিচিত। এই প্রক্রিয়াটি অপরিবর্তনীয়, এর মানে হচ্ছে কোনো হ্যাশ থেকে তার মূল ইনপুট বের করা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। ক্রিপ্টোগ্রাফিক হ্যাশ ফাংশন সিকিউরিটির একটি মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এর মাধ্যমে তথ্যের অখন্ডতা (integrity) নিশ্চিত করা যায়, ফলে কোনো তথ্য কোনোভাবে পরিবর্তিত হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। SHA-2 (Secure Hashing Algorithm 2) এবং SHA-3 (Secure Hashing Algorithm 3) দুটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হ্যাশিং অ্যালগরিদম। যদিও SHA-2 এখনও নিরাপদ বলে বিবেচিত এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, তবে SHA-3 আরও আধুনিক এবং সিকিউর হ্যাশ ফাংশন। তাই ভবিষ্যতের সিকিউরিটির কথা চিন্তা করে অনেকেই SHA-3 ব্যবহারের পক্ষে মত দেন।

ডিজিটাল স্বাক্ষর

ডিজিটাল স্বাক্ষর (signature) একটি ক্রিপ্টোগ্রাফিক পদ্ধতি যার মাধ্যমে ডিজিটাল তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা (authenticity) এবং অনস্বীকার্যতা (non-repudiation) নিশ্চিত করা যায়। ডিজিটাল স্বাক্ষরকে ডিজিটাল ডকুমেন্ট কিংবা কোনো তথ্যে পেপার ডকুমেন্টে হাতে লেখা স্বাক্ষরের অনুরূপ হিসেবে চিন্তা করা যেতে পারে। কোনো ডিজিটাল ডকুমেন্টে ডিজিটালি স্বাক্ষর করার জন্য একজন প্রেরক তার প্রাইভেট কী ব্যবহার করেন। পরবর্তীতে ডকুমেন্ট এবং ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রাপকের কাছে পাঠানো হয়। প্রাপক প্রেরকের সংশ্লিষ্ট পাবলিক কী ব্যবহার করে স্বাক্ষর যাচাই করতে পারেন (চিত্র ৩)। যেহেতু প্রাইভেট কী প্রেরক ব্যতীত অন্য কারো কাছেই থাকার কথা নয়, তাই এটি ধরে নেওয়া যেতে পারে যে কেবল প্রেরকই ডিজিটাল ডকুমেন্টে ডিজিটাল স্বাক্ষর করেছেন, যা ওই ডকুমেন্টের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং অনস্বীকার্যতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। অনেক সময় স্বাক্ষর করার জন্য ডিজিটাল ডকুমেন্টকে একটি হ্যাশিং অ্যালগরিদমের মাধ্যমে হ্যাশ করা হয়, যেই হ্যাশ ডকুমেন্টের একটি সংক্ষিপ্ত রূপকে প্রতিনিধিত্ব করে। তারপরে সেই হ্যাশ ব্যবহার করে যদি ডিজিটালি স্বাক্ষর করা হয় তাহলে এই একক অপারেশনের মাধ্যমে আমরা ডকুমেন্টের বিশ্বাসযোগ্যতা, অনস্বীকার্যতা এবং অখণ্ডতা (integrity) নিশ্চিত করতে পারি।

ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বর্ধক/সহায়ক প্রযুক্তি (Privacy Enhancing Technologies, PETs)

গোপনীয়তা বর্ধক/সহায়ক প্রযুক্তি অনেক টুলস এবং পদ্ধতির একটি সমষ্টি যা ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করার পাশাপাশি তথ্যের ব্যবহার এবং বিশ্লেষণকে সহজতর করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এই প্রযুক্তিগুলোর মাধ্যমে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ কার্যকরভাবে কমিয়ে এবং তথ্যে প্রবেশাধিকার সীমিত করে, ব্যক্তিগত তথ্যের দায়িত্বশীল ব্যবহার নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়। PET-এর উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিগুলোর মধ্যে রয়েছে এনক্রিপশন, অ্যানোনিমাইজেশন, জিরো-নলেজ প্রুফ (ZKP), সিকিউর মাল্টি-পার্টি কম্পিউটেশন এবং সিক্রেট শেয়ারিং। নিচে আমরা এই প্রযুক্তিগুলো সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করছি।

এনক্রিপশন

এনক্রিপশন একটি গোপনীয়তা সহায়ক প্রযুক্তি হিসেবে কাজ করে যা যেকোনো তথ্যকে একটি গোপন কোডে (সাইফারটেক্সটে) রূপান্তরিত করে। এই কোডিত তথ্য শুধু সংশ্লিষ্ট ডিক্রিপশন কী যার কাছে থাকে তারাই ডিসাইফার (ডিক্রিপ্ট) করতে পারেন। এর ফলে সংবেদনশীল বা ব্যক্তিগত তথ্য অননুমোদিত ভাবে অন্য কেউ এক্সেস করতে পারে না। তথ্য ট্রান্সমিশন এবং সংরক্ষণের সময় উভয় ক্ষেত্রেই তথ্য সুরক্ষিত রাখার জন্য তথ্য এনক্রিপ্ট করলে সাইবার হুমকির মুখেও তথ্যের গোপনীয়তা বজায় থাকে এবং যোগাযোগের গোপনীয়তা রক্ষা করা যায়। এনক্রিপশন অন্যান্য ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সুরক্ষার প্রযুক্তির মূল প্রযুক্তি হিসেবে কাজ করে এবং বর্তমানের তথ্য-চালিত বিশ্বে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

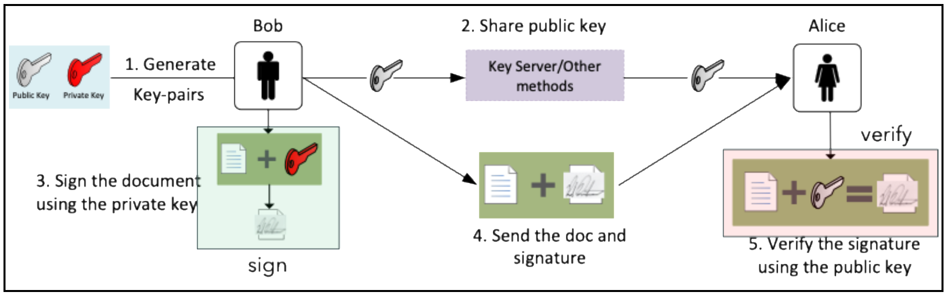

চিত্র ৩: ডিজিটাল স্বাক্ষর

তথ্য অ্যানোনিমাইজেশন

তথ্য অ্যানোনিমাইজেশন একটি গোপনীয়তা-বর্ধক প্রযুক্তি যা কোনো ডেটাসেট থেকে ব্যক্তিগতভাবে শনাক্তযোগ্য তথ্য (Personally Identifiable Information, PII) এমনভাবে অপসারণ বা পরিবর্তন করে, যার ফলে অবশিষ্ট তথ্যকে নির্দিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে সহজে লিঙ্ক করা আর যায় না। এর ফলে পুনঃশনাক্তকরণের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়। ফলশ্রুতিতে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা মেনে তথ্য সিকিউরলি শেয়ার করা সম্ভব হয় এবং কোলাবরেশন সহজ হয়। তথ্য এ্যানোনিমাইজেশনের কারণে তথ্যের গোপনীয়তার প্রতি এক প্রকার অঙ্গীকার প্রদর্শন করা হয়, যা তথ্যের আদান প্রদানের ব্যাপারে আস্থা বাড়াতে সাহায্য করে এবং তথ্যের ব্যবহারে নৈতিকতাকে (ethics in data usage) উৎসাহিত করে।

জিরো নলেজ প্রুফ (Zero Knowledge Proof, ZKP)

জিরো-নলেজ প্রুফ হলো একটি অ্যাডভান্সড ক্রিপ্টোগ্রাফিক পদ্ধতি যার মাধ্যমে একটি পক্ষ (প্রমাণকারী) অন্য পক্ষের কাছে (যাচাইকারী) কোনো নির্দিষ্ট তথ্য প্রকাশ না করেই প্রমাণ করতে পারে যে সেই তথ্য তার কাছে আছে। যেহেতু প্রমাণকারীকে কোনো তথ্য প্রকাশ করতে হয় না, তাই সংবেদনশীল তথ্যের গোপনীয়তা বজায় থাকে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যবহারকারী তাদের সঠিক জন্ম তারিখ প্রকাশ না করেই তাদের বয়সের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারে ZKP ব্যবহার করে। একইভাবে পাসওয়ার্ড এবং অন্যান্য সংবেদনশীল তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রেখে ZKP ব্যবহার করে যে কেউ তার পরিচয় যাচাই (identity authenticate) করতে পারে।

সিকিউর মাল্টি-পার্টি কম্পিউটেশন

মাল্টি-পার্টি কম্পিউটেশন (Multi-party computation, MPC) একটি অ্যাডভান্সড ক্রিপ্টোগ্রাফিক পদ্ধতি যা ব্যবহার করে একাধিক পক্ষ তাদের ব্যক্তিগত তথ্য একে ওপরের কাছে প্রকাশ না করেই যৌথভাবে একটি ফলাফল গণনা করতে সক্ষম হয়, যার ফলে ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা বজায় থাকে। MPC একটি গোপনীয়তা সুরক্ষার প্রযুক্তি যার মাধ্যমে অনেক পক্ষ তাদের সংবেদনশীল তথ্য কোলাবরেটিভলি প্রসেস করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে এমন ভোটিং সিস্টেম ডিজাইন করা সম্ভব যেখানে ব্যক্তিগত ভোট প্রকাশ না করেই ভোট গণনা করা যেতে পারে। একইভাবে অনেক সংস্থা তাদের প্রোপ্রাইটেরি তথ্য প্রকাশ না করেই যৌথভাবে তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে। যেহেতু MPC ব্যবহার করলে কম্পিউটেশনের প্রতিটা স্টেজে তথ্য গোপন থাকে তাই সেনসিটিভ তথ্যের কমপিউটেশন কিংবা বিশ্লেষণের জন্য MPC খুবই কার্যকর একটি পদ্ধতি।

সিক্রেট শেয়ারিং

সিক্রেট শেয়ারিং একটি অ্যাডভান্সড ক্রিপ্টোগ্রাফিক পদ্ধতি যার মাধ্যমে কোনো সেনসিটিভ তথ্যকে একাধিক শেয়ারে ভাগ করে প্রতিটি শেয়ারকে ভিন্ন পক্ষের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে কেবল নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ার একত্রিত করা হলেই মূল সেনসিটিভ তথ্যটি পুনর্গঠন করা যায়। এর মাধ্যমে সেনসিটিভ তথ্যের নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্যতার মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হয়। সিক্রেট শেয়ারিং পদ্ধতি ব্যবহার করে এনক্রিপশন কী, আর্থিক তথ্য এবং সিস্টেমের এক্সেস কোড সুরক্ষিত করা যায়। এছাড়াও এটি সিকিউরি মাল্টি-পার্টি কম্পিউটেশনে ব্যবহার করা হয়। হাইলি সিকিউর সিস্টেম কিংবা অপারেশনের এক্সেস কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে যেখানে অনেকের কাছে থেকে অনুমোদনের প্রয়োজন হয় সেখানেও সিক্রেট শেয়ারিং পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়।

ব্লকচেইন (Blockchain)

২০০৯ সালে প্রবর্তিত বিটকয়েন বিশ্বে প্রথম ব্যাপকভাবে গৃহীত ডিজিটাল মুদ্রা হয়ে উঠেছে, যা বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিটকয়েনের ভিত্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি যুগান্তকারী প্রযুক্তির উপরে যা ডিস্ট্রিবিউটেড লেজার টেকনোলজি (Distributed Ledger Technology, DLT) বা ব্লকচেইন প্রযুক্তি হিসেবে পরিচিত। যদিও 'ব্লকচেইন' এবং 'DLT' শব্দগুলো প্রায়শই একই অর্থে

ব্যবহৃত হয়, তাদের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। একটি ব্লকচেইন হল একটি নির্দিষ্ট ধরনের লেজার যেখানে একটি পূর্বনির্ধারিত পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। আরও অনেক প্রকার লেজার রয়েছে যারা ভিন্ন ভিন্ন ফরম্যাটে তথ্য সংরক্ষণ করে। যখন একটি লেজারকে একটি ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্কে বিতরণ করা হয়, তখন এটিকে একটি ডিস্ট্রিবিউটেড লেজার বলা যেতে পারে। এর মানে হচ্ছে সকল ব্লকচেইনকেই ডিস্ট্রিবিউটেড লেজার বলা যেতে পারে, কিন্তু সকল ডিস্ট্রিবিউটেড লেজার ব্লকচেইন নয়। তবে এই রিপোর্টে আমার এই দুইটি শব্দ সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করব।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ব্লকচেইন প্রযুক্তি তার ইউনিক বৈশিষ্ট্যের কারণে অনেক ইন্ডাস্ট্রি, সরকার এবং একাডেমিয়ার গবেষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। এটিকে ইন্টারনেটের মতো একটি ফাউন্ডেশনাল প্রযুক্তি হিসাবে চিন্তা করা হচ্ছে যার মাধ্যমে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন ডোমেইনে এক প্রকার বিপ্লব সূচনা করা সক্ষম হবে বলে মনে করা হচ্ছে। ব্লকচেইনের মুলে রয়েছে একটি ডিস্ট্রিবিউটেড লেজার যেখানে একটি নিয়ম অনুসরণ করে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত একটার পরে একটা ব্লক যুক্ত করা হয়। লেজারটি একটি পিয়ার-টু-পিয়ার (Peer-to-Peer, P2P) নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অনেক কম্পিটারের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং সেই কম্পিটারগুলোতে লেজারটি সংরক্ষণ করা হয়। প্রতিটি ব্লকের মধ্যে থাকে অনেক ট্রানজ্যাকশন এবং প্রতিটি ব্লক একটি কনসেনসাস অ্যালগরিদমের (consensus algorithm) মাধ্যমে ডিসেন্ট্রালাইজড পদ্ধতিতে একটি পূর্বনির্ধারিত বিরতিতে তৈরি করা হয়। এই পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণের কারণে ব্লকচেইনের অনেক ইউনিক বৈশিষ্ট্য নিশ্চিত করে, যা নিচে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

বিটকয়েন ব্লকচেইন থেকে বিবর্তিত হয়ে এক নতুন ধরনের ব্লকচেইন সিস্টেম উদ্ভূত হয়েছে যা সংশ্লিষ্ট লেজারের ওপর একটি কম্পিউটার প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সেখানে অনেক প্রকার কম্পিউটার প্রোগ্রাম, যাদেরকে স্মার্ট কন্ট্রাক্ট বলা হয়, ইনস্টল করার সুযোগ দেয়। এই স্মার্ট কন্ট্রাক্টগুলো ব্যবহার করে ডিসেন্ট্রালাইজড অ্যাপ্লিকেশন (DApp) তৈরি করা সম্ভব হয়। এর মাধ্যমে কোনো একক সিস্টেমের উপরে নির্ভর না করেই অটোমেটিকভাবে স্মার্ট কন্ট্রাক্টগুলো কাজ করতে পারে। যেহেতু এই ধরনের কম্পিউটার প্ল্যাটফর্ম একটি ব্লকচেইন লেজারের অংশ হিসেবে থাকে, তাই এই ধরনের কম্পিউটার প্ল্যাটফর্মে যে স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ইনস্টল করা হয় তা অপরিবর্তনীয় (immutable) হয়ে থাকে, যা বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন ডোমেইনের জন্য ডিজাইরেবল বৈশিষ্ট্য।

ব্লকচেইনের তথ্য কে এক্সেস করতে পারে তার ওপরে ভিত্তি করে মূলত দুই ধরনের ব্লকচেইন রয়েছেঃ পাবলিক এবং প্রাইভেট ব্লকচেইন। নিচে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

- **পাবলিক ব্লকচেইনঃ** কোনো পাবলিক ব্লকচেইনে, যা unpermissioned/permissionless ব্লকচেইন নামেও পরিচিত, যে কেউ ব্লক তৈরি ও যাচাই করতে পরে, ব্লকচেইনে সংরক্ষিত তথ্য দেখতে পরে এবং ট্রানজ্যাকশনের মাধ্যমে ব্লকচেইনে তথ্য সংরক্ষণ করে লেজারের অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে। যেহেতু এই ধরনের ব্লকচেইনের তথ্য সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে, তাই তথ্যের প্রাইভেসি বলে কিছু থাকে না। তাই যেই সকল অ্যাপ্লিকেশনে তথ্যের প্রাইভেসি দরকার সেইখানে এই ধরনের ব্লকচেইন সাধারণত ব্যবহার করা হয় না।

- **প্রাইভেট ব্লকচেইনঃ** একটি প্রাইভেট ব্লকচেইনে, যা permissioned ব্লকচেইন নামেও পরিচিত, কে ট্রানজ্যাকশনের মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষণ করতে পারবে কিংবা ব্লকচেইনের তথ্য দেখতে পারবে তা রেস্ট্রিক্ট করে দেওয়া সম্ভব। এই ধরনের ব্লকচেইন শুধু অনুমোদিত এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠান তথ্য রাখতে এবং দেখতে পারে। যেহেতু সবাই এই ধরনের ব্লকচেইন সংরক্ষিত তথ্য দেখতে পারেনা, তাই যেই সকল অ্যাপ্লিকেশনে তথ্যের প্রাইভেসি দরকার, সেগুলোতে এই ধরনের প্রাইভেট ব্লকচেইন ব্যবহার করা যায়।

এই দুই ধরনের ব্লকচেইন সংমিশ্রণ করে আরও বিভিন্ন প্রকারের ব্লকচেইন তৈরি করা সম্ভব, যেমন হাইব্রিড ব্লকচেইন এবং কনসোর্টিয়াম ব্লকচেইন।

ব্লকচেইনের বেশ কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলো নিচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলোঃ

- **ডিস্ট্রিবিউটেড কনসেনশাসঃ** যেকোনো ডিস্ট্রিবিউটেড লেজারের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো কোনো বিশ্বস্ত তৃতীয় পক্ষের (Trusted Third Party, TTP) ওপর নির্ভর না করেই ডিস্ট্রিবিউটেড কনসেনশাস এলগোরিদম ব্যবহার করে লেজারকে পুরোপুরিভাবে ডিসেন্ট্রালাইজড ভাবে মেইনটেইন করা যেতে পারে। এই বৈশিষ্টের মাধ্যমে কোনো ব্লকচেইন সিস্টেমের মধ্যে যে আপডেট হয় তা যেকোনো সময় ভেরিফাই করা সম্ভব হয়। একইসঙ্গে অন্য কোনো সিস্টেম কিংবা ব্যক্তি ব্লকচেইন সিস্টেমের সঙ্গে যে ইন্টারঅ্যাকশন করে সেগুলোও ভেরিফাই করা সম্ভব হয়।

- **লেজারের Immutability and irreversibility:** ব্লকচেইনের নেটওয়ার্কে অনেক সংখ্যক কম্পিউটার নোড অংশগ্রহণ করতে পারে। একটি ব্লকচেইনের লেজারের যেকোনো পরিবর্তন করার জন্য যেহেতু অনেক কম্পিউটারের মধ্যে একপ্রকার কনসেনশাস বা এগ্রিমেন্টের দরকার হয়, তাই কোনো তথ্য একবার ব্লকচেইনের মধ্যে সংরক্ষণ করার একটি নির্দিষ্ট সময় পরে কোন অ্যাটাকারের পক্ষে সেই তথ্য পরিবর্তন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এর মাধ্যমে লেজারের immutability and irreversibility নিশ্চিত হয়। যেহেতু এই নীতি স্মার্ট কন্ট্রাক্টের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, তাই একবার স্মার্ট কনট্র্যাক্ট ব্লকচেইন সিস্টেমে ইনস্টল করার পরে একে আর পরিবর্তন করা যায় না।

- **তথ্যের স্থায়িত্ব:** একটি ডিস্ট্রিবিউটেড লেজারে তথ্য ডিস্ট্রিবিউটেডভাবে P2P নেটওয়ার্কে অংশগ্রহণকারী অনেক কম্পিউটারের মধ্যে সংরক্ষিত থাকে। এর মাধ্যমে যতক্ষণ পর্যন্ত পর্যাপ্ত কম্পিউটার নোড নেটওয়ার্কে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্লকচেইনের তথ্য সংরক্ষিত করা সম্ভব হয়। যার ফলে তথ্যের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা যায়।

- **ডেটা উৎপত্তি (Data Provenance):** শুধু ট্রানজ্যাকশনের মাধ্যমেই যেকোনো ব্লকচেইনের মধ্যে তথ্য সংরক্ষণ করা যায়। প্রতিটি ট্রানজ্যাকশন করার জন্য পাবলিক কী ক্রিপ্টোগ্রাফি ব্যবহার করে ডিজিটাল স্বাক্ষর করতে হয়। এর মাধ্যমে ডেটার উৎসের প্রামাণ্যতা (authenticity of the data source) নিশ্চিত করা সম্ভব। এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এবং লেজারের immutability and irreversibility বৈশিষ্ট্যকে একত্রিত করে লেজারের মধ্যে সংরক্ষিত যেকোনো তথ্যের জন্য অনস্বীকার্যতা (non-repudiation) নিশ্চিত করা যায়। এর মানে কেউ লেজারে ট্রানজাকশনের মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষণ করার পরে আর সহজে অস্বীকার করতে পারবে না যে সে নিজে তথ্য সংরক্ষণ করেনি।

- **তথ্যের নিয়ন্ত্রণ:** ব্লকচেইন নেটওয়ার্কে থাকা যেকোনো কম্পিউটার ব্যবহার করে লেজারের মধ্যে তথ্য রাখা যায় কিংবা তথ্য পুনরুদ্ধার করা যায়। যার ফলে সিস্টেমে কোনো single point of failure থাকে না।

- **জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা:** লেজারের মধ্যে তথ্য সংরক্ষণ করার জন্য প্রতিটি ট্রানজ্যাকশনে এবং সিস্টেমের মধ্যে বিভিন্ন ইন্টারঅ্যাকশন ব্লকচেইন নেটওয়ার্কে থাকা প্রতিটি কম্পিউটার দ্বারা ভেরিফাই করা হয়, যার ফলে সিস্টেমের জবাবদিহিতা বজায় রাখা সম্ভব হয়। একইসঙ্গে যেহেতু লেজারের তথ্য অনুমোদিত সকল কম্পিউটার নোড কিংবা ব্যক্তির কাছে ওপেন থাকে, এর মাধ্যমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যায়।

- **সিকিউর অডিট ট্রেইল:** ব্লকচেইনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলোর মাধ্যমে ব্লকচেইনে পরিচালিত সমস্ত কার্যকলাপের একটি অডিটযোগ্য এবং অপরিবর্তনীয় রেকর্ড মেইনটেইন করা সম্ভব হয়।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অনলাইন ভোটিং ব্যবস্থার পর্যালোচনা

এই সেকশনে আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অনলাইন ভোটিং ব্যবস্থার পর্যালোচনা করছি। দেশগুলো হচ্ছে এস্তোনিয়া, সুইজারল্যান্ড, মেক্সিকো, ফ্রান্স এবং যুক্তরাজ্য।

এস্তোনিয়া

ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে এস্তোনিয়া একমাত্র দেশ যারা তাদের সকল প্রকার নির্বাচনে সব নাগরিকের জন্য ইন্টারনেট ভোটিং সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করেছে। এস্তোনিয়া ২০০৫ সালে ইন্টারনেট ভোটিং বাস্তবায়ন শুরু করে নয়টি নির্বাচন পরিচালনা করেছে যেখানে ভোটারদের অনলাইনে তাদের ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে, ২০০৫ সালে, মাত্র ১.৯% ভোটার অনলাইনে তাদের ভোট দিয়েছিলেন। তবে এই শতাংশ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সাম্প্রতিক সংসদীয় নির্বাচনে প্রায় ৫১% ভোটার অনলাইনে তাদের ভোট দিয়েছিলেন[৭২]।

এস্তোনিয়াতে ইন্টারনেট ভোটিং নির্বাচনের ১০ দিন আগে সকাল ৯:০০টা থেকে শুরু হয়ে নির্বাচনের চার দিন আগে সন্ধ্যা ৬:০০টা পর্যন্ত চলমান থাকে[৭৩]। ভোট দেওয়ার আগে ভোটারদের রাষ্ট্রীয় নির্বাচনি অফিসের ওয়েবসাইট থেকে একটি ভোটার অ্যাপ ডাউনলোড করতে হয়। ভোট দেওয়ার সময় এই অ্যাপটি ব্যবহার করে প্রতিটি নাগরিককে ইলেক্ট্রনিক পরিচয়পত্র, ডিজিটাল আইডি বা মোবাইল-আইডি ব্যবহার করে তাদের পরিচয় নিশ্চিত করতে হয়।

---

[৭২]"Statistics about Internet voting in Estonia", Accessed: 25-11-2024. [Online]. Available: https://www.valimised.ee/en/archive/statistics-about-internet-voting-estonia

[৭৩] Lupiáñez-Villanueva, Francisco, et al. "Study on the Benefits and Drawbacks of Remote Voting.", Accessed: 25-11-2024. [Online]. Available: https://commission.europa.eu/system/files/2020-06/20181121_remote_voting_final_report_final_clean.pdf

পরিচয় প্রমাণের পরে, ভোটাররা ডিজিটালভাবে ব্যালটে স্বাক্ষর করতে পারেন এবং তাদের ভোট জমা দিতে পারেন, যা পরবর্তীতে এনক্রিপ্ট করে নির্দিষ্ট সার্ভারে প্রেরণ করা হয়। ভোটাররা তাদের ভোট সঠিকভাবে রেকর্ড করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করতে পারেন এবং নির্ধারিত ভোটিং সময়কালে তাদের ভোট একাধিকবার সংশোধন করতে পারে। তবে শেষ ভোটটি আইনত গ্রহণ করা হয়।

রাষ্ট্রীয় ইলেক্টোরাল অফিস একটি সুষ্ঠু এবং নিরাপদ ভোটার নির্বাচন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে একটি এনক্রিপশন কী এবং একটি ভোট-ওপেনিং কী জেনারেট করে। দ্বৈত ভোট প্রতিরোধ করার জন্য প্রতিটি ভোটে ডিজিটাল স্বাক্ষর যোগ করা এবং যাচাই করা হয় এবং ভোট গণনার আগে যেকোনো ডুপ্লিকেট ভোট অপসারণ করে শুধু শেষ ভোটটি সংরক্ষণ করা হয়। ভোট-ওপেনিং কী ব্যবহার করে ভোট ডিক্রিপ্ট করতে হয়। এই কী এর সিকিউরিটি নিশ্চিত করার জন্য এটি জাতীয় নির্বাচন কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়। ভোট ডিক্রিপ্ট করার সময় সকল সদস্যদের উপস্থিতিতে তাদের ভাগগুলোকে একত্রিত করে ভোট-ওপেনিং কী পুনর্গঠন (reconstruct) করা হয়। তারপরে এই কী ব্যবহার করে সকল ভোট ডিক্রিপ্ট এবং কাউন্ট করা হয়। নির্বাচনের দিনে সন্ধ্যা ৭:০০টার পরে অফলাইনে এই সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় যাতে কোনো সাইবার আক্রমণ দ্বারা ভোট গণনা প্রভাবিত বা বিকৃত না হয়।

এস্তোনিয়ার ইন্টারনেট ভোটিং সিস্টেম তিন ধরনের যাচাই কার্যক্রম পরিচালনা করে: ব্যক্তিগত যাচাইকরণ, সর্বজনীন যাচাইকরণ এবং যোগ্যতা যাচাইকরণ। ব্যক্তিগত যাচাইকরণের সময় ভোটারদের ভোট সফলভাবে রেকর্ড করা হয়েছে তা নিশ্চিত করা হয়। সর্বজনীন যাচাইকরণের মাধ্যমে যেকোনো ভোটার তার প্রদানকৃত ভোটটি ঠিকমতো রেকর্ড হয়েছে কিনা তা যাচাই করতে পারেন। যোগ্যতা যাচাইকরণের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয় যে কেবল যোগ্য ভোটাররা ভোট দিয়েছেন।

এস্তোনিয়ার ইন্টারনেট ভোটিং সিস্টেম এর সুবিধা এবং অ্যাক্সেসযোগ্যতার জন্য বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। কেননা এর মাধ্যমে প্রবাসী ভোটাররা বিদেশ থেকে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বাসায় থেকেই তাদের ভোট দিতে পারেন। তবে কিছু কম্পিউটার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ এই সিস্টেমের সম্ভাব্য দুর্বলতার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বর্তমানে এই সিস্টেমকে উন্নত করে আরও কীভাবে নিরাপদ করা যায় সেই বিষয়ে প্রচেষ্টা করা হচ্ছে।

সুইজারল্যান্ড

সুইজারল্যান্ড ইন্টারনেট ভোটিং বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে, ২০০৩ সালে জেনেভা ক্যান্টনে ইন্টারনেট ভোটিংয়ের ট্রায়াল শুরু করে। সুইস সরকার বেশ কয়েকটি কারণে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং গ্রহণে উদ্যোগী হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে খরচ কমানো, ভোট গণনার গতি বাড়ানো, বিদেশে বসবাসরত সুইস নাগরিকদের আরও নির্ভরযোগ্যভাবে ভোট দেওয়ার সুযোগ দেওয়া এবং সম্ভাব্য ভোটার উপস্থিতি বৃদ্ধি করা।

সুইজারল্যান্ডে ইন্টারনেট ভোটিং ব্যবস্থা কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত হয় না। বরং ক্যান্টনগুলো পৃথক পৃথক ভাবে তাদের নিজস্ব ইন্টারনেট ভোটিং ব্যবস্থা তৈরি এবং নির্বাচন করার স্বায়ত্তশাসন উপভোগ করে। এর ফলে বিভিন্ন ক্যান্টন আলাদা আলাদা ইন্টারনেট ভোটিং পদ্ধতির সৃষ্টি করেছে। নিচে কিছু ক্যান্টনের ইন্টারনেট ভোটিং পদ্ধতি আলোচনা করা হলো:

জেনেভা: সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় ইন্টারনেট ভোটিং প্রক্রিয়া এমন একটি পদ্ধতি অনুসরণ করে যার মাধ্যমে ভোটের নিরাপত্তা এবং ভোটারের গোপনীয়তা নিশ্চিত করা হয়। নিচে জেনেভায় প্রচলিত পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো:

- ভোটাররা নির্বাচনের প্রায় তিন সপ্তাহ আগে ডাকযোগে একটি ভোটিং কার্ড পান[৭৪]। এই কার্ডে একটি ইউনিক ব্যক্তিগত পরিচয় কোড থাকে যা প্রতিটি নির্বাচনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন করা হয়। এই কোড এমনভাবে জেনারেট করা হয় যে তা অনুমান করার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম, প্রায় পাঁচ বিলিয়নের মধ্যে এক ভাগ।
- ভোট দেওয়ার জন্য ভোটাররা একটি নির্দিষ্ট ই-ভোটিং ওয়েবসাইটে যান এবং নিজেদের পরিচয় যাচাই করার জন্য তাদের ব্যক্তিগত পরিচয় কোড সাবমিট করেন।
- যাচাই হয়ে গেলে, ভোটাররা ইলেক্ট্রনিক ব্যালট এক্সেস করতে পারেন এবং তাদের পছন্দমতো প্রার্থীকে ভোট দিতে পারেন। তবে চড়ান্তভাবে ভোট জমা দেওয়ার আগে তার তাদের প্রার্থী যতবার খুশি পরিবর্তন করতে পারেন।

[৭৪] Franke, Daniel. "Security Analysis of the Geneva e-voting system." Informatik angepasst an Mensch, Organisation und Umwelt: 789 (2013).

- তাঁদের ভোট নিশ্চিত করার জন্য, ভোটারদের তাদের জন্ম তারিখ এবং জন্মস্থানের তথ্য দিতে হয়। ভোটারের পরিচয় নিশ্চিত করার জন্য এই ধাপটি একটি অতিরিক্ত সিকিউরিটির লেয়ার হিসেবে কাজ করে।
- এরপরে ভোটাররা তাদের ভোটকে সিস্টেমে কনফার্ম করেন। তারপরে ইলেক্ট্রনিক ব্যালটটি এনক্রিপ্ট করা হয় এবং ভোটিং সার্ভারে সিকিউরলি প্রেরণ করা হয় এবং রেকর্ড করা হয়। ভোটারের গোপনীয়তা নিশ্চিত করার জন্য ভোটারের পরিচয় এবং ব্যালট আলাদা ফাইলে সংরক্ষণ করা হয়।
- এভাবে সকল ভোটারের থেকে প্রাপ্ত ভোট একটি কেন্দ্রীয় সার্ভারে নিরাপদে একটি ইলেক্ট্রনিক ব্যালট বাক্সে সংগ্রহ করা হয়।
- ইলেক্ট্রনিক ব্যালট বাক্স খোলার জন্য দুটি ক্রিপ্টোগ্রাফিক কী দরকার, এই দুইটি কী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাছে থাকে। এর মাধ্যমে কোনও এক রাজনৈতিক দল আনুষ্ঠানিক ভোট গণনা শুরু করার আগে ভোটের এক্সেস যেন না পায় সেটা নিশ্চিত করে।
- ই-ভোটিং তিন সপ্তাহ স্থায়ী হয়, যা নির্বাচনের আগের দিন শেষ হয়।

জেনেভার ইন্টারনেট ভোটিং সিস্টেমটি ভোটের সিকিউরিটিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়। এই সিস্টেমে কোনো ভোটার কর্তৃক প্রদত্ত ভোটকে সিকিউরলি ট্রান্সমিট করার জন্য TLS এনক্রিপশনের মতো স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতি ব্যবহার করে। এর সঙ্গে ভোটিং সার্ভারে ইলেক্ট্রনিক ব্যালটগুলো ক্রিপ্টোগ্রাফিক অ্যালগরিদম ব্যবহার করে এনক্রিপ্টেড অবস্থায় সংরক্ষণ করে। তবে এটি উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে ভোটারের কম্পিউটার ম্যালওয়্যার মুক্ত আছে কিনা এর ওপরে ভোটের সিকিউরিটি নির্ভর করে। এছাড়াও এই পদ্ধতিতে ভোটিং সিস্টেমের স্বচ্ছতার অভাব নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। এই বিষয়টি মোকাবেলা করার জন্য সুইস ফেডারেল কাউন্সিল ভোটিং সফটওয়্যারের সোর্স কোড পুরোপুরি পাবলিকলি প্রকাশ করতে উৎসাহিত করেছে যাতে ভোটিং সিস্টেমটি স্বাধীনভাবে যাচাই-বাছাই করা যায়। তারা আশা করে যে এর মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক ব্যালট বাক্স ও ভোটিং রেজিস্টার পরিচালনায় আরও বেশি স্বচ্ছতা আসবে।

জুরিখ: সুইজারল্যান্ডের জুরিখে ইন্টারনেট ভোটিং প্রক্রিয়া জেনেভার থেকে অনেকটাই ভিন্ন[৭৫]। নিচে জুরিখে প্রচলিত পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো:

- জেনেভার মতো জুরিখের ভোটাররাও ডাকযোগে একটি বিশেষ ভোটিং কার্ড পান। তবে এই কার্ডে নির্বাচনের প্রতিটি প্রার্থীর জন্য আলাদা কোড থাকে।
- ইলেক্ট্রনিক ব্যালটে সরাসরি প্রার্থী নির্বাচন করার পরিবর্তে, ভোটাররা তাদের নির্বাচিত প্রার্থীর জন্য সংশ্লিষ্ট কোড সাবমিট করেন। ইলেক্ট্রনিক ব্যালট ইন্টারনেটে ট্রান্সমিট করার জন্য কোনো অনিরাপদ যোগাযোগ (insecure communication) চ্যানেল ব্যবহার করা হলেও ভোটের গোপনীয়তা যাতে রক্ষা হয় সেই ভাবেই এই পদ্ধতিটি ডিজাইন করা হয়েছে।
- জুরিখে কোনো কেন্দ্রীয় ভোটার ইলেক্ট্রনিক ব্যালট বক্স নেই। বরং প্রতিটি কমিউইনের নিজস্ব ইলেক্ট্রনিক ব্যালট বক্স থাকে এবং কমিউনগুলো তাদের নিজস্ব ইলেক্ট্রনিক ব্যালট বক্স থেকে ভোট গণনা করে ক্যান্টনে ফলাফল প্রেরণ করে থাকে।

জুরিখের সিস্টেমটি প্রাথমিকভাবে Unisys নামক একটি বেসরকারি কোম্পানি দ্বারা ডেভেলপ করা হয়েছে এবং ওই কোম্পানি এটি মেইনটেইন করে। জুরিখে ভোটারদেরকে এসএমএস এবং ইন্টারেক্টিভ টেলিভিশন সিস্টেমের মাধ্যমেও ভোট দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, যদিও পরবর্তীতে এই বিকল্পগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়।

সুইস পোস্ট সিস্টেম: বার্সেলোনাভিত্তিক কোম্পানি Scytl দ্বারা ডিজাইন করা সুইস পোস্ট ইন্টারনেট ভোটিং সিস্টেমটি অনেক ধাপের মাধ্যমে ভোটিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে, যা ভোটের নিরাপত্তা এবং ভোটারের গোপনীয়তাকে অগ্রাধিকার দেয়[৭৬]। সিস্টেমটি সম্পর্কে সংক্ষেপে নিচে আলোচনা করা হলো:

- ভোটাররা সুইস পোস্ট এর মাধ্যমে ডাকযোগে একটি ব্যক্তিগত কোড পান। এই কোড এবং ভোটারের জন্মতারিখের মাধ্যমে ভোটিং ওয়েবসাইটে ভোটারের আইডেন্টিটি যাচাই করা হয়।
- ভোটাররা ভোট দেওয়ার জন্য ভোটিং ওয়েবসাইটে প্রবেশ করেন এবং তাদের জন্মতারিখ ও ব্যক্তিগত কোড ব্যবহার করে লগ ইন করেন।
- ভোটাররা ইলেক্ট্রনিক ব্যালটে তাদের পছন্দ প্রার্থীকে ভোট দেন।

---

[৭৫] "THE GENEVA INTERNET VOTING SYSTEM", Accessed: 25-11-2024. [Online]. Available: https://www.coe.int/t/dgap/goodgovernance/activities/e-voting/evoting_documentation/passport_evoting2010.pdf

[৭৬] "E-voting: Online voting and elections", Accessed: 25-11-2024. [Online]. Available: https://digital-solutions.post.ch/en/e-government/digitization-solutions/e-voting

- সুইস পোস্ট ভোটিং সার্ভারে ভোটগুলো প্রেরণের আগে গোপনীয়তা নিশ্চিত করার জন্য ভোটগুলো এনক্রিপ্ট করা হয়।
- এর পরে সুইস পোস্ট সার্ভারে ভোটগুলো একটি ক্রিপ্টোগ্রাফিক শাফলিং প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়। এই শাফলিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোটার এবং তাদের ভোটের মধ্যে কোনো সংযোগ (link) বিচ্ছিন্ন করা হয়, যার ফলে ভোটের গোপনীয়তা আরও বৃদ্ধি পায়।
- এনক্রিপ্টেড এবং শাফল করা ভোটগুলো গণনা প্রক্রিয়ার আগে পর্যন্ত নিরাপদে সংরক্ষণ করা হয়।
- শুধু আনুষ্ঠানিক গণনা প্রক্রিয়ার সময় ভোটগুলোর ডিক্রিপ্ট করা হয়।

বিশেষজ্ঞগণ সুইস পোস্ট সিস্টেমটির জটিলতা এবং সম্ভাব্য দুর্বলতার ব্যাপারে সমালোচনার করেছেন। বিশেষত গবেষকরা সিস্টেমের ক্রিপ্টোগ্রাফিক কমিটমেন্ট স্কিমে একটি নিরাপত্তা ত্রুটি চিহ্নিত করেছেন, যার ফলে শাফলিংয়ের সময় কোনো ভোট পরিবর্তন করার মতো গুরুতর সমস্যা ঠিক মতো প্রতিরোধ করতে পারবে কিনা এই ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এই উদ্বেগগুলো মোকাবেলা করতে সুইস পোস্ট একটি পেনেট্রেশন টেস্টিং এবং একটি বাগ বাউন্টি প্রোগ্রাম শুরু করেছে যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সিস্টেমের মধ্যে যেকোনো দুর্বলতা চিহ্নিত এবং সংশোধন করা।

এই উদ্বেগগুলো সত্ত্বেও সুইস পোস্ট সিস্টেমটি ৫০% ক্যান্টোনাল ইলেক্টোরালে সার্টিফায়েড এবং রেকমেন্ডেড হয়েছে। যার অর্থ এই সিস্টেমটি সুইস ফেডারেল চ্যান্সেলারি দ্বারা নির্ধারিত সিকিউরিটি স্ট্যান্ডার্ড পূরণ করেতে পেরেছে। তবে ২০১৯ সালে পরিচালিত একটি পেনেট্রেশন টেস্টিংয়ে এই সিস্টেমের একটি সমস্যা খুঁজে পাওয়া গেছে, যা ইন্টারনেট ভোটিং সিস্টেমের নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে চলমান বিতর্ককে আরও বেগবান করেছে।

সুইজারল্যান্ডের অনলাইন ভোটিংয়ের বিকেন্দ্রীকৃত পদ্ধতি প্রতিটি ক্যান্টনকে নিজস্ব সিস্টেম বেছে নেওয়ার সুযোগ দেয়, যার ফলশ্রুতিতে ভিন্ন ভিন্ন ক্যান্টনে ভিন্ন ভিন্ন সিস্টেম ব্যবহার করা হয়। জেনেভার মতো কিছু ক্যান্টন ওপেন-সোর্স সফটওয়্যার (CHVote) ব্যবহারের মাধ্যমে স্বচ্ছতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। অন্যদিকে জুরিখে ব্যবহৃত Unisys এর তৈরি করা ইন্টারনেট ভোটিং সফটওয়্যার এবং বেশ কয়েকটি ক্যান্টনে ব্যবহৃত Scytl দ্বারা ডিজাইন করা সুইস পোস্ট সিস্টেম প্রোপ্রাইটারি সফটওয়্যার ব্যবহার করে যেখানে সোর্স কোড পাবলিকলি প্রকাশ করা হয় না। যার ফলে এই সকল সিস্টেমের স্বচ্ছতা এবং ভোটদান প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে নিরীক্ষা করা ও যাচাই-বাছাই করা দুরূহ হয়ে ওঠে। এছাড়াও এই বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থার কারণে পুরো সুইজারল্যান্ডে একই রকম নিরাপত্তা স্ট্যান্ডার্ড নিশ্চিত করা কঠিন হয়। তার সত্ত্বেও কিছু কমন সিকিউরিটি স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে, যেমন:

- ভোটারদের ভীতি প্রতিরোধ করতে ভোটার এবং তার ভোটের গোপনীয়তা নিশ্চিত করা।
- ভোটের সিক্রেসি রক্ষা করতে ক্রিপ্টোগ্রাফিক এনক্রিপশন এলগোরিদম ব্যবহার করা।
- শুধু সর্বশেষ প্রাপ্ত ভোটকেই ভোট গণনার সময় কাউন্ট করা।
- ভোটকে নিরাপদে সংরক্ষণ করা, ভোট গণনা প্রক্রিয়ার জন্য নিরাপদ পদ্ধতি ব্যবহার করা এবং নির্বাচনি তালিকার সুরক্ষার ব্যবস্থা করা।

সুইজারল্যান্ডে ইন্টারনেট ভোটিং সম্পর্কে জনমতে বিভক্তি রয়েছে। তরুণ ভোটার এবং প্রবাসী সুইস নাগরিকরা ইন্টারনেট ভোটিংকে একটি সুবিধাজনক এবং সম্ভাব্য একটি নিরাপদ বিকল্প হিসেবে পছন্দ করেন, অন্যদিকে অন্যরা এর নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে এখনও সন্দেহ পোষণ করেন।

মেক্সিকো

বিদেশে বসবাসকারী মেক্সিকান নাগরিকরা ইলেক্ট্রনিক ভোটিং সিস্টেম (SIVEI) ব্যবহার করে মেক্সিকোর নির্বাচনে ইলেক্ট্রনিকভাবে ভোট দিতে পারেন[৭৭]। এই সিস্টেম ব্যবহার করে ভোটদানের আগে প্রবাসী ভোটারদের বিদেশে বসবাসকারী ভোটারদের তালিকায় (LNERE-এ) অনলাইনে নিবন্ধন করতে হয় এবং ভোটিং মাধ্যম হিসেবে অনলাইন ভোটিংকে বেছে নিতে হয়। ভোটাররা Microsoft Edge, Firefox, Safari এবং Chrome এর মতো বিভিন্ন ব্রাউজার ব্যবহার করে SIVEI সিস্টেম অ্যাক্সেস করতে পারেন এবং নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে ভোট দিতে পারেন:

- ভোটার SIVEI সিস্টেম অ্যাক্সেস করার জন্য একটি লিঙ্ক-সহ একটি ই-মেইল পান।
- ভোটার লিঙ্কে ক্লিক করেন এবং তাদের মোবাইল ফোন নম্বরের শেষ চারটি ডিজিট ব্যবহার করে একটি নিরাপত্তা প্রশ্নের উত্তর দেন।

---

[৭৭] "ELECTRONIC VOTING SYSTEM FOR MEXICAN RESIDING ABROAD MANUAL", Accessed: 25-11-2024. [Online]. Available: https://votoextranjero.mx/documents/52001/757367/Manual_SIVEI_Ing_2021.pdf/87f4a694-5e6b-43ba-afe5-e5ac823873d0

- ভোটার এসএমএস বার্তা বা QR কোড দ্বারা একটি যাচাইকরণ কোড পান।
- SIVEI সিস্টেমে যাচাইকরণ কোড প্রবেশ করানোর পরে ভবিষ্যতে লগইন করার জন্য ভোটার একটি পাসওয়ার্ড তৈরি করেন।
- SIVEI সিস্টেমে লগইন করার জন্য ভোটার তার ইউজারনেম এবং পাসওয়ার্ড সিস্টেমে দেন। এর পরে নতুন যাচাইকরণ কোড তার ইমেইলে পান এবং এটি সিস্টেমে প্রদান করেন।
- ভোটার যে নির্বাচনে ভোট দিতে চান তা সিলেক্ট করেন এবং নির্ধারিত নির্দেশাবলি পালন করে ইলেক্ট্রনিক ব্যালট দেখতে পান।
- ভোটার তাদের পছন্দসই প্রার্থী নির্বাচন করেন অথবা 'ভোটো নুলো' (voto nulo) বেছে নেন, যার মাধ্যমে ভোটার তার ভোটকে গণনা না করার অনুরোধ করতে পারেন।
- প্রদানকৃত ভোট এনক্রিপ্ট করা হয় এবং সিকিউরলি SIVEI-তে প্রেরণ করা হয়।
- ভোটার তার ভোট যাচাই করার জন্য কোড-সহ একটি ভোট রশিদ পান।
- ভোটার রশিদটি পিডিএফ হিসাবে ডাউনলোড করতে পারেন। এই ভোট রশিদটি ভোটার ইমেলের মাধ্যমেও পান।

ভোটাররা তাদের ভোটের রসিদের মধ্যে প্রাপ্ত কোডের প্রথম ছয়টি সংখ্যা SIVEI-তে প্রবেশ করে তাদের ভোট যাচাই করতে পারেন। যাচাইকরণ প্রক্রিয়ার শেষে সম্পূর্ণ কোড প্রদর্শিত হয় যেটা ভোটার তার প্রাপ্ত রশিদে প্রদর্শিত কোডের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারেন। এর মাধ্যমে এটা নিশ্চিত করা হয় যে ভোটারের ভোট সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং যথাসময়ে গণনা করা হবে।

ভোট কাস্ট হওয়ার পরে এনক্রিপ্ট করা এবং নিরাপদে SIVEI সিস্টেমে ট্রান্সমিট করার তথ্য ব্যতিরেকে আরও কী ধরনের সিকিউরিটি এবং ক্রিপ্টোগ্রাফিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় সেই সম্পর্কে কোনো তথ্য অনলাইনে পাবলিক ডোমেইনে পাওয়া যায়নি।

ফ্রান্স

ফ্রান্স ২০১২ সালের আইনসভা নির্বাচনে বিদেশে বসবাসকারী নাগরিকদের জন্য ইন্টারনেট ভোটিং বাস্তবায়ন করেছিল[৭৮]। ভোটাররা প্রক্সি ভোটিং, পোস্টাল ভোটিং এবং বিদেশে নির্ধারিত ভোট কেন্দ্রগুলোতে ব্যক্তিগতভাবে ভোটদানের মতো বিকল্পগুলোর পাশাপাশি অনলাইনে ভোট দেওয়ার অনুমতি পেয়েছিলেন। এই উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল ভোটারদের ভোটিংয়ে অংশগ্রহণ বাড়ানো, বিশেষ করে সেই জায়গাগুলোতে যেখানে ডাক সেবা সীমিত।

ফ্রান্সে ইন্টারনেট ভোটিং ব্যবস্থা ধীরে ধীরে চালু করা হয়েছিল। প্রথমে এই ব্যবস্থা ২০০৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ট্রায়ালের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল যা পরে ২০০৬ সালে উচ্চ কক্ষে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য সম্প্রসারিত হয়েছিল। এবং পরে ২০০৯ সালের মধ্যে সমস্ত বিদেশি ভোটারদেরকে ইন্টারনেট ভোটিং এর আওতায় নিয়ে আসা হয়েছিল। এমনকি ২০১৪ সালে কনস্যুলেট প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য পূর্বে ব্যবহৃত ডাকযোগে ভোটদানকে প্রতিস্থাপন করে ইন্টারনেট ভোটিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল।

এই অনলাইন ভোটিংয়ে অংশগ্রহণের জন্য ভোটারদেরকে নিম্নোক্ত স্টেপ পালন করতে হতো:

- বিদেশে বসবাসকারী ফরাসি নাগরিকদের কনস্যুলেট ডিরেক্টরিতে নিবন্ধন করতে হয়েছিল যেখানে তাদেরকে একটি ই-মেইল ঠিকানা দিতে হয়েছিল। এই ই-মেইলের মাধ্যমে পরিচয় শনাক্ত করা হতো।
- এরপরে একটি সিঙ্গেল রাউন্ডের ভোটের জন্য ওই একই ই-মেইলে একটি পাসওয়ার্ড পাঠানো হতো।
- তারপর ভোটারদের কাছে তাদের নিবন্ধিত ই-মেইলে ব্যালট পাঠানো হতো।
- ভোটাররা সেই ব্যালটের মাধ্যমে তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারতেন যা সার্ভারে সংরক্ষিত হতো। ভোট দেওয়ার পরে ভোটার একটি কনফারমেশন রসিদ পেতেন।
- অনলাইন প্রাপ্ত ভোটার গণনা প্রক্রিয়া পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয় ছিল। স্থানীয় ইন্টারনেট ভোট কমিটির সভাপতি তারপরে প্যারিসের একটি নির্ধারিত ভোট কেন্দ্রে ফলাফল প্রেরণ করতেন।

২০১২ সালের আইনসভা নির্বাচনের প্রথম রাউন্ডে বিদেশি ভোটের ৫৭% অনলাইনে দেওয়া হয়েছিল, যা ভোট কেন্দ্রে দেওয়া ৪১% এবং ডাকযোগে প্রাপ্ত ২% ভোটকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তবে ভোটারদের ভোটদানের ক্ষেত্রে অনলাইন ভোটিংয়ের সামগ্রিক প্রভাব সম্পর্কে অনিশ্চয়তা ছিল। এই অনিশ্চয়তার মধ্যেও বিদেশি ভোটারদের মধ্যে অনলাইন ভোটিংয়ের জনপ্রিয়তা লক্ষণীয় ছিল।

[৭৮] Lupiáñez-Villanueva, Francisco, et al. "Study on the Benefits and Drawbacks of Remote Voting." (2018).

ফ্রান্সের National Information System Security Institute বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবং ইউকে'র ব্রেক্সিট ভোটের সময় কথিত রাশিয়ান হস্তক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে অনলাইন ভোটিংয়ে সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকির ব্যাপারে সতর্ক করেছিল। এই National Information System Security Institute এর পরামর্শের ভিত্তিতে ফরাসি সরকার সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকি সম্পর্কিত উদ্বেগকে হাইলাইট করে ২০১৭ সালের আইনসভা নির্বাচনের জন্য ইন্টারনেট ভোটিং স্থগিত করে, যা আজও বলবৎ আছে।

তবে এটা উল্লেখ্য, ফ্রান্সে ইন্টারনেট ভোটিং কেবল স্থগিত করা হয়েছে, বাতিল করা হয়নি। ভবিষ্যতের নির্বাচনে পুনরায় এর প্রবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে।

যুক্তরাজ্য (ইউ কে)

যদিও যুক্তরাজ্য কোনো জাতীয় নির্বাচনে অনলাইন ভোটিং সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করেনি, তবে অনলাইন ভোটিংয়ের সম্ভাবনা যাচাই করার জন্য বেশ কয়েকটি পরীক্ষামূলক ট্রায়াল পরিচালনা করেছে[৭]। ২০০০ সালের গণ প্রতিনিধিত্ব আইন স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোকে নির্বাচনের জন্য পাইলট স্কিম পরিচালনা করার ক্ষমতা দিয়েছিল, যার মাধ্যমে ইন্টারনেট এবং টেলিফোন ভোটিংয়ের মতো ইলেক্ট্রনিক ভোটিং অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ আসে। এই আইনটি ২০০২ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং পাইলটের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। পাশাপাশি অগ্রিম ভোটিং, পোস্টাল ভোটিং এবং ভোটার শনাক্তকরণ পদ্ধতি পরীক্ষা করা হয়েছিল।

ইউকে ইলেকটোরাল কমিশন ২০০৭ সালের আগস্টে এই পরীক্ষামূলক ট্রায়ালগুলোর ফলাফল নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ওয়েলসে অনলাইন ভোটিং ট্রায়ালের পরিকল্পনা এবং স্কটল্যান্ডে এর সম্ভাবনার বিষয়ে আলোচনা চলমান। তবে এখনও পর্যন্ত যুক্তরাজ্যের কোনো জাতীয় নির্বাচনে অনলাইন ভোটিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়নি এবং অনলাইন ভোটিং গ্রহণের কোনো তাৎক্ষণিক পরিকল্পনাও আপাতত নেই।

একটি সিকিউর, আধুনিক এবং বিশ্বাসযোগ্য অনলাইন ভোটিং ব্যবস্থার রূপরেখা

একটি সিকিউর, আধুনিক এবং বিশ্বাসযোগ্য অনলাইন ভোটিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য, আমাদের এমন একটি সামগ্রিক (holistic) সিস্টেম দরকার যা পূর্ববর্তী সেকশন এ হাইলাইট করা চ্যালেঞ্জগুলোকে মোকাবেলা করতে পারে এবং পূর্ববর্তী সেকশন এ উল্লিখিত সিকিউরিটি এবং প্রাইভেসির বৈশিষ্ট্যগুলোকে পূরণ করতে পারে।

এই ধরনের একটি জটিল সিস্টেম ডিজাইন ও ডেভেলপ করার জন্য পূর্বে আলোচিত টুলস এবং প্রযুক্তিকে খুবই সতর্কতার সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ইন্টিগ্রেট করার ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য দরকার পর্যাপ্ত সময়। কমিশনের এই স্বল্প সীমিত সময়ের মধ্যে এই ধরনের একটি জটিল সিস্টেম ডিজাইন করার চেষ্টা না করে বরং এরকম কোনো সিস্টেমের জন্য যে প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে সেগুলোর যৌক্তিকতার বিশ্লেষণ করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতে যখন এরকম কোনো সিস্টেম ডিজাইন এবং ডেভেলপ করার উদ্যোগ নেওয়া হবে এই বিশ্লেষণ তখন সেই সিস্টেমের ফাউন্ডেশন হিসেবে কাজ করতে পারবে।

চিত্র-৪ এ আমরা আমাদের ভবিষ্যতের প্রস্তাবিত অনলাইন ভোটিং সিস্টেমের জন্য কী ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে তা আলোকপাত করেছি। নিচে একটি অনলাইন ভোটিং সিস্টেমের জন্য এই প্রযুক্তিগুলো ব্যবহারের যৌক্তিকতা তুলে ধরা হলো।

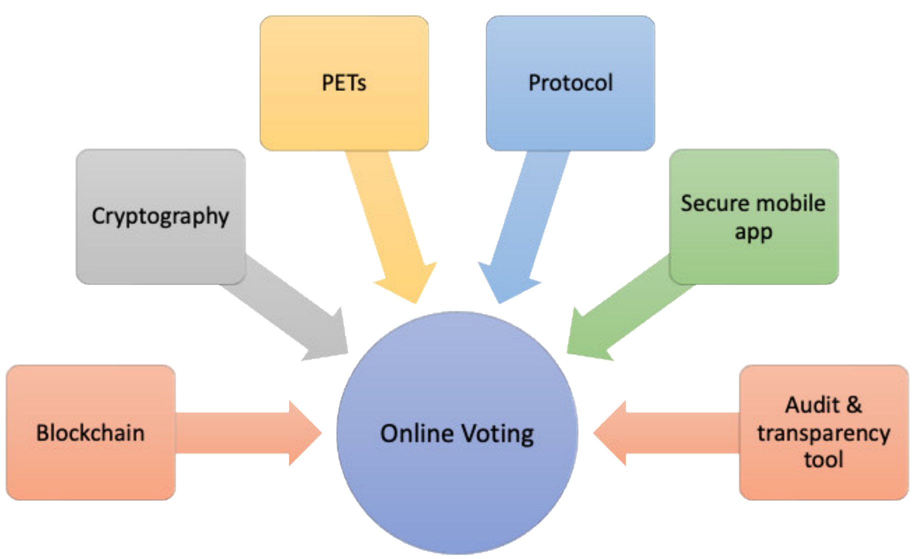

চিত্র ৪: একটি সিকিউর, আধুনিক এবং বিশ্বাসযোগ্য অনলাইন ভোটিং ব্যবস্থার সহায়ক প্রযুক্তিসমূহ

- **ব্লকচেইন:** একটি ব্লকচেইন সিস্টেম প্রস্তাবিত অনলাইন ভোটিং সিস্টেমের ভিত্তি (foundation) হিসেবে কাজ করতে পারে। অনলাইন ভোটিং সিস্টেমের জন্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ হচ্ছে জবাবদিহিতা (accountability) এবং স্বচ্ছতা (transparency) নিশ্চিত করা, সাইবার-আক্রমণ এবং অননুমোদিত ম্যানিপুলেশন ঠেকানো, তথ্যের প্রোভেন্যান্স (data provenance) সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া এবং সেন্ট্রালাইজড সিস্টেম যতদূর এড়ানো যায় তার ব্যবস্থা করা। একটি ব্লকচেইন সিস্টেম খুবই কার্যকরভাবে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, বিকেন্দ্রীকরণ, ডেটা প্রোভেন্যান্স, ডেটা অপরিবর্তনীয়তা (immutability), ডেটা প্রাপ্যতা (availability) এবং একটি সিকিউর অডিট ট্রেইলের সুবিধা প্রদান করতে পারে যার মাধ্যমে অনলাইন ভোটিংয়ের উপরে উল্লেখিত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করা সম্ভব হবে। উপরন্তু, একটি স্মার্ট-কন্ট্রাক্ট-ভিত্তিক ব্লকচেইন সিস্টেম কোড অপরিবর্তনীয়তার (code immutability) সুবিধা প্রদান করে, যার মাধ্যমে এটি নিশ্চিত করা সম্ভব যে ব্লকচেইন সিস্টেমে একটি প্রোগ্রাম ইনস্টল করার পরে এটাকে আর চেঞ্জ করা যাবে না, এমনকি কোনো ম্যালওয়্যারও এই ধরনের প্রোগ্রামকে পরিবর্তন করতে পারবে না। একটি ভোটিং সিস্টেমের কোর কোড যদি এরকম ব্লকচেইন ভিত্তিক স্মার্ট-কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে ব্যবহার করা যায়, তবে ভোটিং সিস্টেমকে ম্যানিপুলেট করা আর সম্ভব হবে না। এই উদ্দেশ্যে একটি স্মার্ট-কন্ট্রাক্ট-ভিত্তিক প্রাইভেট কনসোর্টিয়াম বা এমনকি একটি হাইব্রিড ব্লকচেইন সিস্টেম ব্যবহার করা যেতে পারে।
- **ক্রিপ্টোগ্রাফি:** ব্লকচেইনে ক্রিপ্টোগ্রাফির বিভিন্ন এলগোরিদম ব্যবহার করা হয়। এইসব পদ্ধতির বাইরেও একটি ব্লকচেইনভিত্তিক অনলাইন ভোটিং সিস্টেমের মধ্যে ভোট এবং ভোটারের তথ্যের কনফিডেন্শিয়ালিটি নিশ্চিত করতে বিভিন্ন এনক্রিপশন এবং অ্যাক্সেস কন্ট্রোল পদ্ধতি অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে। ব্যবহারকারীরা যেভাবে ভোটিং সিস্টেমটি ব্যবহার করে তার ওপর নির্ভর করে আরও অতিরিক্ত ক্রিপ্টোগ্রাফিক পদ্ধতি যেমন, ক্রিপ্টোগ্রাফিক হ্যাশ ফাংশন এবং ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার করার প্রয়োজন হতে পারে।
- **প্রাইভেসি-বর্ধনকারী প্রযুক্তি (PETs):** জিরো-নলেজ প্রুফ (ZKP) এবং মাল্টি-পার্টি কম্পিউটেশন (MPC) ভোটিং সিস্টেমের নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা বাড়ানোর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি হতে পারে। ZKP-এর মাধ্যমে ভোটাররা তাদের আইডেন্টিটি প্রকাশ না করেই ভোট দিতে সক্ষম হবে, যার মাধ্যমে ভোটারদের প্রাইভেসি নিশ্চিত হবে। একটি ব্লকচেইনভিত্তিক MPC-এর মাধ্যমে একটি ডিস্ট্রিবিউটেড কম্পিউটেশন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা সম্ভব যার মাধ্যমে ভোটারের ভোট প্রকাশ না করেই সঠিকভাবে ভোট গণনা করা সম্ভব। এটির মাধ্যমে ভোট গণনার ক্ষেত্রে কারসাজি রোধ করা সম্ভব হবে যা নির্বাচনের ফলাফলের ওপর আস্থা বাড়াতে সাহায্য করবে।
- **সিকিউর মোবাইল অ্যাপ:** প্রস্তাবিত ভোটিং সিস্টেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্ট একটি সিকিউর মোবাইল অ্যাপ যার মাধ্যমে ভোটাররা বিশ্বের যে কোনো জায়গা থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবে। এই মোবাইল অ্যাপের মধ্যে উন্নত AI (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা)/ML (মেশিন লার্নিং) ভিত্তিক ইমেজ প্রসেসিং কৌশল ব্যবহার করতে হবে যা দিয়ে একটি লাইভ ভেরিফিকেশন সিস্টেমের মাধ্যমে প্রতিটি ভোটারের পরিচয় যাচাই করা যেতে পারে। এছাড়াও এই মোবাইল অ্যাপে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে কোনো ম্যালওয়্যার এই অ্যাপের সিকিউরিটি বিঘ্নিত করতে না পারে। একটি মোবাইল অ্যাপ একটি ক্রিপ্টোগ্রাফিক ওয়ালেট হিসেবেও কাজ করতে পারবে, যার মধ্যে ভোটারদের ক্রিপ্টোগ্রাফিক কীগুলো সিকিউরলি সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে।
- **ক্রিপ্টোগ্রাফিক প্রোটোকল:** প্রস্তাবিত ভোটিং সিস্টেমের জন্য আমাদেরকে একটি নতুন ক্রিপ্টোগ্রাফিক প্রোটোকল তৈরি করতে হবে যার মাধ্যমে সিস্টেমের বিভিন্ন কম্পোনেন্টের মধ্যে সিকিউরলি তথ্য বিনিময় করা সম্ভব হবে। এই প্রোটোকল ডিজাইন করার জন্য অ্যাডভান্সড ক্রিপ্টোগ্রাফিক পদ্ধতি এবং গোপনীয়তা-বর্ধক প্রযুক্তি ব্যবহার করার দরকার হবে।
- **অডিট এবং ট্রান্সপারেন্সি টুল:** প্রস্তাবিত ভোটিং সিস্টেমের সঙ্গে অবশ্যই একটি অডিট এবং ট্রান্সপারেন্সি টুল ইন্টিগ্রেট করতে হবে। এই টুলের মাধ্যমে অনুমোদিত ব্যক্তি কিংবা সংস্থাগুলো সিস্টেমের প্রতিটি দিক নিরীক্ষা করতে সক্ষম হবে। এই টুলগুলো ব্যবহার করে আমাদের ভোটাররা তাদের ভোটের বিভিন্ন দিক অডিট এবং ভেরিফাই করতে পারবে। ফলে এই টুলগুলো সিস্টেমে পুরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন করার জন্য একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত হবে।

সুপারিশসমূহ

এই সেকশনে আমরা একটি নিরাপদ, আধুনিক এবং বিশ্বাসযোগ্য অনলাইন ভোটিং সিস্টেম ডিজাইন এবং ডেভেলপ করার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশ পেশ করছি:

- প্রস্তাবিত অনলাইন ভোটিং ব্যবস্থা বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ হবে ব্লকচেইন, সিকিউরিটি, ক্রিপ্টোগ্রাফি, প্রাইভেসি-বর্ধনকারী (privacy-enhancing) প্রযুক্তি এবং অনলাইন ভোটিং এর উপরে যেসব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ রয়েছেন তাদের সমন্বয়ে একটি প্রযুক্তিগত টাস্কফোর্স প্রতিষ্ঠা করা। এই টাস্কফোর্সে নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং সরকারি/বেসরকারি সংস্থার প্রাসঙ্গিক ডোমেইন বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

- গঠিত এই টাস্কফোর্সের প্রথম দায়িত্ব হবে সফ্‌টওয়্যার ডেভেলপমেন্টের আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম পদ্ধতি অনুসরণ করে একটি অনলাইন ভোটিং সিস্টেমের আর্কিটেকচার এবং প্রোটোকল ডিজাইন এবং সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট তত্ত্বাবধান করা। এই লক্ষ্যে একাধিক বাংলাদেশি বিশ্ববিদ্যালয়, সফ্‌টওয়্যার ভেন্ডর এবং সরকারি সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে একটি যৌথ প্রকল্প শুরু করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিটি দেশের অভ্যন্তরে প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধিকে সহজতর করবে। প্রয়োজনে অন্যান্য দেশ যারা অ্যাডভান্সড অনলাইন ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করছে তাদেরকে আন্তর্জাতিক অংশীদার হিসেবে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
- সিস্টেমটি তৈরি হয়ে গেলে, এর কার্যকারিতা (functionalities), নিরাপত্তা (security) এবং ব্যবহারযোগ্যতা (usability) নিশ্চিত করার জন্য এটিকে যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা দরকার। কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্য প্রচলিত পদ্ধতি যেমন, ইউনিট টেস্টিং, ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং, সিস্টেম টেস্টিং, ইউজার অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টিং (UAT), ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং এবং হোয়াইট বক্স টেস্টিং বিবেচনা করা উচিত। নিরাপত্তা পরীক্ষা করার জন্য, সিকিউরিটি প্রোটোকল এবং ডেভেলপকৃত সিস্টেমের আনুষ্ঠানিক যাচাই-বাছাই (formal verification) করা আবশ্যক। সবশেষে, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি ব্যবহার করে সিস্টেমের ব্যবহারযোগ্যতা অবশ্যই পরীক্ষা করা উচিত।
- পরবর্তীতে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এক বা একাধিক সিকিউরিটি অডিট ফার্ম দ্বারা সিস্টেমটির ক্রমাগত নিরাপত্তা অডিট (Security Audit) করা। ডেভেলপকৃত সিস্টেমের ওপরে আস্থা স্থাপনের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে।
- ডেভেলপকৃত সিস্টেমে আস্থা স্থাপনের আরেকটি প্রচলিত পদ্ধতি হলো এর কোডবেসটি পাবলিকলি প্রকাশ করা, যাতে বিশ্বের যে কেউ এই কোডবেস পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারে। কোনো জটিল এবং ক্রিটিক্যাল সিস্টেমকে পাবলিক ডিপ্লয়মেন্টের আগে তার কোড এরকম উন্মুক্ত করলে সেই সিস্টেমের সম্ভাব্য ত্রুটিগুলো শনাক্ত করা এবং ডিপ্লয়মেন্টের আগেই ত্রুটিগুলো সারানো সম্ভবপর হয়। আরেকটি পরিপূরক পদ্ধতি হলো পাবলিক পেনেট্রেশন টেস্টিং এবং বাগ বাউন্টি প্রোগ্রাম চালু করা, যা সিস্টেমের গুরুতর সিকিউরিটি এবং প্রাইভেসির দুর্বলতাগুলো খুঁজে বের করতে সহায়তা করতে পারে।
- একটি সিকিউরিটি অনলাইন ভোটিং সিস্টেম চালু করতে হলে দেশের আইনি কাঠামোতে সংশোধন করার প্রয়োজন হবে। টাস্কফোর্সের প্রধান দায়িত্বগুলোর মধ্যে একটি হবে এই বিষয়টি যথোপযুক্তভাবে পর্যালোচনা করা এবং দেশের বিভিন্ন আইনি কাঠামো বিশ্লেষণ করে কোন কোন জায়গায় প্রয়োজনীয় সংশোধন করা দরকার তা প্রস্তাব করা।
- অনলাইন ভোটিং সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকাশনা এবং গবেষণাতে জোর দেওয়া হয়েছে যে জনগণের আস্থা অর্জন করাই হলো একটি অনলাইন ভোটিং সিস্টেমের সফলতার অন্যতম মূল মাপকাঠি। জনগণের আস্থা অর্জনের একটা উপায় হতে পারে জনগণকে ক্রমাগতভাবে সিস্টেমটি ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ইতিবাচক অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যবস্থা করা। এই লক্ষ্যে প্রথমে ছোট পরিসরের কোনো ভোটিংয়ে এই সিস্টেমটি ট্রায়ালের সুপারিশ করা যেতে পারে, যাতে সিস্টেমটির প্রতি জনগণের আস্থা ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে এই ট্রায়ালগুলোর সাফল্যের অভিজ্ঞতাগুলো বড় আকারের ডিপ্লয়মেন্টের আদর্শ উদ্দীপক (ideal catalyst) হিসেবে কাজ করতে পারে।
- এমন একটি সিস্টেম ডিজাইন করার সময়, আমাদের অবশ্যই সেইসব ভোটারদের ব্যাপারে বিবেচনা করতে হবে যাদের স্মার্টফোন নেই। এই শ্রেণির ভোটারদের জন্য আমাদের অবশ্যই প্রস্তাবিত সিস্টেমে একটি বিকল্প ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে, যার মাধ্যমে তারা বিকল্প পদ্ধতিতে অনলাইনে ভোট দিতে পারেন।

১২. নির্বাচনি অপরাধ

কোনো সরকার যখন অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ম্যান্ডেট ছাড়াই ক্ষমতায় থাকার অপচেষ্টা করে, তখন নির্বাচনকে প্রভাবিত করার জন্য নানা রকম অনিয়ম এবং অপরাধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। নির্বাচনি অপরাধ ও অনিয়ম শুধু ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে না, এটি নির্বাচনি ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা কমিয়ে দেয়। যখন একটি রাষ্ট্রের নির্বাচনি ব্যবস্থা সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না, তখন জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক হতাশা ও অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়, যা গণতন্ত্রের জন্য দীর্ঘমেয়াদে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নির্বাচনি অপরাধ কোনো নতুন বিষয় নয়। ১৯৭১-পরবর্তী সময় থেকে এ পর্যন্ত দেশের সব নির্বাচনে কমবেশি অনিয়ম ও অপরাধের ঘটনা ঘটেছে। তবে গত ১৫ বছরে, বিশেষত ২০০৮ সালের পর থেকে অনুষ্ঠিত তিনটি জাতীয় নির্বাচনে এই প্রবণতা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নির্বাচনকে অগণতান্ত্রিকভাবে পরিচালনা করা এবং ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রহসনে পরিণত করার প্রবণতা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে।

নির্বাচনি অপরাধ বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ হলো, নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ে জবাবদিহিতার অভাব। নির্বাচনি কর্মকর্তাদের মধ্যে দুর্নীতি এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রতি তাদের পক্ষপাতিত্ব, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে ব্যর্থতা এবং বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের আস্থার সংকট এই সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে। এর পাশাপাশি, নির্বাচনি অনিয়মে জড়িত ব্যক্তিদের দায়মুক্তি প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আইন প্রয়োগে অনীহা সমস্যাটিকে দীর্ঘমেয়াদে আরও গভীর করেছে।

২০১৪ সালের দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের অর্ধেকের বেশি ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি। এই নির্বাচন সংবিধানের ৬৫(২) অনুচ্ছেদের প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদ গঠনের বিধানের মারাত্মক লঙ্ঘন ছিল, কেননা ১৫৩টি নির্বাচনি আসনে কোনো ভোট গ্রহণ না করেই প্রার্থীদের নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে আরও গুরুতর অভিযোগ ওঠে। এই নির্বাচনকে 'রাতের ভোট' হিসেবে অভিহিত করা হয়, অনেক আসনে ভোটগ্রহণ শুরুর আগেই ব্যালট বাক্স ভর্তি হয়ে গেছে। এই নির্বাচন দেশ-বিদেশে ব্যাপক সমালোচিত হয়। তবে তৎকালীন নির্বাচন কমিশন এ বিষয়ে কোনো তদন্ত বা নিরীক্ষা করেনি। ২০২৪ সালের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন একটি একতরফা প্রহসনে পরিণত হয়। এই নির্বাচনে সরকারি দল নিজেরাই নিজেদের প্রতিপক্ষ হয়ে একাধিক অনিয়মের আশ্রয় নিয়েছে। যদিও নির্বাচন মানেই, আইনের অঙ্গনে বহুল ব্যবহৃত 'ব্ল্যাকস ল ডিকশনারি' অনুযায়ী, বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প থেকে বেছে নেওয়া, নির্বাচন কমিশন এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করে। প্রশাসনিক দুর্বলতা এবং আইনের শাসনের অভাব ক্রমেই নির্বাচন ব্যবস্থাকে অবিশ্বাস্য করে তুলেছে এবং নির্বাচন সম্পর্কে জনমনে ব্যাপক আস্থাহীনতা সৃষ্টি হয়েছে।

অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি যে, নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার পর থেকে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ পর্যন্ত নির্বাচনি অপরাধ ও আচরণবিধি লঙ্ঘনের অসংখ্য ঘটনা ঘটে। *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২ (আরপিও)-এর ৭৩-৯০ ধারায় বিভিন্ন নির্বাচনি অপরাধ, দণ্ড ও প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কিত বিধান রয়েছে। এছাড়া গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ৯১খ ধারার ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন সংসদ নির্বাচনে *রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা*, ২০০৮ প্রণয়ন করেছে। এ বিধিমালায় দল ও প্রার্থীদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি এবং তা ভঙ্গের শাস্তির বিধান রয়েছে। এ বিধিমিলার কোনো বিধানের লঙ্ঘন নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম বলে গণ্য হয় এবং এরূপ কোনো লঙ্ঘন কোনোভাবে কমিশনের দৃষ্টিগোচর হলে কমিশন তা নির্বাচনি তদন্ত কমিটির কাছে তদন্তের জন্য প্রেরণ করে।

নির্বাচন যেহেতু একটি নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠিত হয় সেহেতু নির্বাচনি অপরাধ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি হওয়া আবশ্যক। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, এই অপরাধের মামলা প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রতার কারণে যথাসময়ে নিষ্পত্তি হয় না। এমনকি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও বিচার সম্পন্ন হয় না। গত তিনটি নির্বাচনে এ প্রবণতা ব্যাপকভাবে লক্ষ করা গেছে। বস্তুত অনেক ক্ষেত্রে সম্ভাব্য অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। এর ফলে আইনি প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় এবং অপরাধীরা পার পেয়ে যায়।

নির্বাচনি অপরাধের মামলা দায়েরেও বেশ কিছু আইনি জটিলতা রয়েছে। *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২-এর ৯০ ধারা অনুযায়ী, নির্ধারিত কিছু অপরাধের মামলা দায়েরের জন্য ছয় মাস সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। উচ্চ আদালতের আদেশের ক্ষেত্রে এই সময়সীমা তিন মাস। ফৌজদারি মামলা শুরুর ক্ষেত্রে তামাদি প্রযোজ্য নয়– আইনের এ বহুল গ্রহণযোগ্য নীতি এখানে প্রযোজ্য নয়। এটি একটি বড় ধরনের আইনি অসঙ্গতি তৈরি করে, যা নির্বাচনি অপরাধের বিচার প্রক্রিয়াকে আরও বাধাগ্রস্ত করে।

নির্বাচনি অপরাধ বা অনিয়মের শ্রেণিবিভাগ

নির্বাচনি অপরাধ বা অনিয়ম সংঘটনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী এই অপরাধগুলো তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। প্রথমত, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশন দ্বারা সংঘটিত অপরাধ বা অনিয়ম। দ্বিতীয়ত, নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধ বা অনিয়ম। তৃতীয়ত, সাধারণ ব্যক্তি বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, রাজনৈতিক সংগঠন বা অন্য কোনো ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত অপরাধ।

(ক) নির্বাচন কমিশন দ্বারা সংঘটিত অপরাধ বা অনিয়ম

নির্বাচন কমিশন দেশের সর্বোচ্চ নির্বাচন পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ। কমিশনের প্রধান দায়িত্ব হলো আইনানুগভাবে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান করা, যার মাধ্যমে আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, বিগত কয়েকটি নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে গুরুতর অনিয়ম এবং ক্ষমতাসীনদের কারচুপির মাধমে ক্ষমতায় অব্যাহত থাকার অপচেষ্টায়

সহায়তা করার অভিযোগ ওঠেছে। যদিও এসব অভিযোগে কমিশনের শপথ ভঙ্গ বা অসদাচরণের মতো গুরুতর অপরাধের অন্তর্ভুক্ত, তবু তাদের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এর ফলে নির্বাচন কমিশনের ওপর জনগণের আস্থার সংকট সৃষ্টি হয়েছে। তাই ভবিষ্যতে নির্বাচন ব্যবস্থা বিশ্বাসযোগ্য করার লক্ষ্যে কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে নেওয়া এবং দায়ীদের বিচারের আওতায় আনা জরুরি।

নির্বাচন কমিশনের কৃত অপরাধ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আইনগত কাঠামোর অভাব সুস্পষ্ট। প্রথমত, *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, **১৯৭২**-এর ৯৩ ধারা নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা দায়েরের সুযোগ সীমিত করেছে। দ্বিতীয়ত, কমিশনের সম্ভাব্য অপরাধ বা অনিয়ম নির্ধারণের কোনো বিধান বা বিশেষ আইন প্রণয়ন করা হয়নি। ফলে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার ক্ষেত্রে আইনগত শূন্যতা বিদ্যমান। তৃতীয়ত, সংবিধানের **১১৮** অনুচ্ছেদের আওতায় অপসারণের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনারদের সুপ্রিমকোর্টের বিচারকদের মতো সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে এবং রাষ্ট্রপতি চাইলেই কেবল নির্বাচন কমিশনারদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ তদন্ত করা যাবে। ফলে নির্বাচন কমিশনারদের বিরুদ্ধে প্রতিকার প্রার্থনা করার পথ উন্মুক্ত নয়। চতুর্থত, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কমিশনারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান কেবল দায়িত্বে থাকা কমিশনারদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, মেয়াদ অবসানের পর কমিশনারদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হলে তা সুরাহার কোনো বিধান বর্তমানে নেই।

সুপারিশ

১. নির্বাচন কমিশনের মেয়াদকালে কমিশনারদের বিরুদ্ধে দায়িত্বে অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের অভিযোগ উঠলে তা সংবিধানের **১১৮** ও ৯৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে সুরাহা করার বিদ্যমান বিধান কার্যকর করা।

২. সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে এবং শপথ ভঙ্গ করলে কমিশনারদের মেয়াদ পরবর্তী সময়ে উত্থাপিত অভিযোগ একটি সংসদীয় কমিটি কর্তৃক তদন্ত করে সুপারিশসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণের বিধান করা।

৩. আরপিও'র ৯০(ক) অনুচ্ছেদ সংশোধনপূর্বক নির্বাচনি অপরাধের মামলা দায়েরের সময়সীমা রহিত করা।

(খ) নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধ

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, **১৯৭২**-এর ৮**১**(২), ৮৩, ৮৪, ৮৫ ধারায় কোনো রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার বা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত অন্য কোনো কর্মকর্তা বা করণিকদের বিভিন্ন নির্বাচনি অপরাধ ও শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন, ব্যালট পেপার নষ্ট করা, ভোট গোপনীয়তা ভঙ্গ করা, ভোটারদের প্রভাবিত করা বা বিরত রাখা ইত্যাদি অপরাধ হিসেবে গণ্য। এসব অপরাধের জন্য সর্বনিম্ন **১** বছর থেকে সর্বোচ্চ **১০** বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে। পাশাপাশি, ৮৬ ধারায় প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি কোনোভাবে নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহার করলে নির্বাচনি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিধান রয়েছে। তবে এসব অপরাধের বিচার প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের অনুমতি প্রয়োজন। ফলে অনেক ক্ষেত্রে এই আইনি বাধ্যবাধকতা নির্বাচনি অপরাধের যথাযথ বিচার প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করে।

৮৪ ধারায় দায়িত্ব পালনরত অন্য কর্মকর্তার পাশাপাশি পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের অপরাধ ও শাস্তির বিধান রয়েছে। এছাড়া ৮৭ক(২) ও ৮৭ক(৩) ধারায় কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোনো সদস্য তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে, নির্দেশ মান্য করতে ব্যর্থ হলে, অস্বীকার করলে বা অবহেলা করলে অদক্ষতা বা অসদাচরণের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিধান রয়েছে।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, **১৯৭২**-এ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত অপরাধসমূহ ও শাস্তির বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে:

ধারা	অপরাধ	শাস্তি
৮১ (২)	নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক ব্যালট পেপার-সহ নির্বাচনি কাগজপত্র নষ্ট বা বিকৃত করা	অনধিক **১০** বছর এবং অন্যূন ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড
৮৩	নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক ভোটের গোপনীয়তা রক্ষায় ব্যর্থতা	অনধিক ৫ বছর এবং অন্যূন **১** বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড
৮৪	নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক কর্তৃক ভোট প্রদানে প্ররোচিত, প্রভাবিত বা বিরত রাখা	অনধিক ৫ বছর এবং অন্যূন **১** বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড
৮৫	সরকারি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা	অনধিক **১** বছর কারাদণ্ড এবং অনধিক ৫,০০০ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড
৮৬	সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহার	অনধিক ৫ বছর এবং অন্যূন **১** বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড

বিদ্যমান বিধানের সীমাবদ্ধতা

নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ তদন্ত ও বিচারপ্রক্রিয়ায় বেশ কিছু আইনগত সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান, যা কার্যক্রমের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতাকে বাধাগ্রস্ত করে। *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২-এর ৮৯ ধারা অনুসারে নির্বাচন কমিশনের অনুমতি ছাড়া তাদের বিরুদ্ধে মামলা করার সুযোগ না থাকায় বিচার প্রক্রিয়া কমিশনের ইচ্ছাধীন হয়ে পড়ে। এছাড়া, অপরাধ তদন্তে কমিশনের অনুমতি বাধ্যতামূলক হলেও এর জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়নি। এই অবস্থায় কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া অনিয়ন্ত্রিত এবং কখনো কখনো পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে উঠতে পারে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অপরাধ করেও আইনের আওতার বাইরে থেকে যান।

সুপারিশ

(১) নির্বাচনি দায়িত্বপালনে ব্যর্থতার জন্য সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের অনুমতি প্রদানের ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ করা।

(২) কোন প্রেক্ষাপটে কিংবা কোন কোন মানদণ্ডে নির্বাচন কমিশন অনুমতি প্রদান করবেন বা করবেন না সেই বিষয়গুলো স্পষ্ট করে বিদ্যমান আইনে বিস্তারিত বিধানাবলি অন্তর্ভুক্ত করা।

(৩) *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২-এর ধারা ৮৯ অনুযায়ী নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক সংঘটিত নির্বাচনি অপরাধের তদন্ত বা অনুসন্ধানে আরোপিত আইনগত বাধা অপসারণ করা। এক্ষত্রে অপরাধ আমলে নেওয়া কিংবা নিয়মিত মামলা রুজু করার বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা ক্ষুণ্ন না করেও তদন্ত বা অনুসন্ধান করার আইনগত সুযোগ উন্মুক্ত রাখা। এরূপ অপরাধ তদন্ত বা অনুসন্ধানপূর্বক নির্বাচন কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ করার সুযোগ রাখতে হবে, যাতে নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট নির্বাচন শেষে বা পরিস্থিতি অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। তবে ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এ ধরনের তদন্ত/অনুসন্ধান বা প্রতিবেদন গোপনীয় রাখতে হবে।

(গ) সাধারণ ব্যক্তি বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, রাজনৈতিক সংগঠন বা অন্য কোনো ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত অপরাধ

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাধারণ ব্যক্তি, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, রাজনৈতিক সংগঠন বা অন্য কেউ কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ ও অনিয়ম তিনটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়।

প্রথমত, নির্বাচনি অপরাধ। *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২-এর ৭৩-৮৬ ধারায় দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ, বেআইনি আচরণ, ঘুষ গ্রহণ বা প্রদান, অন্যের নাম ধারণ করে ভোট প্রদান, অসঙ্গত প্রভাব বিস্তার এবং ভোটকেন্দ্রে প্রচারণার মতো অপরাধগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব অপরাধের শাস্তি সাধারণত অনধিক ৭ বছরের কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড, যা অপরাধের প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন হয়।

দ্বিতীয়ত, সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণবিধি লঙ্ঘন। ২০০৮ সালের আচরণবিধিতে চাঁদা প্রদান নিষিদ্ধ করা, প্রচারণায় নির্দিষ্ট নিয়ম মানার বাধ্যবাধকতা এবং ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার ইত্যাদি সংক্রান্ত বিধান রয়েছে। এসব বিধি লঙ্ঘন করলে অনধিক ৬ মাসের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড আরোপের বিধান রয়েছে। এ বিধানগুলো মূলত রাজনৈতিক দল, প্রার্থী ও তাদের সমর্থকের অনিয়ম নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কৃত কার্য বা বিচ্যুতির মাধ্যমে নির্বাচনে বাধা সৃষ্টি। *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২-এর ৮৪ক ধারায় উল্লেখিত ভীতি প্রদর্শন, বাধা প্রদান বা মিথ্যা তথ্য প্রকাশের কারণে নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটানোর অপরাধ অন্তর্ভুক্ত।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর নিম্নোক্ত অপরাধসমূহ যে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ:-

ধারা	অপরাধ	শাস্তি
৭৩	দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ	অনধিক ৭ বছর এবং অন্যূন ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড
৭৪	বেআইনি আচরণ	অনধিক ৭ বছর এবং অন্যূন ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড
৭৫	ঘুষ গ্রহণ বা প্রদান	৭৩(২খ) মতে, অনধিক ৭ বছর এবং অন্যূন ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড
৭৬	অন্যের নাম ধারণ করে ভোট প্রদান বা ব্যালট গ্রহণ	৭৩(২খ) মতে, অনধিক ৭ বছর এবং অন্যূন ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড
৭৭	অসঙ্গত প্রভাব বিস্তার	৭৩(২খ) মতে, অনধিক ৭ বছর এবং অন্যূন ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড

ধারা	অপরাধ	শাস্তি
৭৮	ভোটগ্রহণ শুরুর ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে বা পরে সভা, মিছিল ইত্যাদি	অনধিক ৭ বছর এবং অন্যূন ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড
৭৯	ভোটকেন্দ্রের চৌহদ্দির মধ্যে প্রচারণা, ভোট প্রার্থনা ইত্যাদি	অনধিক ৩ বছর এবং অন্যূন ৬ মাসের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড
৮০	ভোটগ্রহণের দিন মাইক্রোফোন, লাউড স্পিকার ইত্যাদি যন্ত্র ব্যবহার	অনধিক ৩ বছর এবং অন্যূন ৬ মাসের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড
৮১	ব্যালট পেপার-সহ নির্বাচনি কাগজপত্র নষ্ট বা বিকৃত করা	অনধিক ৭ বছর এবং অন্যূন ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড
৮২	ভোট প্রদানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা	অনধিক ৫ বছর এবং অন্যূন ১ বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮-এর ৩ হতে ১৬নং বিধিতে আচরণবিধি উল্লেখ করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

বিধি নং	বিধি-নিষেধ
৩	কোনো প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, অনুদান ইত্যাদি প্রদান নিষিদ্ধ
৩ক	নির্বাচন-পূর্ব সময়ে প্রকল্প অনুমোদন, ফলক উন্মোচন, ইত্যাদি নিষিদ্ধ
৪	সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলো ইত্যাদি ব্যবহার
৫	নির্বাচনি প্রচারণা (বিধি ৬ হতে বিধি ১৪ এর বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে)
৬	সভা সমিতি অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বাধা নিষেধ
৭	পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ
৮	যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ
৮ক	কোনো প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিলে বাধা প্রদান নিষেধ
৯	দেওয়াল লিখন সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ
৯ক	প্রতীক হিসেবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ
১০	গেইট বা তোরণ নির্মাণ, প্যান্ডেল বা ক্যাম্প স্থাপন ও আলোকসজ্জা সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ
১১	উস্কানিমূলক বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান বা উচ্ছৃঙ্খল আচরণ এবং বিস্ফোরক বহন সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ
১২	প্রচারণার সময়
১৩	মাইক ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ
১৪	সরকারি সুবিধাভোগী ব্যক্তিবর্গের নির্বাচনি প্রচারণা নিষেধ
১৫	নির্বাচনি ব্যয়সীমা সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ
১৬	ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার

বিদ্যমান বিধানের সীমাবদ্ধতা

(১) সাধারণ ব্যক্তিগণের অপরাধ বা অনিয়ম প্রতিরোধে একাধিক আইন কার্যকর থাকার ফলে একই ঘটনা হতে একাধিক অপরাধের উদ্ভব হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ফলে একই ব্যক্তি একাধিক আইনের আওতায় শাস্তি ভোগ করার আশঙ্কা তৈরি হয়।

(২) বিদ্যমান আইনসমূহ একাধিক বিচারিক কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রয়োগ করা হয়। নির্বাচনি অনুসন্ধান কমিটি কোনো অপরাধের শাস্তি প্রদান করতে পারে না, শুধু অনুসন্ধানপূর্বক প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করতে পারে। অন্যদিকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণ সাজা প্রদানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, ফলে দ্বৈত তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ার সম্ভাবনা তৈরি করে (দেখুন: নির্বাচনি বিরোধ ও বিচার ব্যবস্থাপনা)।

(৩) *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, **১৯৭২**-এর ৮৯ক অনুচ্ছেদের সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটদের ৮৪ক অনুচ্ছেদের অপরাধ আমলে নেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি, ফলে ৮৪ক অনুচ্ছেদের অপরাধের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ ব্যতীত মামলা করার আইনগত সুযোগ নেই।

(৪) *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, **১৯৭২**-এর ৯০ ধারা মতে, ৭৩ ও ৭৪ ধারায় উল্লেখিত অপরাধে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে সাধারণত অপরাধ সংঘটনের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে এবং হাইকোর্টের আদেশের ক্ষেত্রে আদেশের তারিখ হতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে মামলা দায়েরের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। উক্ত সময় অতিবাহিত হলে মামলা দায়ের করা যাবে না মর্মে আইনগত প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা হয়েছে। ফৌজদারি অপরাধের মামলা শুরুর ক্ষেত্রে কোনো তামাদী সময়সীমা নেই, এটি আইনের একটি প্রতিষ্ঠিত নীতি। কিন্তু *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, **১৯৭২**-এর ৯০ ধারা আইনের উক্ত প্রতিষ্ঠিত নীতির ব্যত্যয় ঘটিয়েছে।

(৫) *আরপিও* **১৯৭২**-এর ৭৩ ও ৭৪ ধারায় উল্লেখিত অপরাধের মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে সময়সীমা উল্লেখ করা হলেও মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কোনো সময়সীমা উল্লেখ করা হয়নি। ফলে বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘসূত্রতার শিকার হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

সুপারিশ

(১) একই বিচারিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুসন্ধান ও বিচারিক কার্য সম্পাদন জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি আইন সংশোধন করা।

(২) *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, **১৯৭২**-এর ৭৩ ও ৭৪ ধারায় বর্ণিত অপরাধের অভিযোগে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে ৯০ ধারায় যে সময়সীমা উল্লেখ করা হয়েছে তা ন্যায়বিচারের স্বার্থে প্রত্যাহার করা।

(৩) ৮৪ক ধারার অপরাধ ম্যাজিস্ট্রটদের আমলে নেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করা।

(৪) মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব পরিহার করার নিমিত্তে সময়সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া।

(৫) আচরণবিধি লঙ্ঘনের অর্থদণ্ডের পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

(৬) আচরণবিধিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণার বিধি যুক্ত করা।

১৩. নির্বাচনি বিরোধ ও বিচার ব্যবস্থাপনা

নির্বাচনকালীন সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধ, অনিয়ম এবং বিরোধ নির্বাচনের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। এসব অপরাধ ও অনিয়ম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বিলম্বিত বিচারিক প্রক্রিয়া প্রকারান্তরে এই অপরাধ ও অনিয়মকে উৎসাহিত করে। বিদ্যমান ব্যবস্থায় এসব নির্বাচনি অপরাধ ও অনিয়মসমূহ প্রচলিত বিচারব্যবস্থার সঙ্গে একীভূত করে নিষ্পত্তি করা হয়, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাচনের মেয়াদ শেষ হলেও নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত করে। এর ফলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্বাচনি অপরাধ, অনিয়ম ও বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত বিচারিক কাঠামোসমূহ নির্বাচনের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী পরিস্থিতি বিবেচনায় গঠিত হয়। তবে এগুলো কোনো একক আইনের আওতায় গঠিত হয় না। নির্বাচনের পূর্বে সংসদীয় সীমানা নির্ধারণ, ভোটকেন্দ্র স্থাপন, এবং প্রার্থীদের মনোনয়ন নিয়ে বিরোধ হলে হাইকোর্টে রিট আবেদন করা হয়। সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্টের এই এখতিয়ার নির্ধারিত।

নির্বাচনকালীন অপরাধ এবং আচরণবিধি লঙ্ঘনের ঘটনায় *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২ এবং ২০০৮ সালের আচরণবিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রয়েছে। নির্বাচন কমিশন এই সময়ে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এবং অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে এসব অপরাধের অনুসন্ধান ও বিচার সম্পন্ন করে। তবে, একাধিক সংস্থা এবং আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতা দেখা যায়, যা কার্যকারিতাকে ব্যাহত করে এবং নির্বাচনি অপরাধের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ বাধাগ্রস্ত হয়।

বিদ্যমান নির্বাচনি অভিযোগ ও বিচার ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল। কাঠামোর ভিন্নতার বিবেচনায় দুই ভাগ করে বিষয়টি আলোচনা করা হলো: (ক) নির্বাচন-পূর্ব বিচারিক বিষয়-বস্তু ও বিচারিক কাঠামো এবং (খ) নির্বাচন-পরবর্তী বিচারিক বিষয়বস্তু ও বিচারিক কাঠামো।

(ক) নির্বাচন-পূর্ব বিচারিক বিষয়বস্তু ও বিচারিক কাঠামো

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে চারটি পৃথক বিচারিক সত্তা ও প্রতিষ্ঠান কাজ করে।

১. হাইকোর্ট: নির্বাচনের পূর্ববর্তী সময়ে সীমানা নির্ধারণ, ভোটার তালিকা, প্রার্থীর মনোনয়ন নিয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হলে হাইকোর্টে রিট পিটিশনের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়।

২. নির্বাচনি অনুসন্ধান কমিটি: আরপিও'র ৯১ক ধারার ক্ষমতাবলে নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রতিটি সংসদীয় আসনের জন্য একজন যুগ্ম জেলা জজ বা সিনিয়র সহকারী জজের সমন্বয়ে একটি করে অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি নির্বাচনকালীন অপরাধ ও আচরণবিধি লঙ্ঘনের অনিয়ম অনুসন্ধান করে অনুসন্ধানের তিন দিনের মধ্যে এ ব্যাপারে কমিশনের করণীয় বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তাব বা সুপারিশসহ প্রতিবেদন কমিশনে প্রেরণ করে। নির্বাচন কমিশন জরিমানা আরোপ কিংবা কোনো প্রার্থী গুরুতর অপরাধ বা আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল বা তার বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা করার নির্দেশ প্রদান করতে পারে। তবে কমিশন কোনো আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করেই বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে পারে।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সারাদেশের ৩০০ নির্বাচনি এলাকায় ৩০০টি নির্বাচনি অনুসন্ধান কমিটি মোট ৭৫৭টি অভিযোগ অনুসন্ধানপূর্বক প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করে। ৭৫৭টি অনুসন্ধান প্রতিবেদনের মধ্যে ৯১টি অনুসন্ধান প্রতিবেদনে নির্বাচন কমিশন বরাবর বিভিন্ন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশকৃত ৯১টি অভিযোগের মধ্যে ৬১টি অভিযোগের বিষয়ে মামলা দায়ের করার জন্য নির্বাচন কমিশন নির্দেশ প্রদান করে।

৩. জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট: নির্বাচনি অপরাধের দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণ নিয়োগপ্রাপ্ত হন। নির্বাচনের দুই দিন আগে থেকে দুই দিন পর পর্যন্ত এ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণ দায়িত্ব পালন করেন। সংক্ষিপ্ত বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁরা নির্বাচনি অপরাধের ক্ষেত্রে সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড দিতে পারেন। সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচারের ক্ষেত্রে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণ ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি অনুসরণ করেন – অভিযোগ প্রাপ্তির পর সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করে অভিযোগের বিচার-নিষ্পত্তি করা হয়। এক্ষেত্রে অভিযোগের কোনো তদন্ত বা অনুসন্ধান হয় না, বরং সরাসরি অভিযোগ আমলে নিয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণপূর্বক বিচার-নিষ্পত্তি করা হয়। জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণ সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচার করে সাজা প্রদান করলে প্রচলিত আইনানুযায়ী সাজার বিরুদ্ধে দায়রা জজের নিকট আপিল করা যায়।

৪. নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট: আচরণবিধি লঙ্ঘনের তাৎক্ষণিক বিচার করার জন্য *মোবাইল কোর্ট আইন*, ২০০৯-এর অধীনে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়। নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের জন্য তারা জরিমানা বা কারাদণ্ড প্রদান করতে পারেন। আচরণবিধি দেখার পাশাপাশি দায়িত্ব পাওয়া নির্বাচনি এলাকার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ প্রতিরোধ, মোবাইল কোর্ট এবং স্ট্রাইকিং ফোর্স বিশেষ করে বিজিবি, কোস্টগার্ড ও সশস্ত্র বাহিনীর টিমকে দিক-নির্দেশনা প্রদানের কাজও তারা করেন। আচরণবিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করতে নির্বাচনের পূর্বে প্রায় ১০/১৫ দিন থেকে নির্বাচনের দুই দিন পর পর্যন্ত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ দায়িত্ব পালন করেন।

কোনো ব্যক্তির প্রদত্ত অভিযোগের ভিত্তিতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিচার করতে পারেন না। শুধু নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে সংঘটিত হলে বা উদ্ঘাটিত হলে এরূপ লঙ্ঘনের বিচার তারা করতে পারেন। তবে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আচরণবিধি লঙ্ঘনকারী অপরাধ স্বীকার করলে কেবল নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দণ্ড আরোপ করতে পারেন। *মোবাইল কোর্ট আইন*, ২০০৯ অনুযায়ী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের দণ্ডের বিরুদ্ধে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আপিল এবং দায়রা জজের নিকট রিভিশন দায়ের করা যায়।

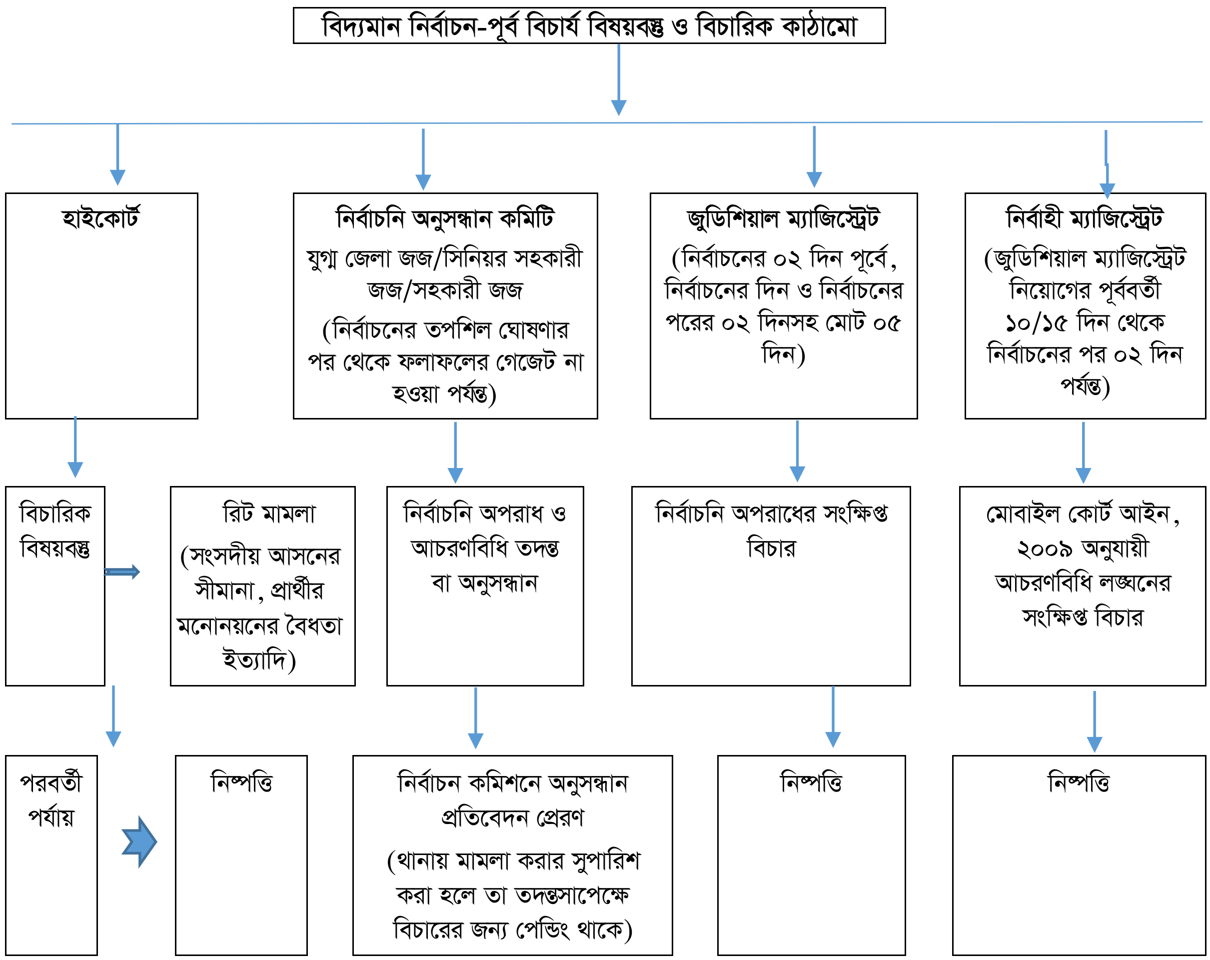

নির্বাচনি অপরাধ ও আচরণবিধি লঙ্ঘনের অনুসন্ধান ও বিচার প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতাসমূহ

নির্বাচনি অপরাধ এবং আচরণবিধি লঙ্ঘনের অনুসন্ধান ও বিচার প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যার ফলে সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়। এর সীমাবদ্ধতাগুলো হলো:

১. নির্বাচনি অনুসন্ধান কমিটি একটি বিচারিক সত্তা (Judicial Body) হলেও তাদের কোনো বিচারিক এখতিয়ার নেই। এই কমিটি কেবল অনুসন্ধান করে নির্বাচন কমিশন বরাবর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করতে পারে, কিন্তু সরাসরি কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না।

২. নির্বাচনি অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাচন কমিশনের ওপর কোনো বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না। ফলে অনুসন্ধান প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নির্বাচন কমিশনের বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল।

৩. অনুসন্ধান প্রতিবেদনের ভিত্তিতে যদি মামলা রুজু করা হয়, তবে তা প্রচলিত আইন অনুযায়ী পুনরায় তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। এর ফলে নির্বাচনি অপরাধ বা আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতা দেখা দেয়।

৪. নির্বাচনি অনুসন্ধান কমিটি কার্যকর থাকাকালীন একই সময়ে নির্বাচনি অপরাধ এবং আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিচার করতে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পৃথকভাবে দায়িত্ব পালন করেন। এই সমান্তরাল ব্যবস্থা কার্যক্রমে সমন্বয়হীনতা সৃষ্টি করে।

৫. নির্বাচনি অপরাধের ক্ষেত্রে থানায় নিয়মিত মামলা দায়ের করতে আইনত কোনো বাধা নেই। ফলে একই অপরাধের অভিযোগ একদিকে নির্বাচনি অনুসন্ধান কমিটির অধীনে এবং অন্যদিকে পুলিশের অধীনে তদন্ত চলতে পারে।

৬. নির্বাচনি অপরাধ এবং আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয়ে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশের গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কিত কোনো তথ্য নির্বাচন কমিশনে পাঠানো হয় না। ফলে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে সার্বিক পরিস্থিতি মনিটর করা কঠিন হয়ে পড়ে।

৭. *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২-এর ৮৭ ধারা অনুযায়ী, পুলিশ প্রতিরোধমূলক ক্ষমতা পেলেও এই ক্ষমতার প্রয়োগে প্রায়ই শৈথিল্য দেখা যায়। অন্যদিকে, নির্বাচনি অনুসন্ধান কমিটির প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা নেই।

৮. নির্বাচনি অনুসন্ধান কমিটির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতিগত আইন নেই। কখনো ফৌজদারি কার্যবিধি, কখনো দেওয়ানি কার্যবিধির বিভিন্ন ধারা অনুসরণ করে কমিটি কাজ করে, যা কার্যক্রম পরিচালনায় জটিলতা সৃষ্টি করে।

৯. নির্বাচনি কর্মকর্তাদের কোনো অপরাধের ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে নেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনের লিখিত আদেশ পালন করা বাধ্যতামূলক। এই প্রক্রিয়া কার্যক্রমে বিলম্ব সৃষ্টি করে এবং এটি জবাবদিহিতার নীতির পরিপন্থি।

১০. নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দোষ স্বীকারের ভিত্তিতে শাস্তি দিতে পারেন, তবে অভিযোগ অস্বীকার করা হলে তা নিয়মিত আদালতে প্রেরণ করা হয়। এ ধরনের মামলাগুলো প্রচলিত আদালতের মামলাজটের কারণে দীর্ঘসূত্রতার মধ্যে পড়ে যায়।

১১. বিচারিক কার্যক্রমে একাধিক কর্তৃপক্ষ জড়িত থাকলেও কেন্দ্রীয়ভাবে নির্বাচন কমিশনে তাদের গৃহীত কার্যক্রমের তথ্য-উপাত্ত পাঠানো হয় না। ফলে নির্বাচনকালীন অপরাধ বা অনিয়মের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

সুপারিশ

১. নির্বাচনি অনুসন্ধান কমিটিকে কেবল অনুসন্ধানের ক্ষমতা নয়, বরং বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষমতাও প্রদান করা। এই উদ্দেশ্যে কমিটির নাম পরিবর্তন করে 'নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি' (Electoral Enquiry and Adjudication Committee) করা। নির্বাচনি অপরাধ বিচারের জন্য এই কমিটিকে একচ্ছত্র এখতিয়ার (Exclusive Jurisdiction) প্রদান করা।

২. 'নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি'র জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা নিয়োগ করা। এই কমিটির সদস্য হিসেবে বিশেষভাবে যুগ্ম জেলা জজ, সিনিয়র সহকারী জজ এবং সহকারী জজ পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের মধ্যে থেকে যারা ম্যাজিস্ট্রেসিতে কর্মরত তাদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিয়োগ করা।

৩. পৃথকভাবে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ না করে প্রয়োজনীয়তা কমাতে 'নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি'কে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯০ ধারায় অপরাধ আমলে নেওয়া এবং সংক্ষিপ্ত বিচার পদ্ধতিতে অপরাধ বিচার করার ক্ষমতা অর্পণ করা এবং এ কমিটির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

৪. কমিটির কার্যক্রম তদারকির জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের 'নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কার্যক্রম তদারকি কমিটি' গঠন করা। এ কমিটির সভাপতি হিসেবে একজন নির্বাচন কমিশনার এবং সদস্য হিসেবে নির্বাচন কমিশন ও বিচার বিভাগীয় সিনিয়র কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত করা।

৫. কার্যকালীন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য এই কমিটিগুলোকে প্রশাসনিকভাবে নির্বাচন কমিশনের আওতায় রাখা। তবে বিচারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদেরকে স্বাধীনতা প্রদান করা।

৬. নির্বাচনকালীন অপরাধের অনুসন্ধান ও বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে চূড়ান্ত ফলাফল গেজেটে প্রকাশের পর এক সপ্তাহ পর্যন্ত এই কমিটির কার্যক্রম সক্রিয় রাখা। এই সময়ের মধ্যে কমিটির কার্যক্রম সম্পন্ন করার আইনগত বাধ্যবাধকতা আরোপ করা।

৭. অনুসন্ধান ও বিচার প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিদ্যমান আইনসমূহ সমন্বয় করে এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো নতুন আইনে অন্তর্ভুক্ত করে একটি পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতিগত আইন (Comprehensive Procedural Law) প্রণয়ন করা।

৮. কমিটিকে স্ব-প্রণোদিতভাবে কিংবা ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা নির্বাচন কমিশনের দেওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে অনুসন্ধানের বাইরেও অন্যান্য কার্যক্রম (যেমন, ব্যানার, পোস্টার, তোরণ অপসারণ ইত্যাদি) পরিচালনার ক্ষমতা প্রদান করা। একইসঙ্গে অন্য আদালতে মামলা দায়ের বন্ধ রাখার নীতিমালা তৈরি করা।

৯. নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির রায়, আদেশ বা পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আপিলের সুযোগ নির্বাচন আইনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা। আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে জেলা ও দায়রা জজ বা মহানগর দায়রা জজকে এখতিয়ার প্রদান করা।

১০. নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের গৃহীত কার্যক্রমের তথ্যাদি প্রতিটি জেলার অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করা। পাশাপাশি নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের জরিমানা ও কারাদণ্ড প্রদানের ক্ষমতার পুনর্বিবেচনা করে আপিল ব্যবস্থা সহজ করতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা।

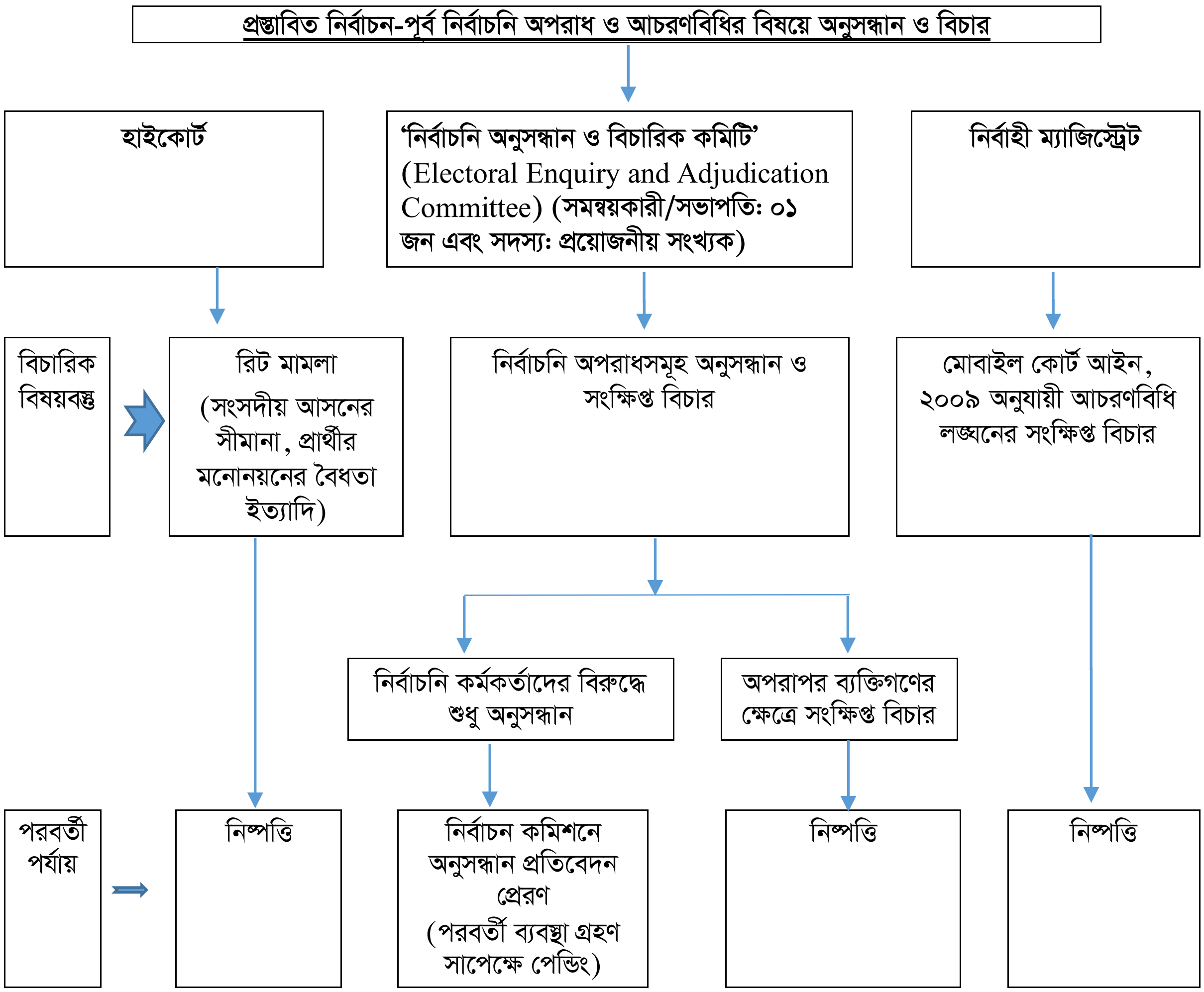

(খ) নির্বাচন-পরবর্তী বিচারিক বিষয়বস্তু ও বিচারিক কাঠামো

বিদ্যমান ব্যবস্থায় নির্বাচন পরবর্তী সময়ে উদ্ভূত নির্বাচনি বিরোধসমূহ নিষ্পত্তির একমাত্র বিচারিক ফোরাম হলো হাইকোর্ট। জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২-এর অধ্যায়-৫ (ধারা ৪৯-৭২) এর আওতায় উদ্ভূত নির্বাচনি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য হাইকোর্ট বিভাগে প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচনি দরখাস্ত দাখিলের মাধ্যমে মামলা দায়ের করতে হয়। হাইকোর্ট *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২-এর বিধানাবলি অনুসরণ করে সংসদ নির্বাচনের পরবর্তীকালে উদ্ভূত নির্বাচনি বিরোধসমূহ নিষ্পত্তি করেন। উল্লেখ্য যে, নির্বাচন পরবর্তী বিরোধের সূচনা হয় সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল গেজেটে প্রকাশের পর থেকে। সুতরাং সংসদ নির্বাচনের ফলাফল চূড়ান্তভাবে গেজেটে প্রকাশ হওয়ার পূর্বে উদ্ভূত কোনো বিরোধ নির্বাচনি বিরোধ নয়। নির্বাচনি বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে হাইকোর্ট একটি আদি এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত। সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচনি বিরোধ নিষ্পত্তির একমাত্র আপিল কর্তৃপক্ষ হচ্ছেন বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ।

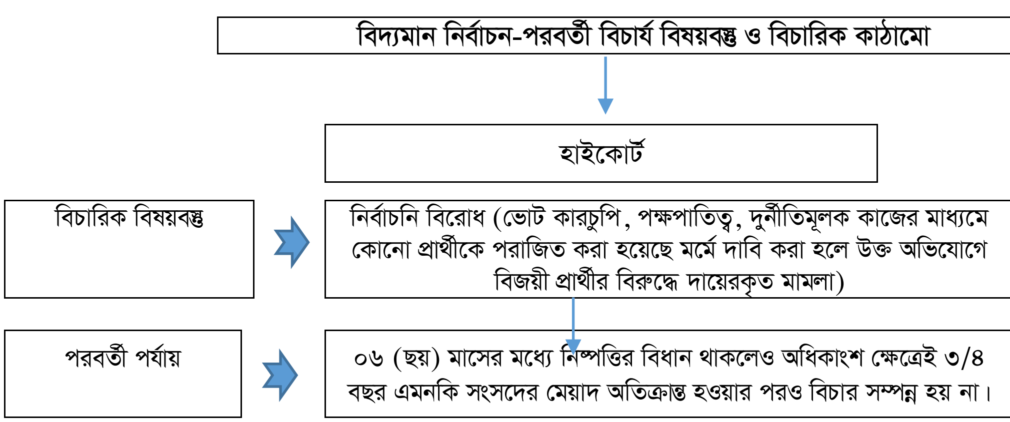

নির্বাচন পরবর্তী 'নির্বাচনি বিরোধ' নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা

নির্বাচনি বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার বিদ্যমান ব্যবস্থার কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। *গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন*, **১৯৮১**-এর পূর্বে, সংসদ নির্বাচনের নির্বাচনি বিরোধসমূহ নিষ্পত্তি করার জন্য জেলা জজদের নিয়ে জেলা পর্যায়ে গঠিত ট্রাইব্যুনালের আদি এখতিয়ার ছিল, যা বর্তমানে প্রয়োগ হচ্ছে না। *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, **১৯৭২**-এর ধারা ৫৭(৬) অনুযায়ী, নির্বাচনি মামলা নিষ্পত্তি করতে ৬ মাসের সময়সীমা নির্ধারণ করলেও বাস্তবে বছরের পর বছর এসব নির্বাচনি মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ার নজির রয়েছে।

সুপারিশ

১. হাইকোর্ট বিভাগে নির্বাচনি মামলার চাপ কমাতে শুধু নির্বাচনি বিরোধ সংশ্লিষ্ট মামলা নিষ্পত্তির জন্য আগের মতো জেলা পর্যায়ে, সেশান কোর্টে নির্দিষ্ট 'সংসদীয় নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল' (Parliamentary Election Tribunal) স্থাপন করা। এর মাধ্যমে সাক্ষী-প্রমাণ মফস্বল থেকে হাইকোর্টে বিচারের জন্য ঢাকায় আনার ঝামেলা এড়ানো এবং মামলার খরচ কমানো সম্ভব হবে।

২. 'সংসদীয় নির্বাচন ট্রাইব্যুনালে'র রায় বা আদেশের বিরুদ্ধে মাননীয় হাইকোর্টে প্রতিকার প্রার্থনা করার সুযোগ উন্মুক্ত রাখা।

৩. প্রতিটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরবর্তী ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত সময়ের মধ্যে 'সংসদীয় নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল'-এর কার্যকাল নির্ধারণ করা। এই সময়ের মধ্যে ট্রাইব্যুনালকে তার যাবতীয় কার্যক্রম শেষ করার জন্য আইনগত বাধ্যবাধকতা আরোপ করা। যদি মামলার সংখ্যা বা পরিস্থিতি অনুকূল না হয়, তবে মেয়াদ বাড়ানোর সুযোগ রাখা যেতে পারে।

নির্বাচনি সহিংসতা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রভাব জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ব্যাপকভাবে পড়ে। এর ফলে নির্বাচনি সহিংসতা দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে নাজুক করে তোলে এবং জনজীবনে নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি করে। এটি আইনের শাসন এবং মানবাধিকারের প্রতি একটি গুরুতর হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। নির্বাচনি সহিংসতার প্রভাব শুধু আইনশৃঙ্খলা বা সামাজিক জীবনে সীমাবদ্ধ নয়, এটি দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এছাড়াও নির্বাচনি সহিংসতা বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে চরমভাবে ক্ষুণ্ন করে।

সহিংসতা নির্বাচন-পূর্ব, নির্বাচনকালীন এবং নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে নির্বাচনি সহিংসতাকে কেন্দ্র করে দায়েরকৃত মামলাগুলো দীর্ঘসূত্রতায় পড়ে এবং নিরপরাধ ব্যক্তিরা যেমন হয়রানির শিকার হয়, তেমনি অপরাধীরা পার পেয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়।

নির্বাচনি সহিংসতা নিয়ন্ত্রণে সুপারিশসমূহ

১. প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার সংস্কার একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। তাই, নির্বাচনি সহিংসতার মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য অগ্রাধিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। তাই জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ৬ মাস পূর্ব থেকে ৬ মাস পর পর্যন্ত নির্বাচনি সহিংসতার মামলাগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা।

২. সাময়িকভাবে বিশেষ নির্বাচনি অপরাধ সেল (Election Offense Resolution Cell) গঠন করা। এই সেল শুধু নির্বাচনি সহিংসতা সংশ্লিষ্ট মামলা তদন্ত ও নিষ্পত্তির জন্য কাজ করবে।

৩. এই বিশেষ সেলগুলোতে (Special Electoral Crime cell) অপেক্ষাকৃত তরুণ ও উদ্যমী বিজ্ঞ আইনজীবীগণকে নিয়োজিত করা। এরূপ বিশেষ সেলে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের জন্য প্র্যাকটিসের বয়স ০৩ (তিন) বছর এবং দায়রা আদালতের জন্য সাধারণভাবে ০৫ (পাঁচ) বছর নির্ধারণ করা। তবে নির্বাচনি সহিংসতাকালে হত্যা, ধর্ষণ কিংবা অপর কোনো গুরুতর অপরাধের বিচারের জন্য অভিজ্ঞ প্রসিকিউটর নিয়োগের ব্যবস্থা রাখা।

৪. ম্যাজিস্ট্রেট আদালতসমূহে মামলার চাপ বিবেচনায় পর্যাপ্ত সংখ্যক ম্যাজিস্ট্রেট আদালতকে নির্বাচনি সহিংসতার মামলা বিচারের জন্য নিয়োজিত করা।

১৪. নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও গণমাধ্যম নীতিমালা

নির্বাচনের মানোন্নয়নের জন্য নির্বাচন পর্যবেক্ষণ অন্যতম একটি হাতিয়ার। পর্যবেক্ষকরা নির্বাচনি প্রক্রিয়ার প্রতি জনগণের আস্থা তৈরি করতে সহায়তা করে। পর্যবেক্ষণ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দল, প্রার্থী এবং ভোটারদের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিতে সহায়তা করতে পারে। এটি একটি নির্বাচনি প্রক্রিয়ার ত্রুটি বা দুর্বল দিক সংশোধনের মাধ্যমে নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারে।

স্বীকৃত পর্যবেক্ষকদের মাধ্যমে কোনো রকম হস্তক্ষেপ ছাড়া পদ্ধতিগত উপায়ে নির্বাচনি প্রক্রিয়া সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক মূল্যায়নই নির্বাচন পর্যবেক্ষণ। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি নির্বাচন আইন ও বিধি অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কি না; রাজনৈতিক দল, প্রার্থী, পোলিং এজেন্ট, নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী ও ভোটারগণ বিধি বহির্ভূত কোনো কাজ করছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করাই পর্যবেক্ষকের প্রধান কাজ। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রের পরিবেশ, ভোটগ্রহণ ও ভোট গণনা-পর্ব সার্বিকভাবে পর্যবেক্ষণ করে নির্বাচনে জনগণের যথাযথ ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটছে কি না তা নিরপেক্ষতা ও সততার সঙ্গে মূল্যায়ন করা নির্বাচন পর্যবেক্ষকের অন্যতম দায়িত্ব।

সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানে পর্যবেক্ষকদের ন্যায় গণমাধ্যমও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। গণতান্ত্রিক নির্বাচনে গণমাধ্যমই ভোটারদের তথ্যের প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে। নির্বাচন-সংক্রান্ত যে কোনো বিষয় সম্পর্কে যেমন, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলের ইশতেহার প্রচার, জনগণ ও সংসদীয় এলাকার প্রতি প্রার্থীদের অঙ্গীকার, নির্বাচনি প্রচারণা, সংহিংসতা, আচরণবিধি ভঙ্গ ইত্যাদি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন রাখতে এবং জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভোট প্রদানে তাদের চিন্তাধারার ওপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। গণমাধ্যম নির্বাচনের যে কোনো বিষয় লঙ্ঘন বা অসৎ আচরণের অভিযোগ প্রতিরোধ এবং প্রতিকারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। ভোটগ্রহণ ও গণনার সময় গণমাধ্যমের উপস্থিতি নির্বাচনি জালিয়াাতি রোধ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। গণমাধ্যম শুধু নির্বাচনের নানা বিষয়ই তুলে ধরে না, বরং নির্বাচনে দুর্নীতি, অনিয়ম রোধ করার পাশাপাশি যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে জনগণকে সজাগ করে৷ ভোটার তথা জনগণ, প্রার্থী ও রাজনৈতিক দল, নির্বাচকমণ্ডলী ও নির্বাচনি মাঠের সকল অংশীজনদের চোখ-কান হিসেবে ভূমিকা পালন করে গণমাধ্যম। তদের নজরদারি ভূমিকা নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু করতে সহায়তা করে। তাই স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে গণমাধ্যমকে কাজ করতে দেওয়ার জন্য তাদেরকে ভোট কেন্দ্র এবং গণনা কেন্দ্রে নির্বিঘ্নে প্রবেশাধিকার দেওয়া ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে কাজ করতে দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

পর্যবেক্ষণের বিষয়সমূহ

নির্বাচন পর্যবেক্ষণে বিশ্বব্যাপী প্রাক্-নির্বাচন কাল, নির্বাচন-কাল এবং নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে নির্বাচনের সঙ্গে সম্পর্কিত যে কোনো বিষয় পর্যবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। বিশ্বব্যাপী স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের নেটওয়ার্ক (Global Network of Domestic Election Monitors) একটি নির্বাচনের প্রাক্-নির্বাচন কাল, নির্বাচন-কাল এবং নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করার কথা উল্লেখ করেছে।[৭৯]

১. আইনি কাঠামো, সাংবিধানিক উপাদান, অন্যান্য আইন, আন্তর্জাতিক চুক্তির বাধ্যবাধকতা এবং নির্বাচন-সংক্রান্ত অন্যান্য আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ও বিধি-বিধানের বিষয়বস্তু ও এগুলোর বাস্তবায়ন;
২. নির্বাচনি প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকাণ্ডের নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা;
৩. নির্বাচন পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংস্থার সদস্যগণের নিয়োগ;
৪. নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ;
৫. রাজনৈতিক দলসমূহের নিবন্ধন, প্রার্থী ও গণভোটের উদ্যোগ এবং তাদের নির্বাচনের যোগ্যতা;
৬. রাজনৈতিক দল কর্তৃক নির্বাচনি প্রার্থী, আচরণবিধির প্রচারণা ও তা মেনে চলার মতো বিষয়সংক্রান্ত আইনি বিধি-বিধান ও অন্যান্য বাধ্যবাধকতা প্রতিপালন;
৭. রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর অর্থায়ন ও প্রচারণার ব্যয়ের প্রক্রিয়া;
৮. নির্বাচনি প্রার্থীকে অবৈধ আর্থিক সহযোগিতা, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের পক্ষপাতিত্ব বা অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের ঘটনা;

[79] Declaration of Global Principles for Nonpartisan Election Observation and Monitoring by Citizen Organizations (Available at: Declaration of Global Principles for Nonpartisan Election Observation and Monitoring by Citizen Organizations | Global Network of Domestic Election Monitors)

৯. নির্দিষ্ট কোনো দল, প্রার্থী বা গণভোটের উদ্যোগের সমর্থক বা বিরোধিতাকারীর সুবিধার জন্য রাষ্ট্রীয় সম্পদের ব্যবহার ও রাজনীতি-নিরপেক্ষ প্রয়োগ ও অবৈধ ব্যবহারসহ নির্বাচনে রাষ্ট্রীয় সম্পদের সকল প্রকার ব্যবহার;

১০. নির্বাচনি প্রেক্ষাপটে দুর্নীতি দমন-সংক্রান্ত আইন ও এসব আইনের প্রয়োগ;

১১. প্রশাসনিক বিষয়ে নিরাপত্তা বাহিনী ও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আচরণ;

১২. রাজনৈতিক দল, প্রার্থী এবং গণভোটের উদ্যোগের সমর্থক ও বিরোধিতাকারীর জন্য গণযোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের সুযোগসংক্রান্ত শর্ত ও নিয়মসমূহ;

১৩. নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারীদের প্রাসঙ্গিক বিষয় প্রচারের মাত্রা/পরিমাণ ও গুণগত মান এবং নির্বাচন বা গণভোটে ভোটারদের পছন্দসংক্রান্ত বিষয় প্রচারের ক্ষেত্রে তদারকিসহ রাজনৈতিক দল, প্রার্থী এবং গণভোটের উদ্যোগের সমর্থক ও বিরোধিতাকারীর বিষয়ে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সরকারি বা বেসরকারি গণমাধ্যম কর্তৃক প্রতিবেদনের শর্ত ও নিয়মসমূহ;

১৪. সম্ভাব্য ভোটারগণের সমর্থন আদায়ের জন্য রাজনৈতিক দল, প্রার্থী এবং গণভোটের উদ্যোগের সমর্থক ও বিরোধিতাকারীর স্বাধীনভাবে প্রচারণার সক্ষমতা;

১৫. আদিবাসী ও ঐতিহ্যগতভাবে অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ সম্ভাব্য ভোটারদের সঠিক ও পর্যাপ্ত তথ্য চাওয়া ও পাওয়ার সক্ষমতা, যার ভিত্তিতে তারা নির্বাচনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন;

১৬. ভোট প্রদানের জন্য যোগ্য ব্যক্তির নিবন্ধন এবং ভোটার নিবন্ধনবহি ও ভোটার তালিকায় বর্ণিত প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তির সক্ষমতা;

১৭. সম্ভাব্য ভোটার, নির্বাচিত হতে ইচ্ছুক প্রার্থী এবং তাদের সমর্থকদের সহিংসতা, ভীতিপ্রদর্শন, উৎকোচ প্রদান ও পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার কারণে প্রতিশোধস্পৃহা থেকে বেঁচে থাকার সক্ষমতা এবং পুলিশ, অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী, আইনজীবী ও আদালত কর্তৃক সমান আইনি সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে কি না;

১৮. কোথায়, কখন, কীভাবে এবং কেন নিবন্ধন করতে হবে এসকল বিষয়সহ ভোটার শিক্ষার যথার্থতা, বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় সংস্থা কর্তৃক, এবং ভোটের গোপনীয়তা রক্ষার নিশ্চয়তা;

১৯. ভোটগ্রহণের স্থানের উপযুক্ততা এবং সেগুলোর সুবিধার যথার্থতা;

২০. ব্যালট ও অন্যান্য সংবেদনশীল নির্বাচনি উপকরণ উৎপাদন এবং সেগুলো ভোটকেন্দ্রে বিতরণ, সংগ্রহকরণ ও সংরক্ষণ;

২১. ভোটার নিবন্ধন বহি তৈরি ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, ইলেক্ট্রনিক ভোটিং, ফলাফল হিসাব এবং অন্যান্য সংবেদনশীল নির্বাচনি প্রক্রিয়াসংক্রান্ত নীতি-নির্ধারণ প্রক্রিয়া ও নীতি বাস্তবায়নের প্রতিটি পদক্ষেপ;

২২. নির্বাচনি প্রযুক্তির টেকসইগত দিক, যথার্থতা ও ব্যয় সাশ্রয়;

২৩. সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা এবং অশুদ্ধতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত সুরক্ষাসহ ভোটগ্রহণ, সংখ্যালঘু ভাষা অন্তর্ভুক্তকরণসহ, গণনা, ফলাফল তৈরি ও ঘোষণা;

২৪. নাগরিক, সম্ভাব্য ভোটার, নির্বাচনি প্রার্থী এবং গণভোটের সমর্থক বা বিরোধিতাকারীর নির্বাচন-সংক্রান্ত অভিযোগ ও প্রশ্নের বিষয়ে কার্যধারা ও প্রক্রিয়া গ্রহণ এবং নির্বাচনি অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কার্যকর প্রতিকারের বিধান;

২৫. নির্বাচনি অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কিত আইন ও অন্যান্য বিধি-বিধান লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক, দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যধারা গ্রহণ এবং যথাযথ শাস্তির বিধান;

২৬. নির্বাচনের পূর্বে ও পরে নির্বাচনি আইন, বিধি, রেগুলেশন ও প্রশাসনিক কার্যপদ্ধতির প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের প্রক্রিয়া গ্রহণ।

বাংলাদেশে পেশাদার পর্যবেক্ষক ও পর্যবেক্ষণ প্রতিষ্ঠান না থাকায় উপরোক্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে কখনও ব্যাপকভিত্তিক পর্যবেক্ষণ করা হয়নি। দুই-একটি প্রতিষ্ঠান মাঝে মাঝে সীমিত আকারে দীর্ঘমেয়াদি পর্যবেক্ষণ করলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের পর্যবেক্ষণ মূলত নির্বাচন দিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

বাংলাদেশের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালা

১৯৯১ সালের পুর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ছিল না বললেই চলে। ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রথমবারের মত ব্যাপক সংখ্যক দেশি ও বিদেশি পর্যবেক্ষক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে। ২০০১ সালের নির্বাচনের আগে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ-১৯৭২ সংশোধন করে ৯১(গ)(১) ধারা সংযুক্ত করা হয়, যাতে বলা হয়, কমিশন দেশি বা বিদেশি এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে লিখিতভাবে নির্বাচনি পর্যবেক্ষক হিসেবে অনুমতি প্রদান করতে পারিবেন, যিনি কোনোভাবেই কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সহিত সংযুক্ত বা সম্পর্কিত নহেন এবং যিনি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কোনো বিশেষ রাজনৈতিক ভাবাদর্শ, মতবাদ বা লক্ষ্যের প্রতি বা কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ইশতেহার, কর্মসূচি, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হিসেবে পরিচিত নহেন। এই ধারার আলোকে কমিশন স্থানীয় এবং বিদেশি পর্যবেক্ষকদের জন্য আলাদা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন করে, যা ২০২৪ সাল পর্যন্ত একাধিকবার সংশোধন করা হয়।

অধিকন্তু, বাংলাদেশে আইনের মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদি পর্যবেক্ষণের স্বীকৃতি ও নীতিমালা থাকলেও দীর্ঘমেয়াদি পর্যবেক্ষণের কথা কোথাও বলা নেই বা এতদ্বসংক্রান্ত কোনো নীতিমালাও নেই। অতীতে যেসব প্রতিষ্ঠান দীর্ঘমেয়াদি পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে, তারা নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে সরাসরি কোনো বাধা না পেলেও স্থানীয়ভাবে কিছু প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছে।

সারণি: বাংলাদেশে বিভিন্ন নির্বাচনে পর্যবেক্ষকের সংখ্যা

নির্বাচন	আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকের সংখ্যা	স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের সংখ্যা
পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-১৯৯১	৫৯	০
সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-১৯৯৬	২৬৫	৪৫,০০০
অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০০১	২২৫	২,১৮,০০০
নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০০৮	৫৯৩	১৫৯,১১৩
দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০১৪	৪	৮,৮৭৪
একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০১৮	৩৮	২৫,৯০০
দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০২৪	১২৪	২০,৭৭৩

উৎস: মোঃ আব্দুল আলীম (২০২৫): Advancing Electoral Governance in Bangladesh, Cambridge Scholars Publishing: UK

বাংলাদেশে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা

(ক) স্থানীয় পর্যবেক্ষণ:

বাংলাদেশে পেশাদার কোনো নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা নেই। যে স্থানীয় সংস্থাগুলো নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা পর্যবেক্ষণকে সাময়িক বা নির্বাচনকালীন একটি কাজ হিসেবে বিবেচনা করে। ফলে পৃথিবীর অনেক দেশের (যেমন, ইন্দোনেশিয়া) ন্যায় বাংলাদেশের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ এখন পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারেনি। ফেমা ২০০৫-২০১৮ পর্যন্ত সময়কালে কম-বেশি ৩০টির মত স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপের (ইডব্লিউজি) ব্যানারে নির্বাচন-সংক্রান্ত অন্যান্য কাজের সঙ্গে নির্বাচন পর্যবেক্ষণকে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে চেষ্টা করে। কিন্তু তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের চাপ, সরকারের পক্ষে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার অযাচিত হস্তক্ষেপ, এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত তহবিল বাতিল এবং সর্বোপরি উপর্যোক্ত বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের যথাযথ পদক্ষেপের অপারগতার কারণে ইডব্লিউজি নির্বাচন পর্যবেক্ষণকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া তো দূরের কথা তাদের কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়।

২০১৮ এবং ২০২৪ সালের নির্বাচনের পূর্বে সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে ভুয়া সংগঠনের ব্যানারে বিদেশি 'পর্যবেক্ষকদের' দিয়ে নির্বাচনের বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। ২০২৪ সালে ইলেকশন মনিটরিং ফোরাম (ইএমএফ) নামের একটি সংগঠন চার বিদেশিকে দেশে এনে নির্বাচন পর্যবেক্ষক হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়। নির্বাচন কমিশনের সঙ্গেও বৈঠক করেন চার পর্যবেক্ষক। তবে চারজনের কেউই কোনো স্বীকৃত নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংস্থার সদস্য ছিলেন না। মূলত নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠকের পর আলোচনায় আসে ইএমএফ এর নাম। সংগঠনের উদ্দেশ্য, এই সংগঠনের নেপথ্যে কারা এবং নির্বাচনি পর্যবেক্ষক হিসেবে পরিচয়ধারী ব্যক্তিদের কী পরিচয় দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। অনুরূপভাবে, আরেকটি সংস্থা, সার্ক হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশন, ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় বেশ কয়েকজন বিদেশিকে নিয়ে আসে এবং তাদেরকে 'আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষক' হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিলে সমালোচনা হয়। এদের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত এবং সমালোচিত হলেন কানাডার 'পর্যবেক্ষক' তানিয়া ফস্টার, যিনি ২০১৮ সালের নির্বাচনে অবাধ ও সুষ্ঠু বলে সার্টিফিকেট দেওয়ার পর উক্ত বক্তব্য প্রত্যাহার করেন। উল্লেখ্য, সার্ক হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশনের মহাসচিব আবেদ আলী ইএমএফ-এর চেয়ারম্যান।

সার্বিকভাবে বাংলাদেশে নির্বাচন পর্যবেক্ষণে নিম্নবর্ণিত সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান:

- রাজনৈতিক মেরূকরণের কারণে অনেক স্থানীয় সংস্থা বেঁচে থাকা কিংবা সরকারের সুবিধা প্রাপ্তির আশায় অথবা এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো কর্তৃক বিদেশি তহবিল ছাড়ের আশায় ক্ষমতাসীন দলের লেজুড়বৃত্তিতে লিপ্ত হয়। ফলে তাদের পক্ষে স্বাধীনভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয় না।

- ২০১৪-২০২৪ সময়কালে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় কিছু ভুয়া দেশি নির্বাচন পর্যবেক্ষক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। নির্বাচন কমিশনও এসব প্রতিষ্ঠানকে 'পর্যবেক্ষক প্রতিষ্ঠান' হিসেবে তালিকাভুক্ত করে। এসব প্রতিষ্ঠান সরকারের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ নিয়ে নির্বাচনকে 'অবাধ ও সুষ্ঠু' বলে সনদ দেয়।

- ২০১৮ এবং ২০২৪ সালের জাতীয় নির্বাচনে অসংখ্য দলীয় ব্যক্তি নির্বাচন পর্যবেক্ষক হিসেবে বিভিন্ন দেশীয় সংগঠনের হয়ে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের নামে পর্যবেক্ষক কার্ড নিয়ে কেন্দ্রে অবস্থান করে দলীয় স্বার্থ হাসিল করে।

- স্থানীয় সংস্থাগুলোকে দাতাসংস্থার তহবিল ছাড়ের জন্য এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোর অনুমোদন দরকার হয়। ক্ষমতাসীন দলের সমর্থক সংস্থা না হলে অর্থ ছাড় করানো প্রায় অসম্ভব ছিল।

- পর্যবেক্ষকদেরকে স্বল্প সময়ের জন্য কেন্দ্রে অবস্থান করতে দেওয়ায় তারা যথাযথভাবে নির্বাচনের অনিয়ম তুলে আনতে সমর্থ হন না।

- নীতিমালায় ব্যক্তি পর্যায়ে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের অধিকার না থাকায় ব্যক্তি পর্যায়েও বাংলাদেশে পেশাদার কোনো নির্বাচন পর্যবেক্ষক নেই।

- বাংলাদেশের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সম্পূর্ণভাবে দাতাসংস্থার তহবিলের ওপর নির্ভরশীল। তহবিল পাওয়া গেলে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করা হয়, অন্যথায় পর্যবেক্ষণ বন্ধ থাকে।

- অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেশীয় সংস্থাগুলো পর্যবেক্ষণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের অভাবে ব্যাপকভাবে পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট প্রণয়ন করতে পারে না। ফলে তাদের পর্যবেক্ষণে সামগ্রিক চিত্র তুলে আনা সম্ভব হয় না।

- সরকার ও ক্ষমতাসীন দলের ভয়ে দেশীয় সংস্থাগুলো নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নিয়ে পর্যবেক্ষিত তথ্য নিয়ে প্রকৃত প্রতিবেদন তৈরি করতে ভয় পায়। নির্বাচন কমিশন যে প্রতিবেদন ফর্ম সরবরাহ করে সে অনুযায়ী দায়সারা একটি প্রতিবেদন তৈরি করে।

- কমিশন নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন ভবিষ্যতে নির্বাচন ভালো করার জন্য কখনও বিবেচনায় নেয় না।

(খ) আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ

২০১৪-২০২৪ সময়কালে বাংলাদেশে প্রকৃত অর্থে কোনো বিদেশি পর্যবেক্ষক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেনি। ২০১৪ সালের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার নির্বাচন, ২০১৮ সালের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত 'যেভাবেই হোক ক্ষমতায় থাকতে হবে'র নির্বাচন এবং অনুরূপভাবে ২০২৪ সালের ডামি (dummy) নির্বাচনে মূলত নির্বাচনি পর্যবেক্ষণের উপযোগী পরিবেশ না থাকায় বিদেশি সংস্থাগুলো নির্বাচন পর্যবেক্ষণ থেকে বিরত থাকে।[৮০] তবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (European Union) সরকারের অনুরোধে পূর্ণাঙ্গ পর্যবেক্ষক দল মোতায়েন না করলেও সরকারের অনুরোধে স্বল্পসংখ্যক পর্যবেক্ষক নিয়োগ দেয়। প্রকৃত বিদেশি পর্যবেক্ষকের অভাব পূরণ করতে সরকার ও নির্বাচন কমিশন ২০১৪ সালে রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয় করে সার্কভুক্ত দেশের নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের আমন্ত্রণ জানায়। ২০২৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, রাশিয়া, Organisation of Islamic Cooperation and the Arab Parliament থেকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণে পূর্ব-অভিজ্ঞতাহীন ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো হয় যারা ঐ নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূণ বলে সনদ দিয়ে দেয়। পেশাদার বিদেশি নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলো নির্বাচনি পর্যবেক্ষণের উপযোগী পরিবেশ (Necessary conditions) ছাড়াও বাংলাদেশে নির্বাচন পর্যবেক্ষণে নিম্নলিখিত সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়, যা তাদেরকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণে নিরুৎসাহিত করে।

- বিদেশি পর্যবেক্ষক নিয়োগ, উৎসাহিতকরণসহ যাবতীয় কার্যক্রমের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ কমিশনকে এ কাজে সহায়তা করবে। কিন্তু পূর্বে বিশেষ করে গত ১৫ বছরে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এমন মন্তব্য করেছে যা বিদেশি পর্যবেক্ষক নিয়োগকে নিরুৎসাহিত করেছে।[৮১] কখনও কখনও মন্ত্রণালয় এমন মন্তব্য করেছে তাতে মনে হয়েছে, নির্বাচন কমিশন নয়, বিদেশি পর্যবেক্ষক নিয়োগে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।[৮২]

---

[৮০] *নির্বাচন ঘিরে সংঘাত দেখছে ইইউ, পাঠাবে না পর্যবেক্ষক*, বিবিসি বাংলা, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩
[৮১] *নির্বাচন পর্যবেক্ষক ভুল পলিসি, অনেক দেশেই এটি নেই: পররাষ্ট্রমন্ত্রী*, ইনকিলাব, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৩
[৮২] *বিদেশি নির্বাচন পর্যবেক্ষক এলে ভালো, না এলে পরোয়া করি না: পররাষ্ট্রমন্ত্রী*, প্রথম আলো, ০৮ জুলাই ২০২৩

- বিদেশি পর্যবেক্ষক নিয়োগের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধাপগুলো সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষক সংস্থার জন্য সুস্পষ্ট না হওয়ায় অনেকেই বাংলাদেশে পর্যবেক্ষণে আসে না।

- গোয়েন্দা সংস্থাগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাংলাদেশে কূটনৈতিক মিশনসমূহে (diplomatic missions) কর্মরত কর্মকর্তাদেরকে পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ না দিতে সুপারিশ করে। ফলে নির্বাচন কমিশনও তাদেরকে পর্যবেক্ষক কার্ড প্রদান থেকে বিরত থাকে।

নির্বাচন পর্যবেক্ষণে কমিশনের সুপারিশ

নির্বাচন কমিশন ও স্থানীয় পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলো যাতে এক সংঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে কাজ করতে পারে সে লক্ষ্যে সংস্কার কমিশন নিম্নলিখিত সুপারিশ করছে।

- সার্বক্ষণিক বা নিশ্চল পর্যবেক্ষক নিয়োগের বিধান চালু করা, যাতে করে পর্যবেক্ষকগণ যতক্ষণ ইচ্ছা একটি কেন্দ্রে অবস্থান করে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে পারে। তবে পর্যবেক্ষকগণ সারাক্ষণ ভোটকক্ষে না থেকে কেন্দ্রের চৌহদ্দির মধ্যে অবস্থান করে যে কোনো সময় ভোটকক্ষে প্রবেশ করতে পারবে।

- ব্যক্তি পর্যায়ে পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিতে কমিশন একটি বিধিমালা প্রণয়ন করবে। সাবেক নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনের সাবেক কর্মকর্তা, নির্বাচন বিশেষজ্ঞ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, হাইকোর্টের আইনজীবী, জেলা পর্যায়ে জেলা দায়রা ও জজ আদালতের আইনজীবীসহ অন্য ব্যক্তিদেরকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ দিবে।

- গত ১৫ বছরে যেসব প্রতিষ্ঠান সরকারের লেজুড়বৃত্তি করে নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু বলেছে, তাদেরকে নিবন্ধন না দেওয়া। ভবিষ্যতে কোনো প্রতিষ্ঠান এ ধরনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকলে একে নির্বাচনি অপরাধ হিসেবে গণ্য করে শাস্তির আওতায় আনা।

- নিবন্ধিত কোনো পর্যবেক্ষক সংস্থার পর্যবেক্ষণ-বিষয়ক অনুমোদিত অনুদান কমিশনের অনুমোদন ব্যতীত সরকারের কোনো সংস্থা বা বিভাগ বাতিল বা কর্তন করিতে পারিবে না।

- স্থানীয় সংস্থা কর্তৃক দাতা সংস্থার কাছ থেকে প্রাপ্ত নির্বাচন পর্যবেক্ষণের তহবিল অন্য কাজে ব্যবহার না করা। কমিশন সংশ্লিষ্ট দাতা সংস্থা এবং এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোর মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

- পর্যবেক্ষক নিয়োগে যাচাই-বাছাইয়ের নামে কোনো সংস্থা যাতে হয়রানি করতে না পারে কমিশন সেটি নিশ্চিত করবে। একইভাবে দলীয় ক্যাডাররা যাতে ভিন্ন পরিচয়ে পর্যবেক্ষক কার্ড নিতে না পারে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কমিশন নিজস্ব জনবল দিয়ে এ যাচাই-বাছাই নিশ্চিত করবে। তবে অধিকতর যাচাইয়ের প্রয়োজন হলে এ কাজে রাষ্ট্রের অন্য কোনো সংস্থার সহায়তায় নিতে পারবে।

- স্থানীয় পর্যবেক্ষক সংস্থায় বিদেশিদেরকে পর্যবেক্ষক হিসেবে কাজ করার অনুমতি না দেওয়া।

- স্থানীয় সংস্থাগুলো যাতে কমপক্ষে ৩০ শতাংশ নারী পর্যবেক্ষক নিয়োগ দেয়, তা নিশ্চিত করা।

- নির্বাচনের ৫ দিন পূর্বে পর্যবেক্ষক কার্ড প্রদান করা।

- পর্যবেক্ষকগণ যাতে গোপনকক্ষ ব্যতীত অন্যান্য কার্যক্রমের ছবি তোলা/ভিডিও ধারণ করতে পারে তা নিশ্চিত করা। তবে গোপনপক্ষে কোনো অনিয়ম পর্যবেক্ষিত হলে তার ছবি/ভিডিও ধারণ করার অনুমতি দেওয়া।

- নির্বাচন পর্যবেক্ষণকালে গুরুতর কোনো অনিয়ম যা নির্বাচনের ফলাফলের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে পর্যবেক্ষিত হলে পর্যবেক্ষক সংস্থা বা ব্যক্তি পর্যবেক্ষক নির্বাচন চলাকালে কমিশনে নির্ধারিত পদ্ধতিতে যাতে অবহিত করতে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

- প্রত্যেক পর্যবেক্ষক সংস্থা/ব্যক্তি নির্বাচন শেষ হবার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন জমা দিবে। কমিশন এ প্রতিবেদন বিবেচনা করে এবং উক্ত এলাকার গেজেট প্রকাশ স্থগিত রেখে প্রয়োজনে অধিকতর তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

- পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলো যাতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষিত পর্যবেক্ষক নিয়োগ দেয় সেটি নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশের নির্বাচনি গণমাধ্যম নীতিমালা

বাংলাদেশে সকল বিতর্কিত নির্বাচনের আগে গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করার প্রয়াস একটি সাধারণ বিষয়। ২০১৪-২০২৪ সময়কালে এ অপপ্রয়াস সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছে যায়। ২০১৪ সালের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার নির্বাচনের পর সরকারের চাহিদা অনুযায়ী প্রতিটি কমিশন নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার নানাভাবে রোধ করার চেষ্টা করে। ২০১৫ সালের ৩০ মে অনুষ্ঠিত মাগুরা-১ উপ-নির্বাচন সামনে রেখে একসঙ্গে অনেক সাংবাদিক ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করলে কাজে বিঘ্ন ঘটে এমন অজুহাতে একসঙ্গে পাঁচজন সাংবাদিক প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করে কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ কমিশন। ৯ দফার এ নির্দেশনায় দশ মিনিটের বেশি সময় কোনো সাংবাদিক কেন্দ্রে অবস্থান করতে পারবে না বলেও নির্দেশনা দেওয়া হয়। এক মাস আগে ঢাকা উত্তর, দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ৩০টিরও বেশি কেন্দ্রে অনুমোদিত সাংবাদিকদের ভোটকেন্দ্রে প্রবেশে বাধা দেওয়া ও নাজেহালের ঘটনা ঘটে। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে কমিশন ভোটের দিন (৩০ ডিসেম্বর) একাধিক গণমাধ্যমের সাংবাদিক একসঙ্গে একই ভোটকক্ষে ঢুকতে নিষেধাজ্ঞা, সাংবাদিকদের মোটরসাইকেল ব্যবহারে স্টিকার না দেওয়া, ভোটকেন্দ্রে ঢোকার পর প্রিসাইডিং কর্মকর্তাকে অবহিত না করে ভোটগ্রহণ কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ, ছবি তোলা এবং ভিডিও ধারণ এবং ভেতর থেকে নয়, ভোটকক্ষ থেকে নিরাপদ দূরত্বে সংবাদ সরাসরি সম্প্রচার করাসহ বেশ কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করে। ঐ সময় সাংবাদিকদের দায়িত্ব পালনে এসব বিধি-নিষেধ সুষ্ঠু নির্বাচনে বাধা হিসেবে আখ্যায়িত করায় নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের তৎকালীন সচিব সাংবাদিকদের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। এসব ধারাবাহিকতা বজায় রেখে কাজী হাবিবুল আউয়াল কমিশন ২০২৪ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগে ২০২৩ সালের ১২ এপ্রিল নির্বাচন কমিশন একটি সাংবাদিক নীতিমালা জারি করে। এ নীতিমালায় মোটরসাইকেলের ব্যবহার বন্ধ, প্রিজাইডিং অফিসারকে অবহিত না করে ভোটগ্রহণ কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ, ছবি তোলা ও ভিডিও ধারণ না করা, রিটার্নিং অফিসারকে স্বীয় বিবেচনায় যৌক্তিক সংখ্যক সাংবাদিককে অনুমোদন ও কার্ড ইস্যু করতে পারার বিধান রাখা, ১০ মিনিটের বেশি ভোটকক্ষে অবস্থান করতে না দেওয়া, এবং ভোটকক্ষ থেকে কোনোভাবেই সরাসরি সম্প্রচার করতে না দেওয়া-সহ বিধান যুক্ত করা হয়। সাংবাদিক এবং নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে সুজন ও টিআইবি-সহ বিভিন্ন সংগঠন প্রতিবাদ করার পর ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে নীতিমালায় সামান্য কিছু পরিবর্তন আনা হলেও বিদ্যমান নীতিমালা অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের ভূমিকা পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

গণমাধ্যমের অধিকতর ভূমিকায় কমিশনের সুপারিশ

বিদ্যমান নীতিমালা সংশোধন করে বেশ কিছু ধারা বাদ দেওয়া হয়েছে এবং ভোট গ্রহণে অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

- নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে প্রদত্ত বৈধ কার্ডধারী সাংবাদিক সরাসরি ভোটকেন্দ্রে কারো অনুমতি না নিয়েই প্রবেশ করতে পারবেন, অর্থাৎ নতুন করে কারো কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে না।

- কোনো রকম অনুমতি ছাড়াই ভোটগ্রহণ কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ, ছবি তোলা এবং ভিডিও ধারণ করতে পারবেন, তবে কোনোক্রমেই গোপন কক্ষের ভেতরের ছবি ধারণ করতে পারবেন না। তবে শর্ত থাকে যে, গোপন কক্ষে কোনো অনিয়মের ঘটনা ঘটলে সে ছবি/ভিডিও ধারণ করতে পারবেন;

- সাধারণভাবে একটি ভোটকক্ষে একসঙ্গে একটি গণমাধ্যমের সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফার প্রবেশ করতে পারবেন। তবে বিশেষ কারণে যেমন: বিশিষ্ট ব্যক্তির ভোট প্রদানের ছবি তুলতে/ভিডিও ধারণ করতে, কিংবা অনিয়মের ছবি তুলতে/ভিডিও ধারণ করতে একাধিক সাংবাদিক একসঙ্গে ভোটকক্ষে প্রবেশ করতে পারবেন।

- সাংবাদিকগণ ভোটগণনা কক্ষে ভোট গণনা দেখতে পারবেন, ছবি নিতে পারবেন, তবে সরাসরি সম্প্রচার করতে পারবেন না। তবে শর্ত থাকে যে, গণনার সময় কোনো অনিয়মের ঘটনা ঘটলে সরাসরি সম্প্রচার করতে পারবেন।

১৫. রিকল বা প্রতিনিধি প্রত্যাহার

রিকল বা প্রতিনিধি প্রত্যাহরণ হলো একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে কোনো নির্বাচনি এলাকার ভোটারগণ নির্ধারিত সংখ্যক স্বাক্ষরের মাধ্যমে তাদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে পদচ্যুত করার জন্য পুনর্নির্বাচনের উদ্যোগ নিতে পারেন। এটি একটি অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনি প্রক্রিয়া, যেখানে জনগণ তাদের প্রতিনিধি সম্পর্কে সরাসরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। রিকল ব্যবস্থায় প্রক্রিয়াগতভাবে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে:

১. নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে একজন নতুন জনপ্রতিনিধি নিয়োগ।

২. পুনর্নির্বাচনের মাধ্যমে পুনরায় জনপ্রতিনিধি নির্বাচন।

বিশ্বব্যাপী রিকল ব্যবস্থাকে অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের অগ্রগতির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়,[৮৩] যেখানে জনগণ তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম হন।[৮৪]

বাংলাদেশের বর্তমান নির্বাচনি ব্যবস্থায় কোনো নির্বাচিত প্রতিনিধি তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে, শপথ ভঙ্গ করলে, প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করলে কিংবা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়লে জনগণের কাছে তাদের জবাবদিহিতার সুযোগ সীমিত। পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত জনগণের অসন্তোষ প্রকাশের কোনো কার্যকর মাধ্যম থাকে না। রিকল ব্যবস্থা এই সমস্যার একটি অন্তর্বর্তী সমাধান হতে পারে।

পৃথিবীর বেশকিছু দেশে 'রিকল' ব্যবস্থা রয়েছে এবং তা জনপ্রিয়। 'রিকল' ব্যবস্থার পক্ষে এবং বিপক্ষেও যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। রিকল প্রবর্তিত হলে কোনো দুর্বৃত্ত বা অর্থ পাচারকারী বা গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীকে তাৎক্ষণিকভাবে অপসারণ করার ক্ষমতা জনগণের হাতে দেওয়া যাবে, অর্থাৎ জনগণই তাদের প্রতিনিধিকে জবাবদিহিতার আওতায় আনবেন এবং অযোগ্য কোনো জনপ্রতিনিধিকে দ্রুত পরিবর্তন করতে পারবেন। ফলে সহজে কোনো প্রতিনিধি অসৎ উদ্দেশ্যে কোনো কাজ বা অনৈতিক কোনো কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন না।

তবে এ ধরনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তৈরি হতে পারে, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য নেতিবাচকভাবে এটির ব্যবহার হতে পারে এবং অধিক পরিমাণে রিকল আয়োজন করার জন্য সরকারের নির্বাচনি ব্যয় বেড়ে যেতে পারে। বাংলাদেশের জনগণের কাছে রিকল পদ্ধতি খুব বেশি পরিচিতি পায়নি। তাছাড়া আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে রিকল ব্যবস্থা প্রচলিত নেই।

প্রক্রিয়াগত প্রস্তাবনা

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে রিকল ব্যবস্থা জাতীয় সংসদের নির্বাচনে প্রবর্তনের প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে। তবে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এড়াতে নির্বাচিত প্রতিনিধির মেয়াদের প্রথম ও শেষ বছরে রিকল নির্বাচন কার্যকর না করার প্রস্তাবনাও দেওয়া হচ্ছে।

রিকল নির্বাচন কার্যকর করার একটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো।

কোনো ব্যক্তি বা দলকে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি আসনের মোট ভোটার তালিকার ন্যূনতম এক-তৃতীয়াংশের স্বাক্ষর* সংগ্রহ করতে হবে**। ↓
রিকলের কারণ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষরসহ একটি আবেদন নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দিতে হবে। কমিশন আবেদনটির যথার্থতা মূল্যায়নপূর্বক এবং রিকল প্রক্রিয়া কার্যকর করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। ↓
যদি উক্ত আসনের সংখ্যাগরিষ্ঠ (৫১%) জনগণ রিকলের পক্ষে ভোট দেয়, তাহলে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে তাঁর পদ থেকে অপসারণ করা হবে।

* স্বাক্ষরের বৈধতা নিশ্চিত করতে সংগৃহীত স্বাক্ষরে নাম, ঠিকানা এবং এনআইডি নম্বর থাকতে হবে।

**স্বাক্ষরের ন্যূনতম সীমা নির্ধারণ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, যাতে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো রিকল ব্যবস্থার অপব্যবহার করতে না পারে।

[৮৩] Camacho, Luis A. 2018. ''Testing Selectorate Theory: Local Government Recall Elections and Political Survival Strategies in Peru." *NORC at the University of Chicago*.

[৮৪] Cronin, Thomas E. 1989. *Direct Democracy: The Politics of Initiative, Referendum, and Recall*. Reprint 2014. Harvard University Press.

১৬. নির্বাচনি ব্যয়

রাজনীতি হলো জনকল্যাণের প্রতি নিবেদিত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কার্যক্রম, যার মূল লক্ষ্য হলো মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। এর জন্য প্রয়োজন স্বচ্ছ, গণতান্ত্রিক ও দায়বদ্ধ রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং তাতে ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিবর্গ। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনসাধারণ সরাসরি শাসনকার্য পরিচালনা করে না। জনগণ তাদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে, যা বাংলাদেশের সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত আছে। তাই নির্দিষ্ট সময় অন্তর রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে জনগণের সমর্থন আদায়ে সচেষ্ট হয়। বস্তুত গণতান্ত্রিক শাসনের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। কিন্তু নির্বাচনি প্রক্রিয়ার একটি বড় সমস্যা হলো এটিকে নানাভাবে প্রভাবিত করা যায়।

নির্বাচনকে প্রভাবিত করার নানা পন্থার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি হলো প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্যভাবে অর্থের ব্যবহার। অতিরিক্ত অর্থব্যয়ের মাধ্যমে নির্বাচনি প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার প্রবণতা শুধু গণতন্ত্রকেই দুর্বল করে না, বরং এটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও নির্বাচনের নৈতিকতাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে। বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক এবং নির্বাচনি ব্যবস্থায় অনেকের কাছেই রাজনীতি করা এবং নির্বাচিত হওয়া এক ধরনের ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। এটি এখন সবার কাছেই খুবই প্রত্যাশিত যে, একজন ব্যক্তি বিপুল অর্থ দিয়ে মনোনয়ন কিনে এবং মোটা টাকা ব্যয় করে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতাকে ব্যবহার করবেন তার 'বিনিয়োগ'-এর তুলনায় একটা বড় লাভ তুলে আনতে। এভাবে রাজনৈতিক দলগুলো এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিরা যদি ভোটার ও জনগণের কাছে দায়বদ্ধ না হয়ে মনোনয়ন বাণিজ্যে লিপ্ত হয় এবং নির্বাচনে অর্থ ও পেশিশক্তি ব্যবহার করে, তাহলে নির্বাচনি প্রক্রিয়া ও রাজনীতি কলুষিত হয়, নির্বাচনের সমতল ক্ষেত্র বিনষ্ট হয়। এমন রাজনৈতিক শক্তি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকলে শাসন ব্যবস্থা দুর্নীতিপরায়ণ হয় এবং সুশাসন, উন্নয়ন ও জনগণের সত্যিকার কল্যাণ বাধাগ্রস্ত হয়।

বিগত কয়েক দশকে মনোনয়ন-বাণিজ্য, টাকা দিয়ে ভোট কেনা-বেচা, সরকারি কর্মকর্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অতিরিক্ত সুবিধা বা উৎকোচ প্রদান ইত্যাদি কারণে নির্বাচনি ব্যয় বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে বেড়েছে। ফলে বাংলাদেশে 'টাকা দিয়ে কেনা যায় এমন উত্তম গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজনীতি এখন জনকল্যাণের পরিবর্তে অর্থ রোজগার ও ক্ষমতার দাপট দেখানোর ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। এর ফলে সৎ ও যোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচিত হয়ে আসার পথ প্রায় রুদ্ধ হয়ে গেছে। একটি সুষ্ঠু গণতন্ত্র যেখানে সকল প্রার্থীর জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করার কথা, সেখানে অর্থ ও পেশিশক্তির প্রভাব একটি ক্রিমিনাল অ্যাম্পায়ার বা তস্করতন্ত্রের উত্থান ঘটিয়েছে, যা স্বৈরাচারের উৎপত্তি ঘটিয়েছে এবং দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করেছে।

এমন পরিস্থিতিতে নির্বাচনি প্রক্রিয়াকে পরিচ্ছন্ন রাখা এবং গণতান্ত্রিক শাসনকে সুসংহত করার জন্য প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও নিরীক্ষণ অপরিহার্য। এর মাধ্যমে সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার পাশাপাশি সমাজে একটি বার্তা দেওয়া হয় যে রাজনীতি কেবল অর্থ বা ক্ষমতার খেলা নয় – এটি হবে জনসেবার একটি পন্থা।

নির্বাচনকে জনকল্যাণ ও গণমুখী এবং সবার জন্য সমান সুযোগের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে একটি শক্তিশালী নির্বাচনি ব্যয় নিরীক্ষণ কাঠামো তৈরি করা জরুরি। কারণ এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে গণতন্ত্র ও সুশাসনের ভিত্তি ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তা অদূর ভবিষ্যতে জনগণের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। বস্তুত, নির্বাচনে লাগামহীন ব্যয়, বিশেষত অদৃশ্য ব্যয় আমাদের নির্বাচনি প্রক্রিয়াকে পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে একটি বড় হুমকি, যা আমাদের আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অকার্যকর করে তুলতে পারে।

নির্বাচনি ব্যয়ের ধরন

নির্বাচনি ব্যয় মূলত দুই ধরনের: ১. সরকার ও নির্বাচন কমিশনের ব্যয়; ২. রাজনৈতিক দল, প্রার্থী ও তাদের সমর্থকদের ব্যয়। রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের ব্যয় আবার দুটি ভাগে বিভক্ত: দৃশ্যমান ব্যয় এবং অদৃশ্য বা গোপন ব্যয়।

১. সরকার ও নির্বাচন কমিশনের ব্যয়

নির্বাচন পরিচালনার জন্য যে পরিকল্পনা তৈরি করা হয় এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে যে বিপুল পরিমাণে অর্থ ব্যয় হয়, তা মূলত নির্ভর করে সাধারণ ভোটার সংখ্যার ওপর। তাছাড়াও কোন ধরনের নির্বাচনি পদ্ধতিতে ভোট (ইভিএম/ব্যালট) গ্রহণ করা হয় তার ওপরও ব্যয়ের তারতম্য হয়। সরকার ও নির্বাচন কমিশনের ব্যয়ের প্রধান খাতগুলোর মধ্যে রয়েছে: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বাহিনী মোতায়েন, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, ভোটকেন্দ্র স্থাপন, নির্বাচনি মালামাল সরবরাহ, ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও ভাতা প্রদান, এবং রিটার্নিং অফিসারসহ অন্যান্য কর্মীদের জন্য বরাদ্দ।

নির্বাচন কমিশনের ব্যয়ের সিংহভাগই হয় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার খাতে। গত আটটি সংসদ নির্বাচনের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পঞ্চম সংসদ নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ব্যয় ছিল মোট ব্যয়ের ৭০%। পরবর্তী নির্বাচনগুলোতেও এ খাতের ব্যয় গড়ে ৬০%-৭০% পর্যন্ত ছিল। সর্বশেষ অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এই খাতে ব্যয় ছিল মোট ব্যয়ের ৫৯%। তবে মোট ব্যয়ের শতাংশের হিসাবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ব্যয় কিছুটা কমলেও টাকার অঙ্কে তা ব্যাপকভাবে বেড়েছে। সর্বশেষ অনুষ্ঠিত দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে আইন আইন-শৃঙ্খলা খাতে ব্যয় ছিল ১১৩৭ কোটির অধিক, যা পঞ্চম সংসদ নির্বাচনে এ খাতে ব্যয়ের চেয়ে ৬৬ গুণ বেশি। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মোট ব্যয়ও ছিল এর চেয়ে কম।

বিগত ১২টি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অর্থ ব্যয়ের একটি পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া হলো:

একনজরে বিগত ১২টি জাতীয় নির্বাচনে নির্বাচন পরিচালনা ব্যয়					
ক্রমিক নং	নির্বাচনের নাম	নির্বাচনি পরিচালনা খাতে ব্যয়	আইন-শৃঙ্খলা খাতে ব্যয়	ব্যয়ের পরিমাণ (টাকা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১	প্রথম সংসদ নির্বাচন-১৯৭৩	--	--	২,৯৬,১৭,৭৫৬/-	সেই সময় আইনশৃঙ্খলার ব্যয় অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে সরাসরি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেওয়া হয়েছে
২	দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচন-১৯৭৯	--	--	৫,৫৯,৪৪,৫৫৫/-	
৩	তৃতীয় সংসদ নির্বাচন-১৯৮৬	--	--	৫,০৬,৩৫,০৫৫/-	
৪	চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-১৯৮৮	--	--	১২,১০,৯৯,৩৪১/-	
৫	পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-১৯৯১	৭,২১,৯৩,১০৭/-	১৭,১৫,৯০,০৫০/-	২৪,৩৭,৮৩,১৫৭/-	
৬	ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-১৯৯৬	৭,৬২,৯৬,৩০১/-	২৯,৪১,৪৯,৭২৯/-	৩৭,০৪,৪৬,০৩০/-	
৭	সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-১৯৯৬	১১,৪৭,২২,৩৪৭/-	১৮,৭৯,০১,০০০/-	৩০,২৬,২৩,৩৪৭/-	
৮	অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০০১	৩০,৬৩,৪৮,৮৫৮/-	৪২,০৭,৮৩,৩৬২/-	৭২,৭১,৩২,২২০/-	
৯	নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০০৮	৬৭,২১,০৪,৬৭২/-	৯৭,৭৯,৪৬,০১৪/-	১৬৫,০০,৫০,৬৮৬/-	
১০	দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০১৪	৮২,৬৪,৩০,৫২৬/-	২০০,০৮,০৯,৮৬৬/-	২৮২,৭২,৪০,৩৯২/-	
১১	একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০১৮	৩০০,৬৬,৪২,৬৭৯/-	৬৬৬,০৬,৩৩,৫১৭/-	৯৬৬,৭২,৭৬,১৯৬/-	
১২	দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০২৪	৭৯০,২৬,৮৩,৭৩৭/-	১১৩৭,২৩,৮৪,৩৭০/-	১৯২৭,৫০,৬৮,১০৭/-	

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।

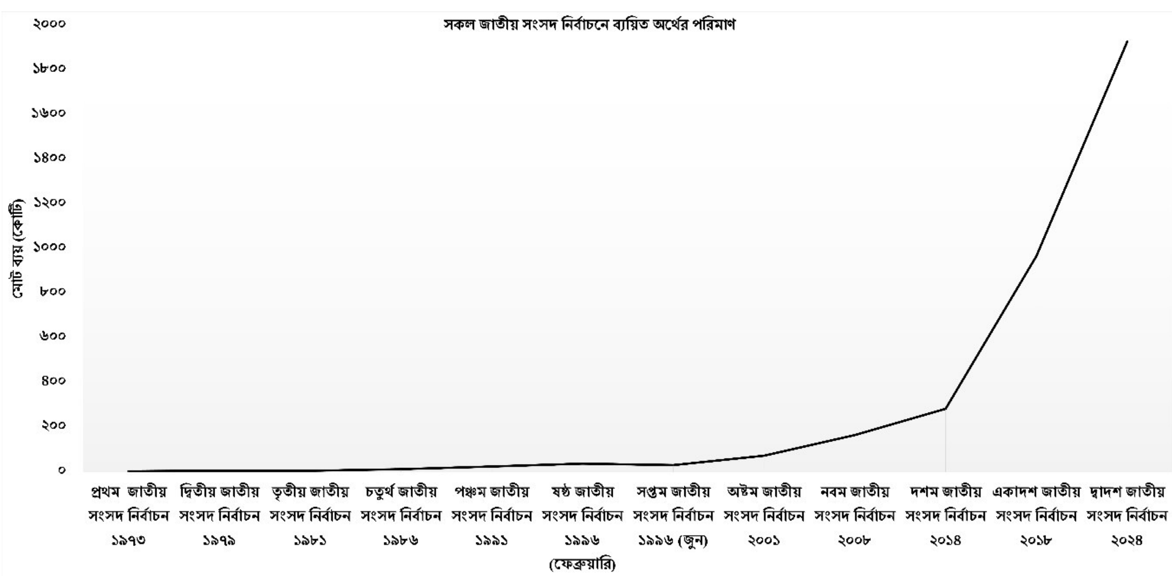

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে (২০২৪) নির্বাচন কমিশনের ব্যয়			
ক্রমিক নং	যার অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ (টাকা)	বরাদ্দকৃত মোট অর্থের পরিমাণ (টাকা)
১	বিভাগীয় কমিশনার ও রিটার্নিং অফিসার	-	৩৯,৪৪,৪৭,৫০০
২	জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসার	-	৫,৪৯,৯৭,৮৫,৩০০
৩	উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার	৯১,৪২,০০০	৪২,১২,২৬,০০০
৪	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার	৫২,২৪,০০০	
৫	জোনাল এক্সিকিউটিভ অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার	৭১,৮৩,০০০	
৬	ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার	৩২,৬৫,০০০	
৭	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার	৩৫,৭৮,৮৫,০০০	
৮	সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার	১৩,০৬,০০০	
৯	সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন)ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার	৬,৫৩,০০০	
১০	উপজেলা/থানা নির্বাচন নির্বাচন অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার	৩,৬৫,৬৮,০০০	
১১	বিজ্ঞ অ্যাক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট	-	৩২,৭৮,৯৫,০০০
১২	বিজ্ঞ চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট	-	৭০,০০,০০০
১৩	বিজ্ঞ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট	-	৩,৬৩,৫০,০০০
১৪	বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ	-	১৫,৮৯,৬০,০০০
১৫	বিজ্ঞ মহানগর দায়রা জজ	-	৭,০০,০০০
১৬	আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা	-	৪,৯৫,০৫,০০০
১৭	সিনিয়র জেলা/জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা	-	২৭,৪১,২৩,০৩৫
১৮	উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার	-	২৩,৬৪,৬৬,০০০
১৯	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	-	৫৪,০৬,৩৯০
২০	সরকারি মুদ্রণালয়	-	৩৬,৩৭,২৯,২১৭
২১	উপসচিব (চলতি দায়িত্ব) হিসাব	-	১০,৬৯,০৪,৮৫০
২২	নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	-	৯৫,৯৪,৪৫০
২৩	তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ টেলিভিশন ও গণযোগাযোগ অধিদপ্তর	-	১,০৫,৯০,৯৯৫
		মোট	**৭,৯০,২৬,৮৩,৭৩৭**
২৪	বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী	-	৩,৬৮,৪৮,৩৯,৬৯৪
২৫	বাংলাদেশ পুলিশ	২,৫৩,৮৭,২২,০৩৪	২,৬৭,৮৮,২২,০৩৪
২৬	বাংলাদেশ পুলিশ (গোয়েন্দা)	১৪,০১,০০,০০০	
২৭	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	-	২,৪২,১৭,৫৯,৩০৮
২৮	র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)	-	৬০,৫২,৯৪,৫০৫
২৯	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড	-	৬৩,৪১,৪৯,৯৫০
৩০	বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	-	৯২,৪০,৬০,৬৩০
৩১	বাংলাদেশ নৌ বাহিনী	-	৫,৯৯,১৫,৬০০
৩২	বাংলাদেশ বিমান বাহিনী	-	১০,৮৯,৪৬,০২৯
৩৩	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	-	১০,৭৫,০০০
৩৪	চৌকিদার/দফাদার/গ্রাম পুলিশ	-	২,৪৭,২৩,৯৭৫০
৩৫	বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	-	৩৬,০০,০০০
		মোট	**১১,৩৬,৯৭,০২,৫০০**
		সর্বমোট	**১৯,২৭,২৩,৮৬,২৩৭**

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

নির্বাচনি ব্যয়ের তথ্য থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, সার্বিকভাবে নির্বাচনের ব্যয় ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে – প্রতিটি নির্বাচনে আগেরটির চাইতে ব্যয় বেড়েছে দ্বিগুণের বেশি। ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের ব্যয় ছিল ১,৯০০ কোটি টাকা, যা একাদশ জাতীয় নির্বাচনে ছিল ৭০০ কোটি এবং দশম জাতীয় নির্বাচনে ছিল ৩৩৩ কোটি টাকা। আইনশৃঙ্খলা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি নির্বাচনি ব্যয়ের অস্বাভাবিক এ বৃদ্ধির মূল কারণ বলে প্রতীয়মান হয়। বিশেষ করে গত তিনটি বিতর্কিত নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি চোখে পড়ার মতো। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা খাতের ব্যয় ২০০৮ সালের ৯৭ কোটি টাকা থেকে ২০১৪ সালে ২০০ কোটিতে পৌঁছায়, পরের নির্বাচনে তা ৬০০ কোটি এবং সর্বশেষ নির্বাচনে তা হাজার কোটি ছাড়িয়ে যায়। ধারণা করা যায়, গত তিনটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের একচ্ছত্র বিজয় নিশ্চিত করার জন্য এবং বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের নিয়ন্ত্রণ করতে এ খাতে এ বিপুল অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। পাশাপাশি চরমভাবে দলীয় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সরকারের পক্ষে কাজ করার পুরস্কার হিসেবেও এ খাতে বিপুল পরিমাণের অর্থ ব্যয় হয়েছে। সকল দলের অংশগ্রহণে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে আইন-শৃঙ্খলা খাতে এত বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হতো না। তাই আইন-শৃঙ্খলা খাতে এ বিপুল ব্যয়ের লাগাম টানা অত্যন্ত জরুরি।

উল্লেখ্য, দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে ভোটারপ্রতি ব্যয় হয়েছে ১৬১.০২ টাকা। পক্ষান্তরে, প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটার তালিকাসহ ভোটারপ্রতি খরচ ছিল ০.৮৪ টাকা। আইন-শৃঙ্খলা খাতে ব্যয় বৃদ্ধির পাশাপাশি নির্বাচন পরিচালনার খাতের ব্যয়ও বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। নির্বাচনে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য ভাতা বৃদ্ধি এ খাতে খরচ বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ। নির্বাচনি ব্যয়ের সামগ্রিক ব্যয় কমাতে হলে নির্বাচন পরিচালনা খাতের ব্যয় কমানোর দিকেও নজর দিতে হবে।

২. রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর দৃশ্যমান ব্যয়

রাজনৈতিক দলের দৃশ্যমান ব্যয়

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ (আরপিও) অনুযায়ী, দুই শতাধিক বা তার বেশি আসনে প্রার্থী প্রদানকারী দলগুলো সাড়ে ৪ কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যয় করতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক দলের ব্যয় অনুমান করা বা হিসাব করা দুরূহ কাজ। কারণ এ ব্যয় হয়ে থাকে মূলত অদৃশ্য ও মনোনয়ন বাণিজ্যের কারণে। ২০০১ সালে রাজনৈতিক দলের ব্যয়ের সীমা আইনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ২০০৮ সালে এ নির্বাচনি ব্যয় সীমা বৃদ্ধি করা হয়। আরপিও'র ধারা ৪৪গগ অনুযায়ী, রাজনৈতিক দলের প্রার্থী অনুযায়ী ব্যয়ের সীমা নিম্নরূপঃ

ক্রম	প্রার্থীর সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	
		২০০১	২০০৮
১	২০১-৩০০	১,৫০,০০,০০০	৪,৫০,০০,০০০
২	১০১-২০০	১,০০,০০,০০০	৩,০০,০০,০০০
৩	৫১-১০০	-	১,৫০,০০,০০০
৪	১-১০০	৭৫,০০,০০০	-
৫	০-৫০	-	৭৫,০০,০০,০০০

২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনে আওয়ামী লীগ কর্তৃক দাখিলকৃত নির্বাচনি ব্যয় রিটার্নে পৌনে ৩ কোটি টাকা দেখানো হয়েছে, যা দৃশ্যমান। বাকি দলগুলোর ব্যয় দেখানো হয়েছে ৭০ লাখের নিচে। তবে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে ধারণা করা যায়, দলগুলোর প্রকৃত ব্যয় প্রদর্শিত ব্যয়ের চেয়ে অনেক বেশি। দল কর্তৃক দাখিলকৃত ব্যয় নিরীক্ষা না হওয়ার ফলে প্রকৃত ব্যয়ের সঙ্গে তাদের প্রদর্শিত ব্যয়ের অসমাঞ্জস্য বোঝার কোনো উপায় নেই। তাই দলগুলো ব্যয়ের সীমা কতটুকু পালন করছে তা জানতে হলে দাখিলকৃত ব্যয় নিরীক্ষা করা অত্যাবশ্যক। নিরীক্ষাপূর্বক কোনো গড়মিল পাওয়া গেলে দলের নিবন্ধন বাতিল করাও জরুরি।

প্রার্থীর দৃশ্যমান ব্যয়

নির্বাচনে প্রার্থীরা যেসব খাতে দৃশ্যমান ব্যয় করে তা হলো প্রচারসামগ্রী, ব্যানার ও লিফলেট প্রকাশ, প্রচার সভা, নির্বাচনি আলোচনা ও অনুষ্ঠান, সংবাদ সম্মেলন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা ইত্যাদি।

প্রার্থীদের নির্বাচনি ব্যয়ের ক্ষেত্রে আইনের একটি বিরাট ফাঁক-ফোকর রয়ে গেছে। আইনে কোথাও বলা নেই কবে থেকে নির্বাচনি ব্যয় গণনা শুরু হবে। ফলে নির্বাচনের বহু পূর্ব থেকেই প্রার্থী ও তাদের পৃষ্ঠপোষকরা অর্থ ব্যয় করা শুরু করেন। তাই নির্বাচন শুরু হওয়ার আগেই প্রায় সকল ক্ষেত্রেই নির্বাচনি ব্যয় সীমা বহুগুণে ছাড়িয়ে যায়। দেখা যায়, নির্ধারিত ব্যয় সীমা অতিক্রম করার পরও কমিশনের পক্ষ থেকে প্রার্থীদের ব্যয় পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ করা হয় না। ফলে বেশিরভাগ প্রার্থী নির্ধারিত ব্যয়সীমার অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করেন এবং প্রত্যেক নির্বাচিত সংসদ সদস্যই মিথ্যাচার দিয়ে আইনপ্রণেতা হিসেবে তাদের যাত্রা শুরু করেন।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ অনুযায়ী, নির্বাচনি ফলাফল ঘোষণার ১৫ দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট ছকে প্রত্যেক প্রার্থীই তার নির্বাচনি ব্যয়ের হিসাব সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের কাছে দাখিলের বিধান রয়েছে। কিন্তু অতীতে অনেক প্রার্থী নির্বাচনি ব্যয়ের বিবরণী জমা দেননি।

কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক পদক্ষেপও নেওয়া হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে ৩৭৯ জনের এবং ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে ২৪৭ জনের ব্যয়ের বিবরণী পাওয়া যায়নি।

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ব্যয় রিটার্নের তথ্যাদি		
বিবরণ	একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০১৮	দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০২৪
মোট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী	১,৮৬৫	১,৯৭৭
তথ্য পাওয়া গেছে এমন আসন সংখ্যা	১৭১	২৮৪
তথ্য পাওয়া যায়নি এমন আসন সংখ্যা	১২৯	১৬
ব্যয় বিবরণী জমা দিয়েছেন	৯৯১	১,৭৩০
প্রার্থী প্রতি ব্যয় (টাকায়)	৬,৬৭,৪৪০	৮,০৫,১১৬
মোট ব্যয় (টাকায়)	৬৬,১৪,৩৩,২২৬	১,৩৯,২৮,৫১,৬১৯

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

নির্বাচন কমিশন থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ০৭ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদেরকে নিজ নিজ ব্যয়ের বিবরণী পাঠানোর জন্য নির্বাচন কমিশন থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে প্রথমবার পত্র প্রেরণ করা হয়। ০৮ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে দ্বিতীয়বার প্রার্থীদেরকে পত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ২৮ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত একাদশ জাতীয় নির্বাচনে ১৭১টি এবং দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের ২৮৪টি আসনের তথ্য তথ্য পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রার্থীরা আইন-কানুনের প্রতি তোয়াক্কা করেনে না।

প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, একাদশ জাতীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ১,৮৬৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ৯৯১ জন প্রার্থী গড়ে ৬ লাখ ৬৭ হাজার ৪৪০ টাকা ব্যয় করেছেন। আর দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ১,৯৭৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ১,৭৩০ জন প্রার্থী গড়ে ৮ লাখ ০৫ হাজার ১১৬ টাকা ব্যয় করেছেন। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, প্রার্থীদের এ হিসাব বিশ্বাসযোগ্য নয়।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ধারা ৪৪খ-এর দফা (৩) অনুযায়ী, বর্তমানে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয় সর্বোচ্চ পঁচিশ লাখ টাকা। সকল সংসদীয় আসনের জন্য ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা একই। কিন্তু বাংলাদেশে যেমন ২ লাখের মতো ভোটারের নির্বাচনি আসন রয়েছে, তেমনি আছে ৭ লাখের বেশি ভোটারসম্বলিত আসন। গড়ে সাড়ে ৩ লাখের মতো ভোটার আছে সংসদীয় আসনগুলোতে। বিদ্যমান এ বিধানের ফলে ভোটার সংখ্যার তারতম্য হলেও ব্যয় সীমা একই থাকে, যা অসামঞ্জস্যপূর্ণ। ভোটার সংখ্যার সাথে ব্যয়ের সামঞ্জস্য নিশ্চিতের লক্ষ্যে সকল আসনের জন্য নির্ধারিত একই ব্যয়ের সীমা তুলে দিয়ে ভোটারভিত্তিক ব্যয়ের বিধান তৈরি করা জরুরি।

নিম্নে বিভিন্ন সময়ে নির্বাচনি ব্যয় সংক্রান্ত একটি বিবরণী দেওয়া হলো:

তারিখ	অধ্যাদেশ/আইন	অর্থের পরিমাণ	মন্তব্য
২৪ ডিসেম্বর ১৯৭২	The Representation of the People Order, 1972 (President's Order no. 155 of 1972)	বিশ হাজার টাকা	
০৫ ডিসেম্বর ১৯৭৮	(Order no. 2 L of 1978)	-	Omitted
-	Ordinance No. IV of 1985	-	Inserted
৬ জানুয়ারি ১৯৯১	গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৯০ (১৯৯১ সনের ৪ নম্বর অধ্যাদেশ)	তিন লক্ষ টাকা	১৯৯১ সালের পূর্বে নির্বাচনি ব্যয় এক লক্ষ টাকা ছিল
১৯৯৬	-	তিন লক্ষ টাকা	-
৮ আগস্ট ২০০১	গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০১ (২০০১ সনের ১ নম্বর অধ্যাদেশ)	পাঁচ লক্ষ টাকা	গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নম্বর আইন)
১৯ আগস্ট ২০০৮	গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ৪২ নম্বর অধ্যাদেশ)	পনেরো লক্ষ টাকা	গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নম্বর আইন)
৩ নভেম্বর ২০১৩	গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নম্বর আইন)	পঁচিশ লক্ষ টাকা	বর্তমানে পঁচিশ লক্ষ টাকা রয়েছে

আইনানুযায়ী, একটি আসনের একজন প্রার্থী সর্বোচ্চে ২৫,০০,০০০/= (পঁচিশ লক্ষ) টাকা ব্যয় করতে পারেন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৯৯টি আসনে ১,৯৬৯জন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিল, সে হিসেবে ধরে নেওয়া যায় প্রার্থীদের মোট নির্বাচনি ব্যয় হয়েছিল ৪৯২,২৫,০০,০০০/= (চারশত বিরানব্বই কোটি পঁচিশ লক্ষ) টাকা, যা দৃশ্যমান, কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য নয়।

রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর অদৃশ্য ব্যয়

অদৃশ্য ব্যয়ের ব্যাপকতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা অসম্ভব। কারণ মনোনয়ন বাণিজ্য, নির্বাচনে কালো টাকার ব্যবহার, দুর্নীতি ও ক্ষমতাসীন দলের অনৈতিক আর্থিক লেনদেনের চিত্র দৃশ্যমান হয় না। তাছাড়া দলীয় কর্মীদের খুশি রাখতে এবং ভোটারদের আকৃষ্ট করতে অনানুষ্ঠানিক অনেক অর্থ ব্যয় করেন প্রার্থীরা। এ অদৃশ্য ব্যয় নির্বাচনি প্রক্রিয়ার জন্য একটি বড় ঝুঁকি।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-টিআইবির এক গবেষণা অনুযায়ী, দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে নির্ধারিত ব্যয়ের ৬ গুণ বেশি খরচ করেছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা। এ সংক্রান্ত এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, 'দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে থেকে নির্বাচন পর্যন্ত আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা প্রচারে ব্যয় করেছেন গড়ে ২ কোটি ৮৬ লাখ টাকার বেশি। প্রচারের জন্য নির্ধারিত সময়ে এই ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় দেড় কোটি টাকা, যা নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত সীমার ৬ গুণ বেশি। আওয়ামী লীগের বিজয়ী প্রার্থীরা নির্বাচন উপলক্ষে গড়ে ৩ কোটি সাড়ে ৯ লাখ টাকা ব্যয় করেছেন। এর মধ্যে একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ ৩৮ কোটি ৭৭ লাখ টাকা ব্যয় করেছেন। তাদের ব্যয়ের পরিমাণ নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত ব্যয়সীমার গড়ে সাড়ে ১১ গুণ বেশি। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, নির্বাচনি ব্যয়সীমা লঙ্ঘনের ধারা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত একাদশ সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীরা ব্যয়সীমার ৩ গুণ বেশি খরচ করেছিলেন।'[৮৫] উল্লিখিত তথ্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, বাংলাদেশে নির্বাচনি ব্যয়সীমা কার্যত প্রতিপালন হচ্ছে না, বরং প্রতিবারের নির্বাচনে তা লঙ্ঘনের মাত্রা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণহীনতা ও জবাবদিহিতার অভাবকেই প্রতিফলিত করে। পাশাপাশি, এতে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনের পরিবেশ বিনষ্ট হয় এবং আর্থিকভাবে স্বচ্ছল প্রার্থীদের জন্য একটি অসংগতিপূর্ণ সুবিধা সৃষ্টি হয়, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য মারাত্মক হুমকি। ফলস্বরূপ, সাধারণ জনগণের ভোটাধিকার প্রভাবিত হয় এবং নির্বাচনি প্রক্রিয়ার প্রতি তাদের আস্থা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে পড়ে।

১১.৭ জরিপের ফলাফল

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) কর্তৃক পরিচালিত জরিপে নির্বাচনি ব্যয় ও মনোনয়ন বাণিজ্য সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মতামত উঠে এসেছে যা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের তিন-চতুর্থাংশই মনে করেন মনোনয়ন বাণিজ্য বন্ধ না হলে রাজনীতি ব্যবসায়িক স্বার্থে পরিচালিত হওয়ার বিদ্যমান সংস্কৃতি অব্যাহত থাকবে এবং এর ফলে স্বৈরাচারী ব্যবস্থা আবার ফিরে আসার আশঙ্কা তৈরি হবে। সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তিদের মনোনয়ন দেওয়ার লক্ষ্যে প্রার্থীদের কাছ থেকে হলফনামা নিয়ে তা যাচাই করার আবশ্যক বলে মনে করেন ৮৮ শতাংশ মানুষ।

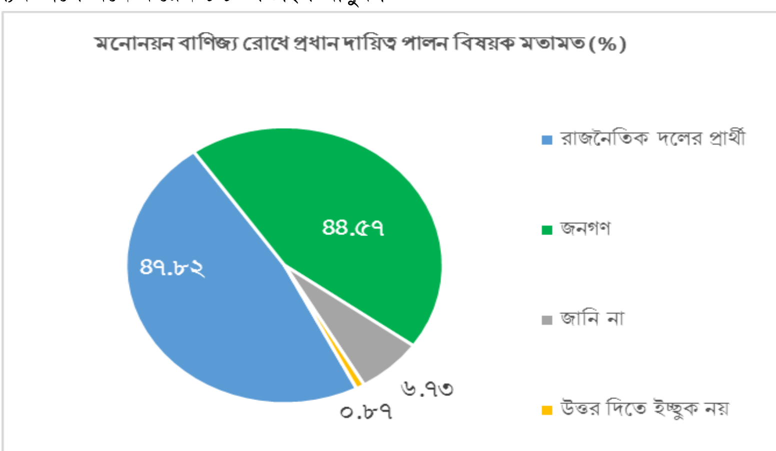

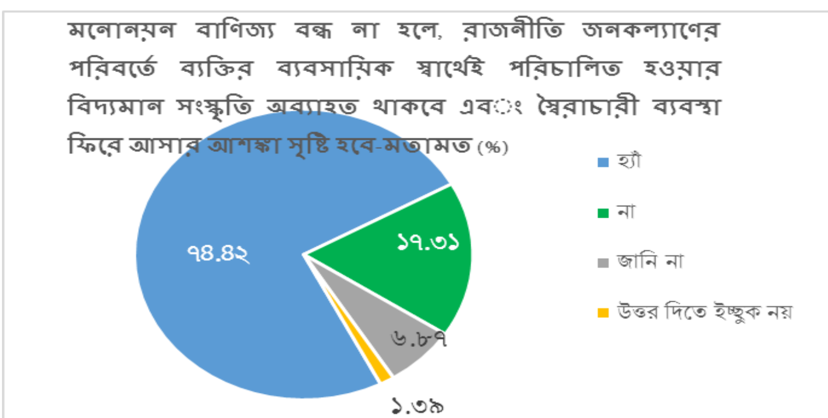

[85] *প্রথম আলো*, ১৭ জানুয়ারি ২০২৪।

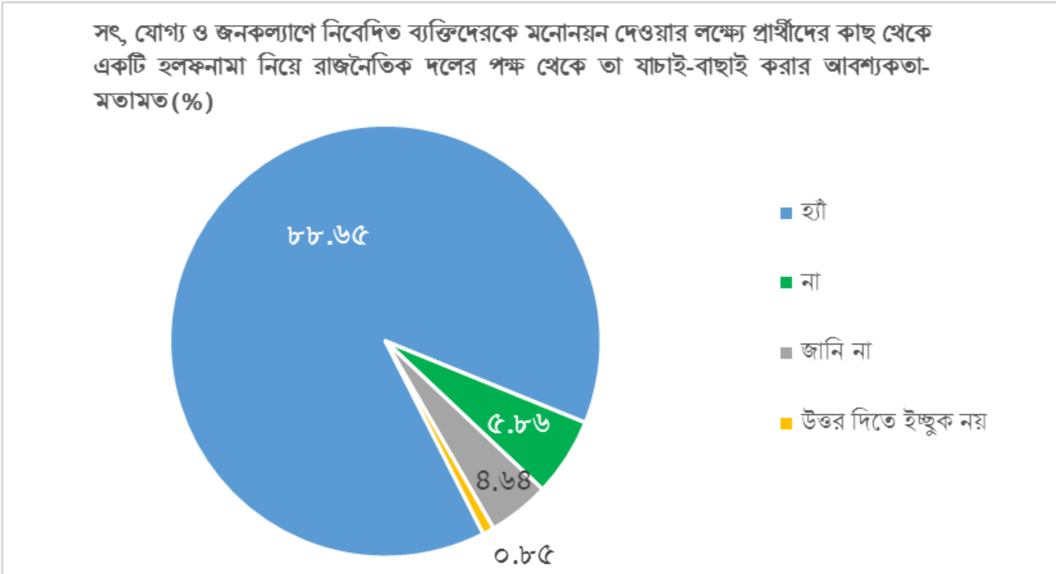

সুপারিশ

১. প্রার্থী এবং রাজনৈতিক দলের তহবিলের উৎস জানা ও নির্বাচনি ব্যয়ের অস্বচ্ছতা দূর করার নিমিত্তে নিম্নোক্ত দলিলাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভোবে পরীক্ষা করা:

- প্রার্থীর দাখিলকৃত সম্ভাব্য আয়ের উৎস;
- প্রার্থী প্রদত্ত হলফনামা;
- নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট;
- আয়কর বিভাগে দাখিলকৃত আয়কর রিটার্ন;
- নির্বাচনি প্রচারণাকালীন প্রার্থীর প্রতিদিনের ব্যয় মনিটরিং;
- প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন নিরীক্ষা করা।

২. নির্বাচনি ব্যয়ের অনিয়ম প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এক বা একাধিক নির্বাচনি আসনের জন্য 'নির্বাচনি ব্যয় মনিটরিং কমিটি' নামে কমিটি গঠন করা এবং নির্বাচনি ব্যয় নিবিড়ভাবে নজরদারি করা।

৩. নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে একই মঞ্চে ভোটার-প্রার্থী মুখোমুখি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

৪. আসনপ্রতি ব্যয় সীমা তুলে দিয়ে ভোটার প্রতি ১০ টাকা ব্যয় নির্ধারণ করা।

৫. নির্বাচনি প্রচারণার অংশ হিসেবে শোডাউন, পোস্টার ছাপানো এবং মাইকিং বন্ধ করা। এর বিকল্প হিসেবে লিফলেট, হ্যান্ডবিল এবং প্রার্থীদের ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাওয়াকে উৎসাহিত করা।

৬. প্রার্থী এবং দলের নির্বাচনি ব্যয়ের হিসাবের রিটার্নের নিরীক্ষা এবং হিসাবে অসঙ্গতির জন্য নির্বাচন বাতিলের বিধান করা।

৭. সরকার ও নির্বাচন কমিশনের ব্যয় কমানোর জন্য নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের ভাতা ও প্রশিক্ষণ ভাতা পুনর্মূল্যায়ন করা।

৮. কখন থেকে নির্বাচনি ব্যয় গণনা শুরু হবে তা আইনে স্পষ্ট করা এবং প্রার্থীর পক্ষে তার দলের এবং অন্য কোনো ব্যক্তির ব্যয়কেও নির্বাচনি ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করা।

৯. সকল নির্বাচনি ব্যয় ব্যাংকিং ব্যবস্থা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহৃত প্রযুক্তির মাধ্যমে লেনদেন/পরিচালনা করা।

১০. প্রার্থীর আয়ের উৎস কী এবং নির্বাচনি ব্যয়ের খাতগুলো কী সে বিষয়টি স্পষ্টভাবে ব্যয়ের বিবরণীতে উল্লেখ করা।

১৭. গণভোট

রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য জনগণের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে মতামত গ্রহণের পদ্ধতিই হলো গণভোট। এর মাধ্যমে জনগণের কাছে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের জন্য উপস্থাপিত হয়। এটি মূলত জনমত যাচাইয়ের একটি পদ্ধতি, যা বহু বছর আগে থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চালু রয়েছে। সুইজারল্যান্ডে ১৭৭৮ সালে প্রথম গণভোট চালু হয়। বিভিন্ন দেশে আলাদা আলাদা বিষয়ে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। যেমন, সংবিধান সংশোধন, গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন, আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি, ইত্যাদি।

সংবিধান সংশোধনের জন্য অনেক দেশে – যেমন, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, ইতালি – গণভোট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

আমাদের দেশে স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত তিনবার যথাক্রমে **১৯৭৭**, **১৯৮৫** ও **১৯৯১** সালে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে। **১৯৭৭** সালের ৩০ মে তারিখে প্রথমবার গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছিল রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং তাঁর অনুসৃত নীতি ও কর্মপন্থার প্রতি জনগণের মতামত যাচাইয়ের জন্য। দ্বিতীয়বার **১৯৮৫** সালের **২১** মার্চ তারিখে রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের অনুসৃত নীতি ও কর্মপন্থার প্রতি আস্থা এবং স্থগিত সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠান পর্যন্ত তাঁর রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকার সম্মতির বিষয়ে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। মূলত সামরিক শাসকের বৈধতা দেওয়ার জন্য এ গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

১৯৯১ সালের **১৫** সেপ্টেম্বর তারিখে সংবিধানের **১৪২**(**১**ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তৃতীয়বারের মতো 'গণভোট' অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ গণভোট ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনগণের সামনে প্রশ্ন ছিল– 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) বিল, **১৯৯১**-এ রাষ্টপতির সম্মতি দেওয়া উচিত কি না?' এ প্রশ্নের মাধ্যমে মূলত জনগণের কাছে ভবিষ্যতে দেশে কোন ধরনের সরকার পদ্ধতি হবে তা উপস্থাপিত হয়েছিল। দেশের প্রায় সকল রাজনৈতিক দলই 'হ্যাঁ' পক্ষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল। কিন্তু একমাত্র ফ্রিডম পার্টি এর বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। এ গণভোট আয়োজনের জন্য *গণভোট আইন*, **১৯৯১** এবং *গণভোট বিধিমালা*, **১৯৯১** প্রণয়ন করা হয়েছিল।

বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত গণভোটসমূহ

বিষয় ও গণভোট অনুষ্ঠানের তারিখ	প্রশ্ন	মোট ভোটার	মোট আস্থাজ্ঞাপক (হ্যাঁ) ভোটের সংখ্যা (টি)	মোট অনাস্থাজ্ঞাপক (না) ভোটের সংখ্যা (টি)	মন্তব্য
বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি আস্থা গণভোট-১৯৭৭	রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, বি. ইউ, এবং তাঁহার অনুসৃত নীতি ও কর্মপন্থার প্রতি আপনার আস্থা আছে কি?	৩৮,৩৬৩,৮৫৮	৩৩,৪০০,৮৭০ (৯৮.৮৮%- মোট প্রদত্ত বৈধ ভোটের বিপরীতে)	৩৭৮,৮৯৮ (১.১২% মোট প্রদত্ত বৈধ ভোটের বিপরীতে)	
বাংলাদেশের সামরিক শাসনের গণভোট-১৯৮৫	রাষ্ট্রপতি লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের অনুসৃত নীতি ও কর্মসূচির প্রতি আস্থা এবং স্থগিত সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনসমূহ অনুষ্ঠান পর্যন্ত তাঁহার রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকাতে আপনার সম্মতি আছে কি?	৪৭,৯১০,৯৬৪	৩২,৬৬১,২৩৩ (৯৪.১১%- মোট প্রদত্ত বৈধ ভোটের বিপরীতে)	১,৯১১,২৮১ (৫.৫০%- মোট প্রদত্ত বৈধ ভোটের বিপরীতে)	
বাংলাদেশের সংবিধান বিষয়ক গণভোট-১৯৯১	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) বিল, ১৯৯১-এ রাষ্ট্রপতির সম্মতি দেওয়া উচিত কিনা?	৬,২২,০৪,১১৮	১,৮৩,০৮৩৭৭ (৮৪.৩৮%- মোট প্রদত্ত বৈধ ভোটের বিপরীতে)	৩৩,৯০০৬২ (১৫.৬২%- মোট প্রদত্ত বৈধ ভোটের বিপরীতে)	

তথ্যসূত্র: ১. বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন; ২. বাংলাদেশের নির্বাচনি ব্যবস্থা ও ফলাফল, নেসার আমিন, ঐতিহ্য, ২০২৩

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের আদি অর্থাৎ ৭২-এর সংবিধানে গণভোটের বিধান ছিল না। ১৯৭৯ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমান পঞ্চম সংশোধনী আমাদের সংবিধানে যুক্ত করেন। পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে 'সংবিধান-সংশোধন' সংক্রান্ত ১৪২ অনুচ্ছেদে (১ক) দফা যুক্ত করা হয়, যাতে বলা হয়েছে: '(১) দফায় যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও এই সংবিধানের প্রস্তাবনা অথবা ৮, ৪৮, ৫৬, ৫৮, ৮০ বা ৯০ক অনুচ্ছেদ অথবা এই অনুচ্ছেদের কোনো বিধানাবলির সংশোধনের ব্যবস্থা রহিয়াছে এরূপ কোনো বিল উপরিউক্ত উপায়ে গৃহীত হইবার পর সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইলে উপস্থাপনার সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্পতিদান করিবেন কি করিবেন না এই প্রশ্নটি গণ-ভোটে প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন।' এ ছাড়াও পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ১৪২ অনুচ্ছেদে গণভোট সম্পর্কিত (১খ), (১গ) এবং (১ঘ) যুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী গৃহীত হয়, যার মাধ্যমে ১৪২ অনুচ্ছেদের (১ক) সংশোধন করে ৫৮, ৮০ ও ৯০ক অনুচ্ছেদ সংশোধনের ক্ষেত্রে গণভোটের বিধান বাতিল করা হয়। অর্থাৎ দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আরও সীমিত আকারে সংবিধানের প্রস্তাবনা, অনুচ্ছেদ ৮, ৪৮ বা ৫৬ সংশোধনের ক্ষেত্রে গণভোট অনুষ্ঠান বাধ্যতামূলক করা হয়।[৮৬]

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০১১ সালের ৩০ জুন তারিখে জাতীয় সংসদে পাশ হওয়া পঞ্চদশ সংশোধনীতে ১৪২ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে গণভোটের বিধান বাতিল করা হয়। তবে ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী মামলায় ১৪২ ধারাটি বাতিল ঘোষণা করে আদালত গণভোটের বিধান ফিরিয়ে আনেন। তবে আদালতের রায়ে গণভোটের বিধানটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনর্বহাল হওয়া নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কেননা, জেনারেল ক্লজ অ্যাক্ট ১৮৯৭-এর ৬ ধারা অনুযায়ী কোনো আইনকে পুনর্জীবিত করতে হলে সংসদে আইনটি পাশ করানোর দরকার হবে।

সুপারিশ

- নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে গণভোটের বিধানটি আগামী সংসদে উত্থাপন করে পাশ করানোর সুপারিশ করা হচ্ছে।

[৮৬] তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিলের রাজনীতি, বদিউল আলম মজুমদার, প্রথমা, ২০২৪

১৮. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন

স্থানীয় সরকার হচ্ছে এমন একটি শাসনব্যবস্থা যার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট এলাকার জনগণ তাদের প্রাপ্য অধিকার, ক্ষমতা ও সম্পদ একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পেতে এবং একইসঙ্গে স্থানীয় বিষয়সমুহ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব দায়িত্ব, কর্তব্য ও অংশগ্রহণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। শক্তিশালী সরকারের অর্থ হলো প্রয়োজনীয় সম্পদ, দায়িত্ব ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত সত্যিকারের স্থানীয় গণতান্ত্রিক শাসন, যার মূল লক্ষ্য হল জনগণের ক্ষমতায়ন ও কল্যাণ। তাই শক্তিশালী স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে সৃষ্ট বিকেন্দ্রীভুত শাসনব্যবস্থা স্থানীয় পর্যায়ে গণতন্ত্রের ভিত রচনা করে। সংজ্ঞাগতভাবেই স্থানীয় সরকার একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার একটি সংবিধান স্বীকৃত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান।

সংবিধান স্বীকৃত একটি প্রতিষ্ঠান হলেও, স্থানীয় সরকার একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমাদের দেশে এখনও দাঁড়ায়নি।[৮৭] বস্তুত, স্থানীয় সরকার আমাদের দেশের একগুচ্ছ অতি পুরানো শাসন, সেবা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি। এ প্রতিষ্ঠানগুলো বলতে গেলে আইনের চেয়ে নিজস্ব প্রথা-পদ্ধতি অনুসরণ করেই চলে। এগুলোর নির্বাচন ও কার্যপদ্ধতি বহুলাংশে অস্বচ্ছ। গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও জনজবাবদিহিতা নানাভাবে আড়ষ্ট। আর্থিক সঙ্গতি অত্যন্ত অপ্রতুল। অর্থ ব্যবস্থা ভয়াবহভাবে দুর্বল। ফলে সেবা ও উন্নয়ন যা হয় তা নামমাত্র। বিগত **১৫** বছরের একতরফা নির্বাচনের কারণে প্রতিষ্ঠানগুলো গণবৈধতা বর্তমানে তলানিতে। ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতিতে প্রতিষ্ঠানগুলো আকণ্ঠ নিমজ্জিত। দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সংস্কারের নানামুখী প্রচেষ্টা নেওয়া হয়।[৮৮] **১৯৮১** সালের পর থেকে গঠিত হয় পাঁচটি সংস্কার কমিটি ও কমিশন। কিন্তু এসব কমিটি ও কমিশনের সুপারিশসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে দিনে দিনে সমস্যার পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে।

একটি দেশ ও সমাজে কার্যকর স্থানীয় সরকার তৃণমূল থেকে গণতন্ত্রকে সুসংহত করে। সাধারণ মানুষ সুশাসনের অংশীদার হয়। উন্নয়ন ও সেবা ব্যয় সাশ্রয়ী, গুণ ও মানসম্পন্ন হয়। বস্তুত স্থানীয় সরকার স্থানীয় মানুষজনের জন্য গণতন্ত্র চর্চার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পাঠশালা। এখানে গণতন্ত্র চর্চা জাতীয় গণতন্ত্রকে সুসংহত করে। সবকিছু মিলিয়ে একটি স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণের জন্য রাষ্ট্র ও সরকারের উপ-ব্যবস্থা হিসেবে স্থানীয় সরকারের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য।

স্থানীয় সরকারের নীতিগত ভিত্তি হলো 'সাবসিডিয়ারিটি প্রিন্সিপাল,' যার মূল কথা হলো সমস্যা যেখানে সমাধানও সেখানে। অর্থাৎ নাগরিকগণ প্রতিনিয়ত যেসব সমস্যার সম্মুখীন হন, সেগুলোর সমাধান হওয়া দরকার তাদের সবচেয়ে কাছের সরকারের সহায়তায়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পয়ঃনিষ্কাষন, নিরাপত্তা ইত্যাদি স্থানীয় সমস্যা – যেখানে জনগণ বসবাস করে – তাই এসকল সমস্যা সমাধানে জনগণের সবচেয়ে কাছের সরকারকেই সর্বাধিক ভূমিকা রাখতে হবে। যেহেতু প্রায় সকল সমস্যাই বিরাজমান তৃণমূলে, যেখানে অধিকাংশ জনগণ বসবাস করে, তাই সমস্যা সমাধানের প্রথম প্রচেষ্টা হতে হবে জনবহুল তৃণমূলে, জনগণের দোরগোড়ার স্থানীয় সরকারের সহায়তায়। তবে তৃণমূলে – প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বনিম্ন স্তরে – যে সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয় না, সেগুলোর সমাধানের চেষ্টা হওয়া আবশ্যক পরের স্তরে। যেসব সমস্যা পরের স্তরে সমাধান সম্ভব হয় না, সেগুলোর সমাধান হতে হবে পরবর্তী উপরের স্তরে। এভাবে চলতে থাকলে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব ও করণীয় হবে অত্যন্ত সীমিত। এ প্রক্রিয়ায় তৃণমূলের স্থানীয় সরকারই হতে হবে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, এবং সবচেয়ে বেশি সম্পদ, দায়দায়িত্ব ও ক্ষমতাও যাওয়া উচিত সবচেয়ে তৃণমূলের স্থানীয় সরকারের কাছে। সাবসিডিয়ারিটি প্রিন্সিপালের আরেকটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় দিক হলো যে, এর মাধ্যমেই স্থানীয় সরকারের তথা সরকারের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা এবং সমস্যা সমাধানে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সংস্থারের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বর্তমান কমিশনের সদস্য অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদকে প্রধান করে একটি পৃথক কমিশন গঠন করেছে। সে কমিশন স্থানীয় সরকারের ওপর বিস্তরিত সুপারিশ প্রণয়ন করবে। নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনও স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনকে যথাযথ সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেবে। তবে নির্বাচন সংক্রান্ত কিছু প্রয়োজনীয় সুপারিশ আমরা বর্তমান কমিশনের থেকে রাখছি।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মূল সমস্যা

ফেডারেল পদ্ধতির বিপরীতে আমাদের এককেন্দ্রিক (unitary) সাংবিধানিক কাঠামোতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিটি প্রশাসনিক একাংশে (adminstrative unit) একটি সমান্তরাল কাঠামো হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আমাদের সংবিধানের সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, "(১) আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে। (২) এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত অনুরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত প্রশাসনিক একাংশের মধ্যে সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন এবং অনুরূপ আইনে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে: (ক) প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীদের কার্য; (খ) জনশৃঙ্খলা রক্ষা; (গ) জনসাধারণের কার্য (public service) ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।"

[৮৭] বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের ইতিহাস জনতে, দেখুন Kamal Siddiqui (ed.), *Local Government in Bangladesh,* (Dhaka: University Press Limited, 1994).

[৮৮] দেখুন, Tofail Ahmed, *Bangladesh Reform Agenda for Local Governance* (Dhaka: Prothoma Prokashon, 2016). আরও দেখুন, Badiul Alam Majumdar, *Local Governance and Political Reform* (Dhaka: Agamee Prokashoni 2010).

আমাদের সাংবিধানিক আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী, সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ হওয়া উচিত স্বায়ত্তশাসিত ও আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণমুক্ত। বস্তুত তৃণমূল পর্যায়ের প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের তত্ত্বাবধানে দায়িত্ব পালন করার কথা। কারণ গণতন্ত্র হলো আমাদের সাংবিধানিক অঙ্গীকার এবং গণতন্ত্রের মূলকথা হলো জনগণের প্রতিনিধিদের শাসন, তাই প্রশাসনের সকল স্তরে জনগণের প্রতিনিধিদের শাসন প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। অর্থাৎ 'প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীদের কার্য' তদারকি করাই হতে হবে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের দায়িত্বের অংশ। কিন্তু বাস্তবে, সাংবিধানিক অঙ্গীকারের বিপরীতে, আমাদের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা, বিশেষ করে তৃণমূলের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ হয়ে পড়েছে আমলাতন্ত্রের চরম আজ্ঞাবহ। একইসঙ্গে সংসদ সদস্যদের নিয়ন্ত্রিত, তাই বহুলাংশে অকার্যকর।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ওপর সদস্যদের নিয়ন্ত্রণের একটি ভয়াবহ দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হয় গত জোট সরকারের আমলে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে জেলা মন্ত্রীর পদ সৃষ্টির মাধ্যমে। জেলা মন্ত্রীর পদ সৃষ্টির কারণে তিনি নিজ নির্বাচনি এলাকার উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারছেন না, এই যুক্তিতে জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ২০০৩ সালে হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন করেন। ২০০৬ সালে দেওয়া রায়ে হাইকোর্ট প্রজ্ঞাপনটি বাতিল এবং জেলা মন্ত্রীর পদকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করেন।[৮৯] একইসঙ্গে আদালত মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী, হুইপসহ জাতীয় সংসদের সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়াকে সংবিধানের লঙ্ঘন বলে রায় দেন। তা সত্ত্বেও সংসদ সদস্যগণ স্থানীয় সরকারের কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করেই আসছে। সংবিধান পরিপন্থি এ কাজে সহায়তার লক্ষ্যে গত আওয়ামী লীগ সরকার প্রতি সংসদ সদস্যকে তাদের পাঁচ বছরের মেয়াদকালে ২০ কোটি পর্যন্ত বরাদ্দ দিয়েছে, যার বিরাট অংশই লুটপাট হয়েছে।

আমাদের সাংবিধানিক স্কিমে প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীদের কাজের তত্ত্বাবধান ছাড়াও জনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং সকল জনকল্যাণমূলক সেবা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে আমাদের স্থানীয় সরকারের, বিশেষত তৃণমূলের স্থানীয় সরকারের ভূমিকা এর ধারে-কাছেও নেই, বরং এগুলো হয়ে পড়েছে অনেকটাই অগুরুত্বপূর্ণ ও অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা বহুলাংশে সীমিত হয়ে পড়েছে কিছু ছোটখাট অবকাঠামো নির্মাণে, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় কিছু ত্রাণ ও সহায়তা প্রদানে এবং বিচার-সালিস করাতে। তাদের 'ডেভেলপমেন্ট রোল' এবং জনগণের জীবনমান উন্নয়নে তেমন কোনো ভূমিকা নেই বললেই চলে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের সামান্য অংশই স্থানীয় সরকারকে দেওয়া হয়, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়নে বরাদ্দ রাখা হয়েছে মাত্র ৬.৭৯ শতাংশ। ফলে, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বর্তমানে অনেকাংশে একটি অর্থহীন ও অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

বিদ্যমান আইনে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদেরকে সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক বরখাস্তের বিধান রয়েছে। আইনের ১৩, ১৩ক এবং ১৩খ ধারার বিধানের মাধ্যমে উপজেলার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অপসারণের জন্য সরকারকে অগাধ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই বিধানের ব্যাপক অপপ্রয়োগের এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিরা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকারে পরিণত হওয়ার আশঙ্কাই বেশি। অতীত অভিজ্ঞতা থেকেও আমরা তাই-ই দেখেছি। অপপ্রয়োগের এই আশঙ্কা প্রকট আকার ধারণ করতে পারে, কারণ অসদাচরণ ও নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধ ছাড়া এই বিধানে উল্লেখিত অপরাধগুলোর কোনো সংজ্ঞা আইনে দেওয়া নেই।

২০০৭ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে কার্যকর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে সাবেক সচিব ড. শওকত আলীর নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়। বর্তমান নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধানও ওই কমিটির সদস্য ছিলেন। এই কমিটি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে কার্যকর করার লক্ষ্যে সবগুলো আইন পুনর্লিখন করে পল্লী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার জন্য একটি সমন্বিত আইনের প্রস্তাব করে। একইসঙ্গে স্থানীয় সরকারের নির্বাচন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রস্তাব আনে। নারীর জন্য ৪০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত রেখে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে তা পূরণের প্রস্তাব করে। এসব বিধান অন্তর্ভুক্ত করে অধ্যাদেশও জারি করা হয়। কিন্তু নবম জাতীয় সংসদ এসব গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারসম্বলিত অধ্যাদেশ অনুমোদন করেনি।

স্থানীয় সরকারের নির্বাচন

বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৯(১) অনুচ্ছেদের অধীনে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন শুধু রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য গঠিত ও দায়িত্বপ্রাপ্ত। ১১৯(২) অনুচ্ছেদের অনুসারে নির্বাচন কমিশন সরকার কর্তৃক আদিষ্ট বা অনুরুদ্ধ হয়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের পরিচালনা করে থাকে। সাতটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান তথা সমতল ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি করেপোরেশন এবং পার্বত্য অঞ্চলের বিশেষ তিনটি জেলা পরিষদ ও তিন জেলা নিয়ে গঠিত পার্বত্য 'চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ'সমূহ সাতটি ভিন্ন মৌলিক আইন দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত। আবার ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচনগুলোও পৃথকভাবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয় ভিন্ন দিনে। কিন্তু সব নির্বাচন পাঁচ বছরে একবার একটি তফসিলের মাধমে অনুষ্ঠান কাঙ্ক্ষিত হলেও তা সম্ভব হয় না নিরাপত্তার কারণে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পাশাপাশি প্রায় ৪,৫৫৪টি ইউনিয়ন পরিষদ, ৪৯৫টি উপজেলা পরিষদ, ৬৪টি জেলা পরিষদ, ৩৩১টি পৌরসভা ও ১২টি সিটি করপোরেশনের নির্বাচন একদিনে অনুষ্ঠানের যে নিরাপত্তার ঝুঁকি সৃষ্টি হবে তা সামাল দেওয়া আমাদের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষে সম্ভব হবে কি না তা নিয়ে অনেকের মনেই সন্দেহ রয়েছে। এই সন্দেহের একটি বড় কারণ হলো যে, স্থানীয় সরকারের নির্বাচন একটি বিরাট কর্মযজ্ঞ এবং অতীতে দেখা গেছে যে এসকল নির্বাচন সাধারণত সহিংস হয়। ইউনিয়ন, পৌরসভা ও উপজেলা এ তিনটি নির্বাচনের আয়োজনের বহর ও বিস্তৃতি তিনটি জাতীয় নির্বাচনকেও হার মানায়। অতীতে এ তিনটি নির্বাচনে শত শত মানুষ নিহত এবং হাজার মানুষ আহত ও পঙ্গুত্ব বরণ করেছে। তাই সবগুলো নির্বাচন একত্রে, একই তফসিলে করার প্রচেষ্টা হবে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও অযৌক্তিক।

---

[৮৯] *আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বনাম বাংলাদেশ* [১৬ বিএলটি (এইচসিডি) (২০০৮)]

স্থানীয় সরকারের নির্বাচনব্যবস্থা

প্রতিষ্ঠানের নাম	কাঠামো	নির্বাচন পদ্ধতি		
		মেয়র/চেয়ারম্যান	সাধারণ কাউন্সিলর/সদস্য	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান/সংরক্ষিত মহিলা সদস্য
সিটি করপোরেশন	১ জন মেয়র, সিটি করপোরেশন ভেদে ভিন্ন সংখ্যক কাউন্সিলর ও ৩টি সাধারণ ওয়ার্ড নিয়ে ১ জন করে সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর	সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত। মেয়র দলীয় প্রতীকে নির্বাচিত হন।	সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত	সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত
জেলা পরিষদ	১ জন চেয়ারম্যান, ১৫ জন সদস্য এবং ৫ জন সংরক্ষিত নারী সদস্য	সিটি করপোরেশনের মেয়র ও কমিশনারগণ, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, পৌরসভার চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ নির্বাচিত হন। চেয়ারম্যান দলীয় প্রতীকে নির্বাচিত হন।		
উপজেলা পরিষদ	১ জন চেয়ারম্যান, ১ জন ভাইস চেয়ারম্যান, ১ জন নারী ভাইস চেয়ারম্যান। এছাড়া, উপজেলার আওতাধীন ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার চেয়ারম্যানগণ উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে থাকেন, ইউনিয়ন/পৌরসভার মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত নারী আসনের জন্য বরাদ্দ থাকে এবং ইউনিয়ন/পৌরসভার মহিলা সদস্যগণ নিজেদের মধ্য থেকে সংরক্ষিত আসনের এই সকল সদস্য নির্বাচন করেন।	সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত। চেয়ারম্যান দলীয় প্রতীকে নির্বাচিত হন	সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত	সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত
পৌরসভা	১ জন মেয়র, ০৯টি সাধারণ ওয়ার্ডে ০৯ জন সাধারণ কাউন্সিলর ও ৩টি সাধারণ ওয়ার্ড নিয়ে ১ জন করে নারী কাউন্সিলর	সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত। চেয়ারম্যান দলীয় প্রতীকে নির্বাচিত হন	সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত	সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত
ইউনিয়ন পরিষদ	১ জন চেয়ারম্যান, ০৯টি সাধারণ ওয়ার্ডে ৯ জন সদস্য, ৩টি সাধারণ ওয়ার্ড নিয়ে ১ জন করে সংরক্ষিত নারী সদস্য	সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত। চেয়ারম্যান দলীয় প্রতীকে নির্বাচিত হন	সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত	সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ	৩৪ সদস্যবিশিষ্ট পরিষদ (১ জন চেয়ারম্যান, ২১ জন উপজাতীয় সদস্য, ০৯ জন অ-উপজাতীয় সদস্য, ০২ জন উপজাতীয় নারী সদস্য, ০১ জন অ-উপজাতীয় নারী সদস্য)	সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত।	সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত।	সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত।
রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ	৩৪ সদস্যবিশিষ্ট পরিষদ (১ জন চেয়ারম্যান, ২০ জন উপজাতীয় সদস্য, ১০ জন অ-উপজাতীয় সদস্য, ০২ জন উপজাতীয় নারী সদস্য, ০১ জন অ-উপজাতীয় নারী সদস্য)	সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত।	সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত।	সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত।
বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ	৩৪ সদস্য বিশিষ্ট পরিষদ (১ জন চেয়ারম্যান, ১৯ জন উপজাতীয় সদস্য, ১১ জন অ-উপজাতীয় সদস্য, ০২ জন উপজাতীয় নারী সদস্য, ০১ জন অ-উপজাতীয় নারী সদস্য)	সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত।	সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত।	সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত। কিন্তু ৩৫ বছর ধরে নির্বাচন হয় না। প্রথম ও একমাত্র নির্বাচন হয় ১৯৮৯ সালে।
পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ	১ জন চেয়ারম্যান, ১২ জন উপজাতীয় সদস্য, ০৬ জন অ-উপজাতীয় সদস্য, ০২ জন উপজাতীয় নারী সদস্য, ০১ জন অ-উপজাতীয় নারী সদস্য এবং ৩ পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণ পদাধিকারবলে সদস্য	৩ পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ব্যতীত আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানসহ অন্য সকল সদস্য পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ দ্বারা বিধি অনুসারে নির্বাচিত হবেন।		২০১০ সালে উচ্চ আদালত এ পরিষদকে অবৈধ ও অসাংবিধানিক ঘোষণা করেন। এর বিরুদ্ধে করা আপিল শুনানির অপেক্ষায় আছে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কাঠামো এবং বিদ্যমান নির্বাচন ব্যবস্থার একটি চিত্র উপরের টেবিলে প্রদর্শন করা হলো। টেবিলে প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, বিভিন্ন স্তরের স্থানীয় সরকারের বিদ্যমান কাঠামো এবং নির্বাচনব্যবস্থা সঙ্গতিহীন এবং অনেকটা সেকেলে। বস্তুত এটিকে একটি জগাখিচুড়ির কাঠামো বলা যায়। পার্বত্য জেলা পরিষদ কাঠামোগতভাবে সম্পূর্ণ আলাদা। ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনের নির্বাচন পদ্ধতিতে কিছুটা মিল রয়েছে। জেলা পরিষদের নির্বাচন পদ্ধতি আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের আদলে সৃষ্ট। উপজেলা পরিষদের নির্বাচন পদ্ধতিও অন্য সব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন পদ্ধতি থেকে আলাদা। এখানে একদল নারী প্রতিনিধি সৃষ্টির পরিবর্তে একজন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে, যাঁর কোনো সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা ও ভূমিকা নেই। এছাড়াও ২০১৫ সালে সকল মেয়র ও চেয়ারম্যানদের দলীয় প্রতীকে নির্বাচনের বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা পুরো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে চরমভাবে কলুষিত করেছে। এসব অসঙ্গতি দূর করতে হলে স্থানীয় সরকারের নির্বাচনি ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার জরুরি।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা কাটাতে একটি উল্লেখযোগ্য সংস্কার উদ্যোগ হতে পারে একটি স্থায়ী 'স্থানীয় সরকার কমিশন' গঠন করা। এ কমিশনের দায়িত্ব হবে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের অপসারণের বিরুদ্ধে আপিলের সুযোগ প্রদান করা এবং আপিল নিস্পত্তি করা। একইসঙ্গে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে আনীত আর্থিক ও প্রশাসনিক অনিয়মের তদন্ত ও বিচার করা। এছাড়াও ভারতের 'ফাইন্যান্স কমিশনে'র মতো অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করা। উপরন্তু স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনাও কমিশনের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্রসঙ্গত, ২০০৭ সালে সাবেক সচিব ড. শওকত আলীর নেতৃত্বে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের কমিটি এমন একটি স্থায়ী স্থানীয় সরকার কমিশন গঠনের প্রস্তাব করেছিল এবং কমিশন গঠিতও হয়েছিল। বর্তমান স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের প্রধান অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ সে কমিশনের সদস্য ছিলেন। পরবর্তীতে নবম জাতীয় সংসদে সংশ্লিষ্ট অধ্যাদেশ অনুমোদন লাভ না করায় এ কমিশন বিলুপ্ত হয়ে যায়।

অংশীজনের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময়ে আমরা স্থানীয় সরকার বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পেয়েছি। এর একটি হলো বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনেই সকল স্থানীয় নির্বাচন সম্পন্ন করা। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, দলীয় সরকারের অধীনে স্থানীয় সরকার নির্বাচন হলে সেগুলো ক্ষমতাসীন সরকার কর্তৃক প্রভাবিত হয়। এর কারণ হলো, যে কর্মকর্তারা নির্দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ আচরণ করে, ক্ষমতার পালাবদল হলে দলীয় সরকারের অধীনে তারাই আবার পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করতে বাধ্য হয় বা স্ব-ইচ্ছায় তা করে, যা নির্বাচনকে ক্ষমতাসীনদের পক্ষে প্রভাবিত করে। তাই অনেক অংশীজনের আকাঙ্ক্ষা হলো বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যেন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেই স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আয়োজন করে এবং নির্বাচনে যেন দলীয় প্রতীক ব্যবহৃত না হয়। আমরা আমাদের কমিশনের পক্ষ থেকে এ প্রস্তাবটি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছি। কারণ এর মাধ্যমে নবগঠিত নির্বাচন কমিশনের নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করার সুযোগ হবে। এছাড়াও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে দলীয় প্রতীক বাদ দিয়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে অপেক্ষাকৃত ভালো প্রার্থীরা এসব প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত হয়ে আসার সুযোগ পাবেন। অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের কাজ শেষ হলেই আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার এনে এসব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন আয়োজন করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাধ্যমে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন কর্তৃক পরিচালিত জরিপেও বেশিরভাগ মানুষ জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে মত দিয়েছেন। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৬৫ শতাংশই মনে করেন আগামী জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে স্থানীয় সরকার নির্বাচন হওয়া উচিত।

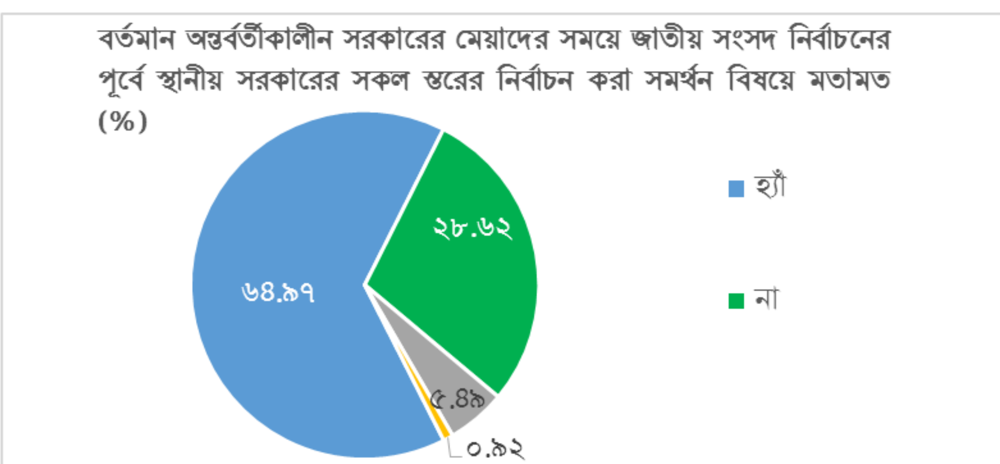

প্রসঙ্গত, গত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০১১ সালে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরের মেয়র ও চেয়ারম্যানদের নির্বাচন দলীয় ভিত্তিতে অনুষ্ঠানের বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হওয়ার পর 'সুজন'-এর গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে, এসব পদে প্রার্থীর সংখ্যা কমে গেছে এবং প্রার্থীর মানেও অবনতি ঘটেছে। একইসঙ্গে অবনতি ঘটেছে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মানে। কারণ কম প্রার্থী মানে কম যোগ্য প্রার্থী এবং কম যোগ্য প্রার্থী মানে কম যোগ্য প্রার্থী নির্বাচিত হওয়া। এছাড়াও দলীয় ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের ফলে এসব প্রতিষ্ঠানে মনোনয়ন বাণিজ্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটে, যা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে চরমভাবে কলুষিত করেছে। তাই আমরা আমাদের কমিশনের পক্ষ থেকে দলভিত্তিক স্থানীয় সরকার নির্বাচন না করার প্রস্তাবের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

বর্তমানে জেলা পরিষদ ছাড়া সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রধানের নির্বাচন জনগণের সরাসরি ভোটে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির আদলে অনুষ্ঠিত হয়। জেলা পরিষদে মৌলিক গণতন্ত্রের আদলে পরোক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিছু অংশীজন স্থানীয় সরকারের সব নির্বাচন সংসদীয় পদ্ধতিতে পরোক্ষভাবে অনুষ্ঠানের পক্ষে প্রস্তাব করেছেন। তাদের যুক্তি হলো যে, সরাসরিভাবে নির্বাচিত হওয়ার কারণে আমাদের স্থানীয় সরকারসমূহ মেয়র-চেয়ারম্যানসর্বস্ব প্রতিষ্ঠনে পরিণত হয়েছে। তাদের আরেকটি যুক্তি হলো যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন পরোক্ষভাবে সংসদীয় পদ্ধতিতে হলে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মানে উন্নতি ঘটবে।

আমাদের কমিশনের সদস্যদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক হয়েছে এবং কমিশনের একজন সম্মানিত সদস্য ব্যতীত বাকি সকল সদস্যই সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে চেয়ারম্যান/মেয়র এবং সদস্য/কাউন্সিলরদের নির্বাচন জনগণের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠানের পক্ষে মতামত দিয়েছেন। একজন ব্যতীত আমাদের কমিশনের সকল সদস্যই মনে করেন যে, সংসদীয় পদ্ধতির পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থার প্রচলন করলে আমাদের স্থানীয় সরকারসমূহ চরম দলবাজির আখড়ায় পরিণত হবে এবং এগুলোতে মনোনয়ন বাণিজ্যের বিস্তার ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। এছাড়াও বর্তমানের প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটালে পুরো স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা ব্যাপক ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। তাই আমরা সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন জনগণের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠানের সুপারিশ করেছি। এছাড়াও বিরাজমান নির্বাচন পদ্ধতির দুর্বলতাসমূহ আইন সংশোধন করে বহুলাংশে দূর করা যাবে। আমরা আরও মনে করি যে, হলফনামার মাধ্যমে প্রার্থীদের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে তথ্য প্রদান ও প্রকাশ করা হলে স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মানে উৎকর্ষ ঘটবে। একইসঙ্গে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদেরকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখার আমরা পক্ষে।

পার্বত্য জেলাসমূহে নির্বাচন আয়োজন

১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত 'শান্তিচুক্তি' অনুযায়ী দুটি পৃথক আইনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে দুটি নতুন সংগঠন সৃষ্টি করা হয়। একটি হচ্ছে পার্বত্য তিন জেলার তিনটি 'জেলা পরিষদ' এবং তিন জেলার সমন্বয়ে একটি নির্বাচিত 'আঞ্চলিক পরিষদ'। এ পরিষদসমূহ চালু হবার পর পার্বত্য তিনটি জেলায় ১৯৮৯ সালের পর ৩৫ বছর ধরে কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। অপরদিকে 'আঞ্চলিক পরিষদ' গঠনের পর থেকে ওই পরিষদের কোনো নির্বাচন হয়নি। এমতাবস্থায় দীর্ঘদিন নির্বাচন না করে মনোনীত ব্যক্তিবর্গ দ্বারা এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনা এবং ওসব প্রতিষ্ঠানে অর্থ ব্যয় নৈতিক ও রাজনৈতিক বৈধতা হারাচ্ছে। তাই বর্তমান সময়ে এই দুটি প্রতিষ্ঠানসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নির্বাচনের একটি প্রবল দাবি রয়েছে।

অন্য সকল প্রতিষ্ঠানে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হলেও কিছু আইনগত জটিলতার জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হয়নি বা এখনও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এই জটিলতার একটি কারণ হলো যে, দেশের পার্বত্য এলাকার নির্বাচনসমূহ নির্বাচন কমিশনের করা ভোটার তালিকায় করা হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা পরিষদে নির্বাচনে ভোটার তালিকা তৈরির একটি ভিন্ন বিধান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে সংযোজন করা হয়েছে, যা আমাদের সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এছাড়াও পার্বত্য জেলা পরিষদ বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি এই তিনটি জেলা পরিষদের আইনের ৫ এবং ৬ ধারায় 'স্থায়ী অধিবাসী' হওয়ার শর্তটি এ নির্বাচনের পথে একটি প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থায়ী অধিবাসী হতে হলে হেডম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও পৌরসভার মেয়র কর্তৃক দেওয়া ছাড়পত্রটি চূড়ান্ত করতে সার্কেল প্রধান বা রাজার একটি সনদ প্রয়োজন হবে।

সুপারিশ

১. একটি স্থায়ী 'স্থানীয় সরকার কমিশন' গঠন করা। এ লক্ষ্যে ২০০৭ সালে গঠিত 'স্থানীয় সরকার শক্তিশালী ও গতিশীলকরণ কমিটি'র আলোকে একটি আইন প্রণয়ন করা। প্রসঙ্গত, বর্তমান কমিশনের প্রধান 'স্থানীয় সরকার শক্তিশালী ও গতিশীলকরণ কমিটি' একজন সদস্য ছিলেন।

২. জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আয়োজন করা।

৩. স্থানীয় সরকার নির্বাচন নির্দলীয় করার জন্য আইন সংশোধন করা।

৪. সকল স্থানীয় সরকার নির্বাচন প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের এবং মেম্বার/কাউন্সিলরদের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অর্থবহ ভূমিকা নিশ্চিত করার বিধান করা।

৫. স্থানীয় সরকারের সকল পর্যায়ে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণের বিধান করা।

৬. এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে শপথ গ্রহণের পূর্বে শিক্ষকের পদ থেকে পদত্যাগের বিধান করা।

৭. ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য পদপ্রার্থীদের হলফনামার মাধ্যমে তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে ভোটারদের জানার অধিকার নিশ্চিত করা।

৮. পার্বত্য এলাকার জেলা পরিষদের নির্বাচনের আয়োজন করা।

৯. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে জাতীয় বাজেটের ৩০ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়ার বিধান করা।

উপসংহার

নিঃসন্দেহে ২০২৪ সাল ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্যতম স্মরণীয় বছর। এবছর ছাত্র-জনতার নেতৃত্বে সংঘটিত অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থান স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটিয়ে তাকে দেশান্তরী হতে বাধ্য করেছে। জুলাই-আগস্ট মাসে কোটা বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু হয়ে হাসিনাকে হটানোর একদফা দাবির আন্দোলনের মাধ্যমে জাতির জন্য এক দীর্ঘ অন্ধকার অধ্যায়ের অবসান ঘটেছে। অবসান ঘটেছে গত ১৫ বছরের ধারাবাহিকভাবে জনগণের ভোটাধিকার হরণ, মৌলিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও নীতির প্রতি অমার্জনীয় অবহেলা, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসের মাধ্যমে পদ্ধতিগত 'চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্স' বা নজরদারিত্বের কাঠামোর অকার্যকরকরণ, অভূতপূর্ব মাত্রার ক্লেপ্টোক্রেসি বা চোরতন্ত্রের উত্থান ও পুঁজি পাচারের হিড়িক, প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর শাসক দলের প্রতি নির্লজ্জ আনুগত্য, গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন, আইনের শাসনের চরম পদদলন এবং তুলনাহীন নৃশংসতার। চরম কর্তৃত্ববাদী শেখ হাসিনা গণতন্ত্রের প্রত্যেকটি সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানের পতন ঘটিয়ে বাংলাদেশে ফ্যাসিজমের শিকড় গভীরভাবে প্রোথিত করেছিল।

শেখ হাসিনা সরকারের বিগত ১৫ বছরের সকল অন্যায় ও অবিচারের কারণে সৃষ্ট মানুষের মনে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ পুরো জাতিকে এক বারুদের স্তূপের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। ছাত্র-জনতা সেই জনরোষের বারুদের স্তূপের ওপর স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করে ঘটিয়েছিল দেশের আপামর জনগণের অংশগ্রহণে ইতিহাসের সবচেয়ে বৃহৎ গণবিস্ফোরণ। তারা তা করেতে পেরেছিল 'ট্রিগার-হ্যাপি' খুনিদের বন্দুকের গুলির সামনে নির্ভয়ে বুক পেতে দিয়ে, বিনা দ্বিধায়, সত্যিকারের বীরের মতো, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার মাধ্যমে। মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনাদের পর এমন বড় আত্মত্যাগ আর কেউ করতে পারেনি। তাদের অতুলনীয় এই আত্মত্যাগ কেবল স্বৈরাচারের পতনই ঘটায়নি, গোটা জাতির সামনে এক অপূর্ব সম্ভাবনার দ্বারও উন্মোচিত করেছে। উন্মোচিত করেছে রাষ্ট্র মেরামতের মাধ্যমে শেখ হাসিনার সৃষ্ট স্বৈরাচারী ব্যবস্থার চির অবসানের। সম্ভব করে তুলেছে একটি নতুন গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশের আগমন।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জাতির এ আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত শক্তভাবে গড়ে তুলতে পদ্ধতিগতভাবে সংস্কারের উদ্যোগ নিতে গঠন করেছে ১১টি কমিশন। যার অন্যতম হলো 'নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন'। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের ম্যান্ডেট হলো জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনতে সংশ্লিষ্ট পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন কেত্রে সংস্কারের জন্য নানা বিষয়ে বিভিন্ন কমিশন গঠিত হলেও, নির্বাচন ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে এবং শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাতে গঠিত এটিই প্রথম নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন। আমরা আটজন তরুণ-প্রবীণ আমাদের ওপর অর্পিত এই দায়িত্বকে একটি ঐতিহাসিক সুযোগ হিসেবে নিয়েছি। নিয়েছি এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন ভবিষ্যৎ সৃষ্টির। যে ভবিষ্যৎ সৃষ্টি হবে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত গড়ে তোলার মাধ্যমে। আবু সাঈদ-মুগ্ধ-ওয়াসিমদের মতো আমরা রক্ত দিতে পারিনি, কিন্তু সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে চেষ্টা করেছি তাদের রক্ত যেন বৃথা না যায়।

গত অক্টোবর মাসের প্রথমে আমাদের কমিশন গঠনের শুরু থেকেই আমরা কার্যক্রম শুরু করেছি নির্বাচনি আইন, বিধি-বিধান ও নীতিমালার গভীর পর্যালোচনা এবং আমাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে নির্বাচনি ব্যবস্থার সংস্কারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে। পরবর্তী ধাপে আমরা শুরু করি রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন অংশীজনদের কাছ থেকে প্রস্তাব ও সুপারিশ গ্রহণ করার। সর্বস্তরের অংশীজনের মতামত ও পরামর্শ সংগ্রহে বেশ কিছু উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করি। ঢাকায় ১৩টি আনুষ্ঠানিক সংলাপ, ২টি অনলাইন সভা এবং সাবেক দু'জন প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেছি। পাশাপাশি আমরা কমিশনের সদস্য হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক মতবিনিময়ও করেছি।

অংশীজনের মতামত গ্রহণের কাজ ঢাকার বাইরেও আমরা সম্প্রসারিত করেছি। খুলনা, সিলেট, রংপুর, চট্টগ্রাম এবং রাজশাহীতে সংলাপ আয়োজনের মাধ্যমে আমরা জনগণের মতামত নিয়েছি।

কমিশন তার কার্যক্রমের শুরুর দিকে একটি ওয়েবসাইট চালু করেছে, যেখানে জনগণ নাম প্রকাশ করে বা গোপনীয়তা বজায় রেখে তাদের মতামত ও প্রস্তাব জমা দিতে পেরেছেন। একইসঙ্গে একটি ফেসবুক পেজ চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ফেসবুক পোস্ট বা ম্যাসেঞ্জার ব্যবহার করে জনগণ তাদের মতামত জানাতে পেরেছেন। এছাড়া একটি নির্ধারিত ই-মেইল ঠিকানার মাধ্যমে এবং ডাকযোগে লিখিত মতামত গ্রহণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। আমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয় এবং বিটিআরসির মাধ্যমে দেশের প্রতিটি মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর কাছে এসএমএস পাঠিয়ে মতামত দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

কমিশনের পক্ষ থেকে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহের কাছে চিঠি দিয়ে আমরা তাদের লিখিত সুপারিশ আহ্বান করেছি। প্রায় সব রাজনৈতিক দলই তাদের লিখিত সুপারিশ কমিশনের কাছে জমা দিয়েছে। অনেক রাজনীতিবিদ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে এসে আমাদেরকে তাঁদের মতামত জানিয়েছেন। রাস্তা-ঘাটে, যেখানেই যার সঙ্গে দেখা হয়েছে, সাধারণ নাগরিকেরাও সংস্কার ও পরিবর্তনের পক্ষে তাদের হৃদয় নিংড়ানো আকুতি আমাদেরকে জানিয়েছেন।

গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি গড়ে তুলতে পদ্ধতিগত সংস্কার উদ্যোগ সর্বস্তরের জনগণের মতামত আরও গভীরভাবে অনুধাবন করতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) মাধ্যমে ৪৬ হাজার খানার ওপর দেশব্যাপী একটি জরিপও পরিচালনা করা হয়েছে। সবশেষে, সর্বস্তরের জনগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামত ও সেগুলো বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আমাদের অভিজ্ঞতা ও সর্বোচ্চ বিবেচনা শক্তি ব্যবহার করে আমরা আমাদের সুপারিশমালা প্রণয়ন করেছি। সুপারিশগুলো প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমরা সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছি। তা সত্ত্বেও ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে, যার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

আমাদের নির্বাচনি ব্যবস্থাকে কার্যকর করার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসনকে সুসংহত করার জন্য আমরা ছোট-বড় দুই শতাধিক সুপারিশ প্রণয়ন করেছি। এ সুপারিশগুলোকে মোটাদাগে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ধরনের সুপারিশগুলো হলো আইন-কানুন সংক্রান্ত, যেগুলো অধ্যাদেশ জারির ও কিছু প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। এসব সুপারিশের মধ্যে কিছু রয়েছে অতি জরুরি, যার বাস্তবায়ন এখনই শুরু হওয়া আবশ্যক। যেমন, নির্বাচন বিষয়ক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইন *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২ (আরপিও)-তে বেশ কিছু সংশোধন আনতে হবে এবং দ্রুত নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তা করাও জরুরি। তেমনিভাবে সংসদীয় এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণের কাজ এখনই শুরু করতে হবে। এছাড়াও প্রাবাসী বাংলাদেশিদেরকে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার এবং তাদের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার সময়সাপেক্ষ কাজও এখনই শুরু করা আবশ্যক।

আমাদের প্রস্তাবিত দ্বিতীয় ধরনের কাঠামোগত সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হবে এবং এর জন্য নির্বাচিত সংসদ লাগবে, যদি না আমরা গণভোটের মাধ্যমে কিংবা পরে সাংবিধানিক বৈধতা দেওয়ার সত্ত্বে, ঐকমত্যের ভিত্তিতে, কিছু কাজ আগেই এগিয়ে না নেই। যেমন, সংসদের উচ্চকক্ষ স্থাপনের জন্য সংবিধানে পরিবর্তন আনতে হবে। ভিন্নভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করতে এবং প্রধানমন্ত্রীর জন্য টার্ম লিমিট সৃষ্টি করতে হলে সংবিধান সংশোধন করতে হবে। আমাদের প্রধান উপদেষ্টার ভাষায়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর এগুলো বাস্তবায়নের জন্য প্রযোজন হবে সকল গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনের স্বাক্ষরিত একটি 'জাতীয় সনদ'।

একটি বহুল ব্যবহৃত উক্তি রয়েছে যে, পুডিংয়ের স্বাদ তার খাওয়ার মধ্যে। তেমনিভাবে সংস্কারের সার্থকতাও তার বাস্তবায়নে। নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার সংক্রান্ত সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন নির্ভর করবে চারটি পক্ষের ওপর – অন্তবর্তীকালীন সরকার, নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল এবং জনগণ। বস্তুত সংস্কার বাস্তবায়নের 'বল' এখন এ চারটি পক্ষের কোর্টে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দ্বিমত থাকলেও সরকার ও নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে আমাদের সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের ব্যাপারে আগ্রহের অভাব থাকার কথা নয়। এগুলো বাস্তবায়নের ব্যাপারে অতিরিক্ত অর্থকড়িরও প্রয়োজন হবে না। তাই মূলত রাজনৈতিক দলের আগ্রহের ওপরই নির্ভর করবে কোন সংস্কার প্রস্তাবগুলো কত দ্রুত বাস্তবায়িত হবে। সর্বোপরি আমাদের এবং সব সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন নির্ভর করবে নাগরিকদের সোচ্চার ভূমিকার ওপর – নাগরিকরা চাইলেই অসম্ভকেও সম্ভব করা সম্ভব হবে। গত ৫ আগস্টের শেখ হাসিনার পলায়নের ঘটনাই তার সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

আমাদের মেধা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের নির্বাচন তথা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যকর করার লক্ষ্যে আমাদেরকে যে ঐতিহাসিক সুযোগ দেওয়া হয়েছে তার জন্য আমরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে, তাঁর সর্বদা অভিভাবকসুলভ উৎসাহের জন্য। সর্বোপরি, পুরো জাতির মতো আমরাও চির কৃতজ্ঞ আমাদের গত জুলাই-আগস্টে যারা আহত-নিহত হয়েছেন, যাদের অভাবনীয় আত্মত্যাগের জন্য আমাদের জন্য একটি নতুন বাংলাদেশ সৃষ্টির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

চব্বিশের জুলাই-আগস্টে আহত-নিহতদের আত্মত্যাগের অম্লান স্মৃতি যেন আগত দিনের বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে আমাদের সকলকে শক্তি, সাহস ও অনুপ্রেরণা জোগায়!

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার